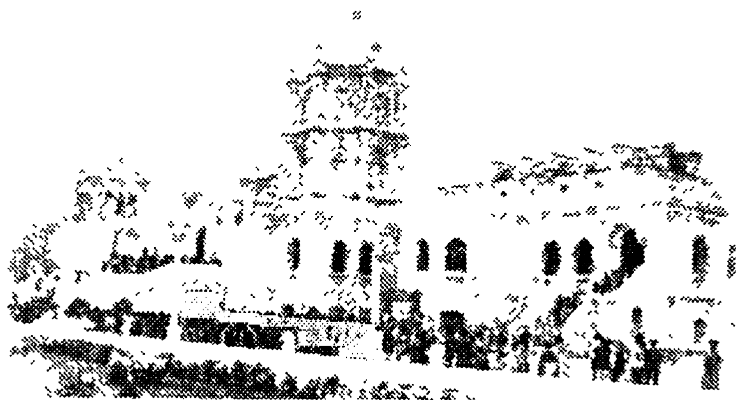
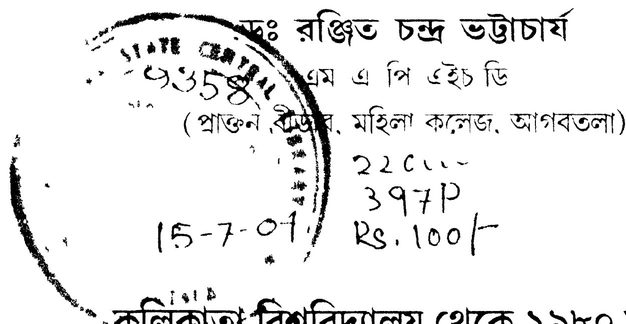
ত্রিপুরার রাজ আমলের
বাঙলা সাহিত্য



ডঃ রঞ্জিত চন্দ্র ভট্টাচার্য
এম এ পি এইচ ডি
(প্রাক্তন রীডার, মহিলা কলেজ, আগরতলা)



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে
পি. এইচ. ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণাপত্র।

প্রকাশক ঃ

ডঃ রঞ্জিত চন্দ্র ভট্টাচার্য

১৮, পশ্চিম জয়নগর, আগরতলা,

ত্রিপুরা (পশ্চিম)

প্রথম প্রকাশ — জুন, ২০০৩ সাল

মুদ্রণে ঃ

টাইমস্ প্রেস

আখাউড়া রোড্

আগরতলা।

প্রচ্ছদপটঃ

রেডিয়েন্ট অফসেট

মঠ চৌমুহনী

আগরতলা

কম্পিউটার ঃ

ডায়মণ্ড গ্রাফিক্স

দত্ত সুপার মার্কেট

শকুন্তলা রোড

আগরতলা

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

—ঃ নিবেদন ঃ—

দীর্ঘ বছর পর "ত্রিপুরার রাজ আমলের বাংলা সাহিত্য" গবেষণাপত্রটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। নানা বাধা থাকায় এতদিন এটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এই গবেষণা পত্রটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে যাঁরা পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বসু ও ডঃ কার্তিক লাহিড়ী। তাঁদের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় গবেষণাপত্রের "ত্রিপুরার প্রাক্ আধুনিক যুগের কাব্য" অংশটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণা করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন আগরতলা, মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক দীনেশ দাস। এক্ষেত্রে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। তাছাড়া এই গবেষণার ক্ষেত্রে নানা কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অতুলনীয় সাহায্য পাওয়া গেছে রাজকুমার সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মণের কাছ থেকে। তিনি দুরূহ তথ্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পরিবেশন করে গবেষণা সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন যে ঋণ অপরিশোধ্য।

ত্রিপুরার দরবারী সাহিত্য বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। ত্রিপুরার বহু বিদগ্ধ জন বর্তমানে এই হারিয়ে যাওয়া সাহিত্যকে নিজেদের চেষ্টা ও শ্রমে নানাদিক থেকে তোলে ধরার চেষ্টা করছেন, কখনও পুস্তকাকারে, কখনও বা পত্র পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে। গবেষণা গ্রন্থটি ত্রিপুরার দরবারী সাহিত্যের গতি প্রকৃতি ও গুরুত্ব নির্ণয়ে আলোকপাত করবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন প্রসঙ্গে কোনো গঠনমূলক আলোচনা পাঠকবর্গের কাছ থেকে পেলে কৃতার্থ হবো। আশা করি, গ্রন্থটি সুধীজনের কাছে সমাদৃত হবে।

রঞ্জিত চন্দ্র ভট্টাচার্য

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

— ঃ —

—ঃ ভূমিকা ঃ—

ত্রিপুরা পূর্বভারতের এক প্রান্ত রাজ্য। ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক আবর্ত এবং অন্যান্য কারণে এই পার্বত্য রাজ্যের সংস্কৃতি বৃহৎ বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় সূত্রে গ্রথিত হ'তে পারেনি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ত্রিপুরার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কোনো সুস্পষ্ট রূপ নেই, অথবা এর সঙ্গে প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ্যের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কোনো যোগসূত্র আদৌ ছিল না। ত্রিপুরার ইতিহাসের সামগ্রিক পর্যালোচনা করলে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, পঞ্চদশ শতক থেকে ত্রিপুরার সঙ্গে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির কিছু সংযোগ ঘটেছিল। ত্রিপুরার প্রখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় সম্পাদিত 'রাজমালা' গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায় —

ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি।
রাজ্যেতে শিখায় গীত নৃত্য নৃপমনি।
('রাজমালা' — দ্বিতীয় লহর
— ধন্যমাণিক্য খন্ড — পৃষ্ঠা - ২৭)

ইতিপূর্বে হিন্দুধর্মের স্ফুলিঙ্গ যে ত্রিপুরাকে স্পর্শ করেছিল, তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "কিরাত-জনকৃতি" গ্রন্থে (এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল - ষোড়শ খন্ড পৃষ্ঠা - ২১৬)। দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিনের অনুচর বঙ্গাধিপতি তুগ্রল খাঁর সঙ্গেও যে ত্রিপুরাধিপতি রত্নফার একটা নিবিড় যোগাযোগ ছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। বাংলার সংস্কৃতি সম্বন্ধে রাজা রত্নফার উৎসাহ ও কৌতুহল ছিল অপরিসীম। এই কারণে বাঙালী ব্রাহ্মণেরা বাইরে থেকে ত্রিপুরায় বসতি স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং এইসব ব্যক্তির আগমনের ফলে ত্রিপুরার সঙ্গে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

যেহেতু ত্রিপুরা ভৌগোলিকভাবে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত, সেইহেতু স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ত্রিপুরার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়া বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী রাজ্য মণিপুরের সঙ্গেও ত্রিপুরার ধর্মীয় ও সাহিত্যিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। পরবর্তীকালে এই সম্পর্ক নিবিড়তা লাভ করে এবং ত্রিপুরার সংস্কৃতি এক সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। তবে এ কথা ঠিক, ত্রিপুরার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বহুলাংশে ভাগীরথী তীরবর্তী বঙ্গীয় সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে পরিপুষ্টিলাভ করে।

ত্রিপুরার রাজভাষা বাংলা হওয়ার ফলে এখানে রাজ উৎসাহে ও রাজানুকূল্যে বাংলা ভাষাতেই দরবারী সাহিত্য রচিত হয়। ত্রিপুরার রাজ ভাভা বাংলা হওয়াতেই এই অঞ্চলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এত উন্নতি সম্ভব হয়েছে

ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজ আমলে রচিত প্রাক্-আধুনিক যুগের (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) কাব্য 'রাজমালা', 'কৃষ্ণমালা', 'শ্রেণীমালা', 'চম্পকবিজয়', 'গাজীনামা' প্রভৃতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আধুনিককালে (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে) ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় ত্রিপুরার ইতিহাসের পুনর্গঠন ও মূল্যায়ন, ত্রিপুরার প্রাচীন সাহিত্য, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য প্রভৃতির লুপ্ত পরিচয় পুনরুদ্ধারের সর্বাঙ্গীন চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া এই সময়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা বহুল পরিমাণে হবার ফলে ত্রিপুরার অগ্রগতির পথ নিঃসন্দেহে সূচিত হয়। একদিকে রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা এবং অন্যদিকে রাজপারিষদবর্গ ও রাজপরিবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় ত্রিপুরার সাহিত্যাকাশে এক নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটে।

তবে একথা ঠিক, রাজ অনুগৃহীত ব্যক্তিদের হাতে রচনার ভার ন্যস্ত হওয়ায় বিজ্ঞান সম্মত আলোচনার চেয়ে রাজপ্রশস্তিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করা হয়েছে এবং বহু অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্ত ও গৃহীত হয়েছে। ত্রিপুরায় দীর্ঘকাল ধরে যে বাংলা ভাষার চর্চা চলে এসেছে, বহু প্রাচীন মুদ্রা

ও শিলালিপি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ত্রিপুরার রাজ আমলে রচিত যতগুলি পুঁথি পাওয়া গেছে, প্রত্যেকটি পুঁথির প্রাচীনতা বিচার এবং তার কাহিনীগত উৎকর্ষ ও কাহিনীর ঐতিহাসিকতা বিচার করার সাধ্যমত চেষ্টা বর্তমান আলোচনায় করা হয়েছে।

ত্রিপুরার সাহিত্যিকদের মধ্যে কালী প্রসন্ন সেনগুপ্তের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজদরবার থেকে প্রকাশিত 'রাজমালা'র তিনিই সম্পাদক বহু তথ্য সম্বলিত এই 'রাজমালা'য় তিনি এর প্রাচীনতা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা আজকের বিচারে যুক্তিপূর্ণ নয় বলে 'রাজমালা' বর্তমান সময়ে বহু বিতর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন। তিনি এই গ্রন্থকে পাঁচশত বছরের প্রাচীন গ্রন্থ বলে ধরে নিয়েছেন।

> "রাজমালা, প্রথম লহর এই ৩২ বৎসর কাল মধ্যে কোন একসময় রচিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহা পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ। যেকালে বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের প্রেমরসাত্মক পদাবলীর সুমধুর ঝংকারে বঙ্গদেশ মুখরিত হইতেছিল, সেইসময় ত্রিপুরার নিভৃত গিরিকুঞ্জে, চন্তাই দুর্লভেন্দ্র এবং পন্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রাজমালা রচনার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণও ইহার সমসাময়িক।" —
>
> ('রাজমালা' — প্রথম লহর — পৃষ্ঠা — ৮২)

তবে এখন পর্যন্ত যে সব প্রমাণ রয়েছে, তাতে বোঝা যায়, অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের লেখা কোনো রাজমালা গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়নি। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এর পুঁথি দুটি প্রাচীন হলেও কোনো সন - তারিখ এরমধ্যে নেই।

'চম্পকবিজয়', 'কৃষ্ণমালা', 'শ্রেনীমালা', 'গাজীনামা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্যের কোনো বিস্তৃত আলোচনা এখন পর্যন্ত করা হয়নি। এই কাব্য গুলির পূর্নাঙ্গ আলোচনা বর্তমান আলোচনায় করা হলো। সেই সংঙ্গে আধুনিক কালে(১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে) রাজআমলে যে সব বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টাও করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্ম ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির আগমন ত্রিপুরার আদিবাসীদের জীবনে ও সমাজে যে এক যুগান্তকারী ঘটনা,তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুধর্মের মহত্তর এক জীবনাদর্শ আদিবাসীদের নূতন নূতন সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে বলেই ত্রিপুরা আজ দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

যে দরবারী সাহিত্য এতদিন অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল এবং শুধুমাত্র পুঁথির বর্ণনামূলক তালিকাভুক্ত ছিল, তা আলোচনা করলে নানা তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তা থেকে ত্রিপুরার জাতীয় জীবনের চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি ইত্যাদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

প্রাক্-আধুনিক যুগে (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে) ত্রিপুরার রাজ দরবারে রাজাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তা নিশ্চিতভাবে ধর্মীয় অনুবাদ সাহিত্য। জনসাধারণের মনে ও জীবনে ধর্মবোধকে প্রবলভাবে জাগ্রত করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণাদি গ্রন্থের অনুবাদে সেকথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারণে ত্রিপুরায় প্রথম স্তরে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। ত্রিপুরায় মহারাজা জগৎ মাণিক্যের সময়ে পুরাণের অনুবাদ "ক্রিয়াযোগসার" এবং মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের সময়ে "বৃহন্নারদীয়পুরাণ" রচিত হয়, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্যের (রাজমালা, কৃষ্ণমালা, চম্পকবিজয়, গাজীনামা) যে ধারা সূচিত হয়, তা নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

প্রথমস্তরে মৌলিক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি না হওয়ার অন্যতম কারণ, কবিপ্রতিভার একান্ত অভাব। যাঁরা কাব্য রচনা করতেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তাঁরা কবি ছিলেন না। শুধুমাত্র বৃত্তির খাতিরে ও রাজাদেশ পালনের নিমিত্ত বাধ্য হয়ে অনুবাদ করেছেন। কোনো মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। অন্যদিকে, এক উন্নততর জীবনদর্শের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করায় ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ যে হিন্দুধর্ম প্রসারে মনোনিবেশ করলেন তা নয়, সেই সঙ্গে বঙ্গীয় সংস্কৃতিকেও সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে চেষ্টিত হলেন। এরফলে ধীরে ধীরে বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ত্রিপুরী সংস্কৃতির এক বিরাট যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা ইত্যাদিকে প্রচলিত অর্থে সংস্কৃতি বুঝায় কিন্তু ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি হলো, একটি জাতির সামাজিক রীতিনীতি ও তাদের

জীবনধারণের বাস্তব উপকরণ, মানবসম্পদ ইত্যাদি। বঙ্গীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পূর্বেই ত্রিপুরার নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা বহমান ছিল। এই ধারা দুইভাগে বিভক্ত — একটি লোক সংস্কৃতির ধারা — যা অলিখিত অসংখ্য লোকগাথা ও সঙ্গীতকে আশ্রয় করে নিরবচ্ছিন্নভাবে বহে চলেছে, অন্যটি রাজ দরবারকে আশ্রয় করে রাজানুগ্রহে পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

বহুকাল ধরেই ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ অনুরাগের ভিত্তিতে সাহিত্য ও ললিতকলার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। মহারাজা ত্রিলোচনের শিল্পানুরাগের কথা 'রাজমালা'য় বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী মহারাজা ধর্মমাণিক্য থেকে শুরু করে মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য পর্যন্ত বেশীর ভাগ মহারাজাই সংস্কৃতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় দরবারী সংস্কৃতি সুদৃঢ় হয়। এরফলে বাংলাভাষায় দরবারী সাহিত্য তৈরী হয় এবং ভারতের বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিদের আগমনের ফলে ত্রিপুর দরবারে সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পের প্রসারতা বাড়ে। রাজন্যবর্গ যে আন্তরিকভাবে বাংলাভাষায় মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টিত থাকতেন, তার প্রমাণ মেলে মন্ত্রী রমনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের একটি পত্রে —

> "এখানে আবহমানকাল রাজকার্য্যে বাংলাভাষা ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। ইহা বঙ্গদেশের হিন্দুরাজার পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষতঃ আমি বঙ্গ ভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন মনে করি।" ('ত্রিপুরার ইতিকথা' — পৃষ্ঠা — ৯৭ প্রথম প্রকাশ - শ্রাবণ ১৩৬৫ বাং)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার আত্মিক যোগাযোগ আজ সর্বজনবিদিত। বাংলা ভাষার প্রতি ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সংযোগকে দৃঢ়তর করেছিল। তাছাড়া রবীন্দ্র- ের সংস্পর্শে এসে ত্রিপুরার সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে এবং বিভিন্ন ধরণের কাব্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

ত্রিপুরায় রবীন্দ্র প্রভাব নিঃসন্দেহে সুদূর প্রসারী। মোটকথা, রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরায় আগমন ত্রিপুরায় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়েছে।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ত্রিপুরার রাজণ্যবর্গের সুগভীর অনুরাগ ছিল। তাঁরা বংশ পরম্পরায় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। রাজারা নিজেরাও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের আন্তরিকতা তুলনাহীন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে ত্রিপুরায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের সঙ্গীত রচিত হয়। মহারাজা ধন্যমাণিক্যের আমল থেকে এর পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়ে একেবারে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই ধারা বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে। এই গ্রন্থের "ত্রিপুরায় রাজআমলে রচিত সঙ্গীত, সঙ্গীতানুশীলনের ধারাবাহিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য" পর্যায়ে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্থাপত্যশিল্প ঃ—

স্থাপত্যশিল্পে যে ত্রিপুরার রাজণ্যবর্গের কৃতিত্ব কম নয়, তার প্রমাণ মেলে ত্রিপুরার মঠ - মন্দির ও প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণে। তাছাড়া বয়ন শিল্পে ত্রিপুরীরা যে বংশ-পরম্পরায় নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে তার উল্লেখ আছে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "কিরাত - জনকৃতি" গ্রন্থে।

> "Some of the Tipra Textiles in coloured silk and cotton, particularly the gold and silver embroidered silk "Riyah" or breast covers in narrow strips, is a distinctive and elegent production of the textile art which made Tippera famous. Metal work, wood - carving and sculpture in stone were arts in which the Tippera people excelled. Tipra contribution in the history and culture of Eastern India, particularly East Bengal, has its own unique place."
>
> (Kirata-Jana-Kriti - Page - 139)

আর ভাস্কর্যের প্রতি অনুরাগের চরম নিদর্শন রয়েছে ত্রিপুরার দেবতামুড়া ও ঊনকোটি পাহাড়ের মূর্তিগুলোর মধ্যে।

লোকসংস্কৃতি ঃ—

ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রয়েছে ত্রিপুরী ও অন্যান্য উপজাতিদের সমাজ জীবনে। নানারূপ সামাজিক অনুশাসন, পূজা-পার্বন, বিভিন্ন নিয়মাচার ও পদ্ধতি, শিল্পকর্ম, নৃত্যগীত ইত্যাদিই হলো লোকসংস্কৃতির মূল ভিত্তি। ত্রিপুরায় লোকমুখে প্রচারিত নানা গল্প, গাথা ও সঙ্গীতের মধ্যে উপজাতিদের সমাজ জীবনের নানা চিত্র প্রতিফলিত হয়ে আজ অবধি অলিখিত সাহিত্য রূপে বেঁচে আছে। একটি ত্রিপুরী লোকসংঙ্গীতের নমুনা উদ্বৃতি করা হলো - যা ত্রিপুরার প্রখ্যাত সাহিত্যিক রাজকুমার সমরেশ চন্দ্র দেববর্মা বঙ্গানুবাদ করেছেন।

"হাদুদক্ কলক্ মাইসুই পিংজাগই —
পাগড়ী নুরগ্লিয়া, যাদু পাগড়ী নুরুগলিয়া।
হাদুদক্ কলক্ গুন্যু পিংজাগই —
য়াকুরাই নুরুগ্লিয়া,যাদুয়াকুরাই নুরুগলিয়া
তুইগেরেং গেরেং গাতি চাকুজাগই —
রিহিনই খনালিয়া, যাদু রিহিনই খনালিয়া।
গাতি হলংমা বাংমানি বাগই —
রুকথারই সলাপ্লিয়া, যাদু রুকথারই সলাপ্লিয়া
মাইসিংসিয়ারী বাংমানিবাগই
নাহারই নুরুগ্লিয়া,যাদুনাহারই নুরুগলিয়া"

বঙ্গানুবাদ ঃ—

"দীর্ঘ পার্বত্য পথে কাওন বপন করাতে
(তাহার) পাগড়ী দেখিতে পাইলামনা।
দীর্ঘ পার্বত্য পথে দুপাটি ফুলের গাছ বপন করাতে
(তাহার) গোড়ালি দেখিতে পাইলাম না।
কল কলনাদিনী ঝরণার ধারে ঘাট প্রস্তুত করাতে
ডাকিলেও (সে) শুনিতে পাইল না।
ঘাটে অনেক গুলি পাথর থাকাতে
দৌড়িয়াও (তাহার নিকট) পৌঁছিলাম না।
কুয়াসার আধিক্যে
চেয়েও (তাহাকে) দেখিতে পাইলাম না।"

বর্তমানে বাংলা ভাষার মাধ্যমে এইসব ত্রিপুরী লোকসঙ্গীত, রূপকথা, গল্প ইত্যাদিকে রূপায়িত করার চেষ্টা চলছে। এরফলে ত্রিপুরার উপজাতির সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের এক বিস্তৃত ইতিহাস জনসমক্ষে এসে পৌঁছেছে, যা এতদিন সুষ্ঠুভাব ও ভাষার অভাবে আবৃত ছিল।

রাজমালা

'রাজমালা' গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে নানা মতবিরোধ বর্তমান। অনেকের ধারণা, পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকে বাংলা 'রাজমালা' লেখা হয়েছে।

চিরাচরিত ধারণা যে, মহারাজা ধর্ম্মমাণিক্যের আমলে (১৪৫৮ - ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলায় রাজমালা প্রথম রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে দুর্গামণি উজীরের বক্তব্য হলো —

সুভাষাতে ধর্ম্মরাজে রাজমালা কৈল,
রাজমালা বলিয়া লোকেতে নাম হৈল।
(দুর্গামণি উজীরের রাজমালা ২য় খন্ড — পৃষ্ঠা — ৮৯)

পরবর্তীকালে 'রাজমালা'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয়ও দুর্গামণি উজীরকে সমর্থন করে বলেছেন — ''মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে রাজমালা রচিত হইয়াছিল।'' (রাজমালা - ১ম লহর - মধ্যমণি - পৃষ্ঠা - ৮১)

রাজমালা যে পঞ্চদশ শতকের লেখা তা রেভারেন্ড লঙ্‌ও তাঁর লিখিত রাজমালায় স্বীকার করেছেন।

"The Rajmala is a curiosity as presenting us with the oldest speciman of Bengali composition extant, the first part of it having been compiled in the beginning of the 15th century, the subsequent portions were composed at a more recent date We may consider this then as the most ancient work in Bengali that has come down to us, as the Chaitanya Charitamrita was not written before 1557 and Kritibas subsequently translated the Ramayana "

(Analysis of the Rajmala or Chronicles of Tripura - 1923 A D — 1332 T E - Page - 4)



পরবর্তীকালে অনেকেই লঙ্ সাহেবের এই অভিমতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও একই অভিমত পোষণ করে বলেছেন —

> "......... অগত্যা ধর্ম্মমাণিক্য চন্তাই দুর্লভেন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি ত্রিপুর ভাষায় রচিত ইতিহাস হইতে বাঙ্গলা করিয়া যে কাহিনী শুনাইলেন, তাহাই শুক্রেশ্বর ও বানেশ্বর বাঙ্গলা পয়ারে অনুবাদ করিয়া লইলেন।"
>
> ('বৃহৎবঙ্গ' — ২য় খন্ড - পৃষ্ঠা - ১০১৬)

'রাজমালা' রচয়িতা কৈলাশচন্দ্র সিংহের অভিমত হলো —

"মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য কান্যকুব্জ দেশীয় সেই ব্রাহ্মণকে স্বীয় পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি শুক্রেশ্বর ও বানেশ্বর নামক প্রাচীন পুরোহিতদ্বয়ের নিকট স্বীয় পিতৃপুরুষগণের যে কীর্তি - কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাই বাঙ্গলা পয়ার ছন্দে লিখিত হইয়া 'রাজমালা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।" — ('রাজমালা' - পৃষ্ঠা - ৩৮-৩৯)

উপরি উক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যায় যে, মহারাজা ধর্মমাণিক্যের আমলে বাংলা রাজমালা লেখা হয়।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের মতে, রাজমালা সংস্কৃত "রাজরত্নাকর" গ্রন্থের বাংলায় লেখা মর্মানুবাদ। ১২৯৬ ত্রিপুরাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন —

> "রাজরত্নাকর" নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্ব সময়ে সংকলিত হইতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্মমাণিক্য ..... ত্রিপুরা ৮৬৮ সনে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এখন ত্রৈপুর ১২৯৬ সন। উক্ত "রাজরত্নাকর" এ আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত

রাজমালাব উল্লেখ আছে। সেই প্রাচীন বাজমালা এখন কোথাও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। 'রাজমালা' বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত এবং বাংলা পদ্যে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় রাজমালা রচিত হইয়াছে।''

('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' — পৃষ্ঠা — ৩৯৬)

মহারাজা বীরচন্দ্রের উক্তিতে বোঝা যায়, মহারাজা ধর্ম্মমাণিক্যের আমলে যে রাজমালা লেখা হয়, তা সংস্কৃতে, বাংলায় নয়।

মহারাজা ধর্ম্মমাণিক্যের আমলে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকে যে বাংলা রাজমালা লেখা হয়, এই সম্পর্কে একমাত্র মহারাজা বীরচন্দ্র ব্যতীত অন্য সমালোচকেরা একমত। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরার মিউজিয়ামে ''শ্রীশ্রী রাজরত্নাকরঃ'' নামে বাংলা হরফে একটি সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গেছে। এই পুঁথিতে লেখকের নাম বা রচনার কোনো সন - তারিখের উল্লেখ নেই। এতে মহারাজা ধর্মমাণিক্য যে পূর্বপুরুষদের কীর্তিকাহিনী শোকনার আগ্রহে চন্তাই দুর্লভেন্দ্র সহ পন্ডিত শুক্রেশ্বর ও বানেশ্বরকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন, তার উল্লেখ আছে।

স্ব পূর্ব পুরুষাণাং স ভূপতীনাং বিসারিনীং,
কীর্ত্তিমন্যশ্চ বৃত্তান্তং শ্রোতুমিচ্ছন্ মহীপতিঃ।। ৮।।
('রাজরত্নাকর'ঃ - প্রথম সর্গঃ - পৃষ্ঠা - ১)

অন্যত্র —

রাজংস্তে পূর্ব্বজাতানাং পুরুষাণাং মহাত্মনাং।
বংশ - বিস্তার বৃত্তান্তঃ শ্রোতৃনাং বিস্ময়প্রদঃ।। ৩ ।।
('রাজরত্নাকর'ঃ— দ্বিতীয় সর্গঃ — পৃষ্ঠা — ৪)

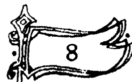
বৃদ্ধং নীতিবিদাং শ্রেষ্ঠং শান্তং সজ্জন সম্মতং।
স্বকুলাচার তত্ত্বজ্ঞং চন্তায়িং দুর্ল্লভেন্দ্রকম্।। ১০ ।।
শুক্রেশ্বরং মদনুজং তথা বাণেশ্বরঞ্চ মাং।
ইদমাহ সমাহূয় সাদরং ধরনীশ্বরঃ।।১১।।
(রাজরত্নাকর ঃ— প্রথম সর্গঃ — পৃষ্ঠা — ২)

শুধু তাই নয়, পন্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর যে রাজাদেশে রাজমালা, দেবভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় প্রণয়ন করেন, তার উল্লেখও এই পুঁথিতে রয়েছে —

মূলং যৎ ভবতা গেয়ং পুরাবৃত্তবিদাম্বর।
শুক্রবাণেশ্বরৌ সর্ব্বং তনুতাং দেবভাষয়া।।২৪।।
পৌরবানাং যথাবার্তা ব্যাসেন ভাষিতা পুরা।
তথা পুণ্যবতাং পাথা দ্রৌহ্যবানাং বিরচ্যতাং ।।২৫।।
তথৈবোক্তবতস্তস্মাৎ শ্রুত্বা রাজ্ঞাতিতোষতঃ।
সংস্কৃতেন নিবন্ধার্থমাদিষ্টো নৌ সহোদরৌ।।২৬।।
সানুজোহমুপাকর্ণ্য বাচং রাজর্ষিনোদিতাং।
রাজরত্নাকরং নাম বিতনোমিপ্রযত্নতঃ।।২৭।।
(রাজরত্নাকর' — প্রথম সর্গ —— পৃষ্ঠা - ৩)

অতএব, উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিতেও প্রমাণিত হয় যে, মহারাজা ধর্মমাণিক্যের আমলে বাংলায় রাজমালা লেখা না হয়ে সংস্কৃতে লেখা হয়।

তবু বর্তমানে প্রাচীন (উল্লিখিত) বাংলা রাজমালা পুঁথির অস্তিত্ব কোথাও খোঁজে পাওয়া যায় না বলে পঞ্চদশ শতকে বাংলা রাজমালা রচনার প্রশ্ন মনে হয় ভিত্তিহীন। অদ্যাবধি যে কয়টি রাজমালা পাওয়া গেছে, তার সবগুলি বাংলায় লেখা। সেজন্য এইগুলির ভিত্তিতে রাজমালার কালনির্ণয়ের বিষয়টি আলোচনা করা সমীচীন বলে মনে হয়।



বাংলা রাজমালা গ্রন্থগুলির মধ্যে দুর্গামণি উজীরের রাজমালা ১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৮) অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত হয়।

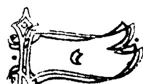
বারশ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি,
তাহাকে সুধিল পুনি উজীর দুর্গমণি।
(রাজমালা'-চতুর্থ খন্ড-গোবিন্দ মানিক্য খন্ড-পৃষ্ঠা-২৭১)

কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের রাজমালার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লহর যথাক্রমে ১৩৩৬ (১৯২৬ইং), ১৩৩৭ (১৯২৭ইং) ও ১৩৪১ (১৯৩১ইং) ত্রিপুরাব্দে প্রকাশিত হয়। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের রাজমালা ১৩০৩ বঙ্গাব্দে (১৮৯৬ইং) প্রকাশিত হয়। আর একটি রাজমালা কলিকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' — এ পাওয়া গেছে। বর্তমানে ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার কর্ত্তৃক ১৯৬১ সালে তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এই রাজমালার লেখক ও সন-তারিখের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু দুর্গামণি উজীর যে এই রাজমালা দেখেছিলেন, তার প্রমাণ মেলে তাঁর লিখিত রাজমালায়। যেমন, পরিষদের পুঁথিতে আছে —

বর্ণসংকর নিয়া রাজা ত্রিলোচন।
কলিতে ক্ষত্রিয় জাতি না রবে কারণ।।
বেদ বেদাঙ্গ জানে দ্বিজে বিধি দিল।
সেই হতে একমাস অসুচ আচরিল।।
(শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজমালা - পৃষ্ঠা - ১১)

আর দুর্গামণি উজীরের গ্রন্থে আছে —

বর্ণসংকর হইলেক রাজা ত্রিলোচন,
কলিযুগে ক্ষত্রী জাতি না রবে কারণ।



বেদ বেদান্ততন্ত্রে দ্বিজে বিধি দিল,
তদবধি মাসাশৌচ ত্রিলোচনের হৈল।

('রাজমালা' — প্রথম খন্ড — দক্ষিণ খন্ড —
পৃষ্ঠা — ৩৯)

আবার ধন্যমাণিক্যের বর্ণনায় পরিষদের পুঁথিতে আছে —

শ্রী ধন্যমাণিক্য রাজা চাটীগ্রাম চলে।
চৌদ্দস পাচত্তিস সকে নিজ বাহুবলে।।
চাটীগ্রাম বিজই বলি মোহর মারিল।
গৌড়েস্বরের সন্যসব ভঙ্গ দিয়া গেল।।
হোসেন সাহা গৌড়পতিই কথা সুনিয়া।
গৌরাই মল্লিক ভেজে বহু সন্য দিয়া।।

(ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার কর্তৃক
প্রকাশিত রাজমালা — পৃষ্ঠা — ২৮)

দুর্গামণি উজীরের 'রাজমালা'য় এর শুদ্ধরূপ হলো —

চৌদ্দশ পাঁচত্রিশ শাকে সমর জিনিল,
চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল।
গৌড়ের যতেক সৈন্য চট্টলেতে ছিল,
শ্রীধন্যমাণিক্য তাকে দূর করি দিল।
হোসন শা গৌড়েশ্বর এ বার্ত্তা শুনিয়া,
বহুল কটক পাঠায় গৌড়মল্লিক দিয়া।

(রাজমালা ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ রত্নমাণিক্য খন্ড ঃ
পৃষ্ঠা — ১০৮ — ১০৯)

দুর্গামণি উজীর এইক্ষেত্রে শুধু কয়েকটি শব্দ বদল ও কিছু বানান শুদ্ধ করে পরিষদের রাজমালাই অনুসরণ করেছেন। তাই বলা যায়, দুর্গামণি উজীরের লেখার আগে পরিষদের রাজমালা লেখা হয়েছিল। কারণ পরিষদ পুঁথির লিপিকরের নাম হিসাবে রামনারায়ণ দেবের নাম পাওয়া যায় — "শ্রীরামনারায়ণ দেব দাস্বাক্ষর" ('রাজমালা' — পৃষ্ঠা — ৭৬) এবং "শ্রী রামনারায়ণ দেব স্বতক্ষের ('রাজমালা' - পৃষ্ঠা - ৬৮)। আবার "চম্পকবিজয়" কাব্যের যে প্রতিলিপি আগরতলায় আছে, তাতেও লিপিকর রামনারায়ণ দেব। তিনি ১২০৬ বঙ্গাব্দে (১৭৯৯ ইং) এই কাব্যের নকল সম্পূর্ণ করেছিলেন। এই দুই ব্যক্তি যদি এক হন, তবে পরিষদ রাজমালা অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে অথবা ঊনবিংশ শতকের প্রথমে নকল করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তাহলে পরিষদ রাজমালার মূল পুঁথি যে অষ্টাদশ শতকের কোনো সময়ে রচিত হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। ফলে বর্তমানে প্রাপ্ত রাজমালা পুঁথিগুলির মধ্যে পরিষদের রাজমালাই আপাততঃ প্রাচীনতম।

তাছাড়া ভাষা ও ভঙ্গীগত দিক থেকে বিচার করলেও এই রাজমালাকে খুব একটা প্রাচীন বলে মনে করা যায় না। রাজামালার কাল যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে এখন নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আরও প্রাচীন কোনো রাজমালার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে পরিষদের রাজমালা পুঁথি যে দুর্গামণি উজীরের পূর্বে লেখা, তাতে কোনো সংশয় নেই। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই অভিমত পোষণ করে বলেছেন —

> "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাজমালার যে পুঁথি আছে (পুঁথি সংখ্যা ২২৫৯) তাহার লিপিকাল দুর্গামণি উজীরের নবসংস্করণের পূর্ববর্তী বলিয়া তাহা অধিকতর নির্ভরযোগ্য।
>
> (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — তৃতীয় খন্ড — পৃষ্ঠা — ১২২৬)

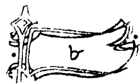
বাংলা রাজমালার পূর্বে যে সংস্কৃত রাজমালা লেখা হয়েছিল, তা মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের চিঠিতে এবং ত্রিপুরার মিউজিয়ামে রক্ষিত ''রাজরত্নাকর'' গ্রন্থের প্রতিলিপি থেকে জানা যায়। তাছাড়া ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ও এই সম্পর্কে ''বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'' গ্রন্থে বলেছেন —

> ''রাজামালায় ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিবৃত্ত
> বর্ণিত হইয়াছে। ইহা চোন্তাই দুর্লভচন্দ্র,
> পন্ডিত শুক্রেশ্বর ও পন্ডিত বাণেশ্বর
> সংকলিত সংস্কৃত 'রাজরত্নাকর' ও 'রাজমালা' অবলম্বনে লেখা''
> (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস —
> প্রথম খন্ড — (অপরার্ধ)—পৃষ্ঠা—৫৩৮)

দুর্গামণি উজীর রাজমালা সংশোধন প্রসঙ্গে বলেছেন —

> ''পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত,
> প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত।
> পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্ব্বে কত,
> সেইত কারণে লোকে নাহি বুঝে যত।''
> ('রাজমালা'—চতুর্থ খন্ড — পৃষ্ঠা — প৭১)

এতে বোঝা যায়, দুর্গামণি উজীর কোনো অসংলগ্ন রাজমালাকে ভিত্তি করে তা সংশোধন করেন। এমন হ'তে পারে যে, তিনি পরিষদের রাজমালা সহ সংস্কৃত রাজমালারই হয়তো সংশোধন করেন। বাংলা ছাড়াও যে সংস্কৃতের বহুল চর্চা রাজদরবারে ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে বর্তমানকালে রাজভান্ডার থেকে প্রাপ্ত সংস্কৃত পুঁথির সংখ্যাধিক্যে।



“রাজমালা” গ্রন্থের মূল্যবিচার ঃ—

'রাজমালা'য় ত্রিপুরার রাজবংশের ক্রম ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত যেসব রাজারা ত্রিপুরা রাজ্যে রাজত্ব করেছেন, তাদের রাজ্যলাভ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাসনকার্য ইত্যাদির বিস্তৃত কীর্তি-কাহিনী রাজমালায় বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যক্তির দ্বারা বাংলায় রাজমালা লিখিত হয়। যাঁরা রাজমালা রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে দুর্গামণি উজীর, কৈলাস চন্দ্র সিংহ ও কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতায় একটি হস্তলিখিত সন-তারিখ বিহীন পুঁথি পাওয়া গেছে, যা বর্তমানে ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার কর্তৃক ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। দুর্গামণি উজীর, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রাজমালা পদ্যে ও পয়ার ছন্দে লিখিত। অবশ্য কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই দিক থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র, তাঁর রাজমালা গদ্যাকারে লিখিত।

মহারাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৬-৩০ খ্রীষ্টাব্দ) দুর্গামণি উজীর সমগ্র রাজমালার কিছু অংশ বর্জন ও সংক্ষেপ করে নূতন একটি রাজমালা রচনা করেন। তিনি যে ১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৮ ইং) রাজমালা রচনা করেন তা নিজগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

> “বারশ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি,
> তাহাকে সুধিল পুনি উজীর দুর্গামণি।
> ('রাজমালা' - চতুর্থ খন্ড - গোবিন্দমাণিক্য খন্ড -
> পৃষ্ঠা - ২৭১)

পরবর্তীকালে এই লিখিত রাজমালা খন্ডাকারে ২৮শে চৈত্র, ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে (১৯০১ ইং) আগরতলার বীরযন্ত্রে, ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।



''রাজমালা'' সংশোধনের কারণ সম্পর্কে দুর্গামণি উজীর বলেছেন —

পূর্ব্ব রাজমালা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে.
পয়ার গাথিল সব সকলে বুঝিতে
('রাজমালা' - দ্বিতীয় খণ্ড -
পৃষ্ঠা - ৮৯)

দুর্গামণি উজীরের বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যায়, ত্রিপুর ভাষায় কোনো একটি রাজমালা রাজদরবারে ছিল। এখন প্রশ্ন হলো যে, ত্রিপুর ভাষায় কোনো রাজমালা থাকা সম্ভব কিনা। যতটুকু জানা যায়, হয়ত সম্ভব নয়। যেহেতু অদ্যাপি ত্রিপুর ভাষার কোনো বর্ণমালা নেই। ফলে রাজদরবারে ত্রিপুরভাষায় কিছু লেখা হয়েছে বলে ধারণা করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। বর্তমানে রাজভান্ডার থেকে যতগুলি পুঁথি পাওয়া গেছে, তার সবগুলিই সংস্কৃত ও বাংলায় লেখা।

বর্তমানে রাজভান্ডার থেকে প্রাপ্ত ''শ্রীশ্রীরাজরত্নাকরঃ'' নামে বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি পুঁথি ত্রিপুরার মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। পুঁথিটি ৬৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ও দ্বাদশসর্গে বিভক্ত। তবে দেখে মনে হয়, এই পুঁথিটি পুরো একটি পুঁথির খণ্ডিত অংশমাত্র। এতে ''শ্রীদুর্ল্লভেন্দ্র উবাচ''র মাধ্যমে প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে রাজা প্রতর্দন পর্যন্ত রাজকাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। যেমন - রাজা প্রতর্দন সম্পর্কে বলা হয়েছে —

কিরাতাধিপতিস্তত্র জ্ঞাত্বা শত্রুবলং মহৎ।
কুপিতঃ সর্ব্বসামন্তানাজুহার রহস্তদা।। ৪৬।।
শিবিরাৎ দূতং স প্রৈষীং ত্রিবেগেশঃ প্রতর্দ্দনঃ।
সর্ব্বং যথোক্তমাখ্যাতুং কিরাতপতি সংসদি।।৪৭।।
(রাজরত্নাকরঃ - দ্বাদশ সর্গঃ - পৃষ্ঠা - ৬৬)

দুর্গামণি উজীর গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন —

পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত,
প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত।
পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্ব্বে কত,
সেইত কারণে লোকে নাহি বুঝে যত।
(রাজমালা - চতুর্থ খন্ড - গোবিন্দমাণিক্য
খন্ড - পৃষ্ঠা - ২৭১)

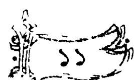
এই 'অলগ্নিক কুৎসিত ভাষা' বলতে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন, তা অনুধাবন করা যায় না। তবে কোনো অসংলগ্ন রাজমালা হয়তো তিনি সংশোধন ও পরিবর্তিত করে প্রকাশ করে থাকবেন, এবং তা সংস্কৃত রাজমালা হওয়াই সম্ভব।

একথা ঠিক, অলিখিত রাজমালা যে মুখে মুখে ছিল, তার প্রমাণ দুর্গামণি উজীরের লিখিত রাজমালার প্রথম খন্ডে পাওয়া যায়। এই খন্ডে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যকে চন্তাই দুর্লভেন্দ্র রাজ কীর্তি - কাহিনী মুখে মুখে বলেছেন বলে জানা যায়।

"ত্রিপুর - ভাষাতে চন্তাই রাজাতে কহয়।"
(দৈত্য খন্ড-রাজমালা-পৃষ্ঠা-৪)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রাজমালায়ও বলা হয়েছে —

আর দুর্ল্লভেন্দ্র নাম চোন্তাই প্রধান।
রাজবংশ কথাতে বড়ই সাবধান।।
... ...
অবধান কর মহারাজ চূড়ামণি।
তোমার বংসের কথা কহিব যে জানি।।
(পরিষদ রাজমালা — পৃষ্ঠা ১)



দুর্গামণি উজীর লিখিত রাজমালার সব খন্ড প্রকাশিত হয়নি, শুধু চারটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খন্ডে মহারাজ*দৈত্য থেকে রত্নমাণিক্য পর্যন্ত রাজকাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই খন্ডে মহারাজা ধর্মমাণিক্যের জিজ্ঞাসায় পন্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর সহ চন্তাই দুর্লভেন্দ্র রাজকাহিনী বলেছেন। দ্বিতীয় খন্ডের বক্তা হলেন রণচতুর নারায়ণ। মহারাজা অমরমাণিক্যের জিজ্ঞাসায় তিনি রাজকাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই খন্ডে মহারাজা ধর্মমাণিক্য থেকে জয়মাণিক্য পর্যন্ত রাজকাহিনী বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় খন্ডে মহারাজা অমরমাণিক্য থেকে কল্যাণমাণিক্য পর্যন্ত রাজকাহিনীর উল্লেখ আছে। এইখন্ডে বক্তা হলেন পন্ডিত সিদ্ধান্তবাগীশ। তিনি মহারাজা রামমাণিক্যের জিজ্ঞাসায় রাজকাহিনী বলেছেন। আর চতুর্থ খন্ডে মহারাজা কল্যাণমাণিক্যের পরবর্তী রাজাদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

কল্যাণমাণিক্য পরে যত রাজাগণ,
রাজা সব লিখা গেল, তার বিবরণ।
('রাজমালা' — চতুর্থ খন্ড - পৃষ্ঠা - ২৭১)

এই খন্ডে মহারাজা রামগঙ্গামাণিক্যের জিজ্ঞাসায় জয়দেব উজীর রাজকাহিনী ব্যক্ত করেছেন।

মহারাজা রামগঙ্গামাণিক্য নৃপবর,
জয়দেব উজীর স্থানে বলেন সাদর।
('রাজমালা' - চতুর্থ খন্ড - পৃষ্ঠা - ২৭২)

কিন্তু পরিষদের রাজমালায় (যা পরবর্তীকালে ১৯৬৭ সনে ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়) দেখা যায় তৃতীয় খন্ডের বক্তা ও শ্রোতার ক্ষেত্রে দুর্গামণি উজীবের রাজমালার সঙ্গে কিছু পার্থক্য রয়েছে। রাজার

কৌতূহলবশে পূর্বপুরুষদের কীর্তি কাহিনী শুনেছেন ও রাজসভা পন্ডিতগণ সময় সময় তা লিখে স্থায়ী করতে চেষ্টা করেছেন পরবর্তীদের জন্য।

পরবর্তীকালে কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের রাজমালা আশ্বিন, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ (১৮৯৬ ইং) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস লিখিত হয়েছে। লেখকেরা তিনপুরুষ যাবত রাজদরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে থাকার ফলে ত্রিপুরার রাজদরবার ও ইতিহাসের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। ফলে গ্রন্থটি বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ। অধ্যাপক মোহিত পুরকায়স্থ মহাশয়ের মতে — "এ রাজমালা শুধু রাজকাহিনী নয়, যথার্থ রাজ্যের ইতিহাস।" (ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য পৃষ্ঠা - ১১৪, প্রথম সংস্করণ - ১৯৫৮)

গ্রন্থটি চারভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে ত্রিপুরার প্রাকৃতিক দৃশ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা, আরণ্যক জীবজন্তু, বিভিন্ন অধিবাসীদের সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মীয় আচার-ব্যাবহারের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে প্রাচীনকাল থেকে মহারাজা বীরচন্দ্র পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজাদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এরমধ্যে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রসঙ্গটি বিশেষ মূল্যবান। তৃতীয়ভাগে, ত্রিপুরা রাজ্যের পাশাপাশি কাছাড়, মণিপুর, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের ও রাজবংশের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর চতুর্থভাগে, প্রাচীন ভুলুয়ারাজ্য বা নোয়াখালি জেলা, ত্রিপুরা জেলা, চাকলা - রোশনাবাদ ও নূরনগর পরগণার বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়।

কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয়ের রাজমালা বর্তমানে বহুল পরিচিত। তাঁর রাজমালা চারটি 'লহর'-এ প্রকাশিত হয়।

প্রথম লহর-এ মহারাজ দৈত্য থেকে রত্নমাণিক্য পর্যন্ত, দ্বিতীয় লহর-এ মহারাজ ধর্মমাণিক্য থেকে জয়মাণিক্য পর্যন্ত, তৃতীয় লহর-এ মহারাজ অমরমাণিক্য থেকে কল্যাণমাণিক্য এবং চতুর্থ লহর-এ গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁর পরবর্তী রাজাদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। প্রত্যেক লহর-এ লেখক 'মধ্যমণি' নামে একটি বিস্তৃত অধ্যায় সংযোজিত করেছেন, যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।



উপরি-উক্ত চারটি রাজমালায় বংশপরম্পরায় মুখ্যত রাজবংশের ইতিহাসই ব্যক্ত হয়েছে। এই রাজমালাগুলিতে ত্রিপুরাবাসীর শৌর্যবীর্যের পরিচয় এবং নানা রাজনৈতিক তথ্যের মোটামুটি সন্ধান পাওয়া যায়। পরিষদ রাজমালা যা বর্তমানে প্রাচীন রাজমালা বলে ধরা যায়, তাতে মহারাজা জয়মাণিক্য পর্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায়। এর পরবর্তী রাজাদের কাহিনী জানার ক্ষেত্রে দুর্গামণি উজীরের রাজমালার উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ, মহারাজা কাশীচন্দ্রের রাজত্বকাল পর্যন্ত ঘটনাবলী নিয়ে দুর্গামণি উজীরের রাজমালার সমাপ্তি হয়েছে। এইদিক থেকে তাঁর রাজমালার বিশেষ মূল্য আছে। তবে তাঁর রাজমালার কাব্যমূল্য খুব বেশী নেই। রাজাদেশে রচনা করার ফলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ছিল মূলতঃ উদ্দেশ্যমূলক। ফলে কবিত্বশক্তির উন্মেষ ততটা ঘটেনি। তাছাড়া রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি দীর্ঘকাহিনী বর্ণনার মধ্যে কবিত্ব প্রকাশের সুযোগও নিতান্ত কম। তবু ত্রিপুর রাজাদের জীবনেতিহাস পূর্বাপর জানতে হলে দুর্গামণি উজীরের রাজমালা নিঃসন্দেহে অপরিহার্য আর বর্তমানে প্রাপ্ত রাজমালাগুলির মধ্যে প্রাচীনত্বের দাবীতে পরিষদের রাজমালার মূল্য স্থিরীকৃত।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের লিখিত রাজমালার মূল্য রয়েছে এর বিষয়-বৈচিত্র্যে। রাজকাহিনীটি মাত্র দ্বিতীয় খন্ডে প্রকাশিত। এই খন্ডে মহারাজা বীরচন্দ্রের শাসননীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এই সমালোচনা যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে করা হয়েছে বলে মনে হয়।

ত্রিপুর সিংহাসনের দাবীতে মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার সঙ্গে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিবাদ শুরু হয়। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে পৌছে। এই বিবাদের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখক কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার পক্ষের লোক হলেও যে তাঁর নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তা মানুষ বীরচন্দ্রের বর্ণনায় প্রমাণ মেলে।

"মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের আকৃতি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মুখশ্রী অনেকটা বাঙ্গালীর ন্যায়, চক্ষু সুন্দর, নাসিকা উন্নত —

মহারাজ বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তিনি একজন সুকবি। .... তাঁহার সমস্ত গীতিকবিতাই প্রেমের কাকলীপূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক ভাবের ছায়াপাতে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ..... সেগুলি প্রকাশ করিতে মহারাজ অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রকাশিত হইলে তিনি বঙ্গীয় কবি সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইতেন।"
— ('রাজমালা' — কৈলাসচন্দ্র সিংহ - পৃষ্ঠা - ২৪৫ - ২৪৬)

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বিরূপ সমালোচনাও করেছেন।

"মহারাজ বীরচন্দ্রের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও কোন কোন বিষয় উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। যদি মহারাজের যত্নে এই সকল উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইত, তাহা হইলে অদ্য আমরা তাঁহাকে ইদানীন্তন ভারতীয় নরপতিমন্ডলীর মুকুটমণি বলিয়া ইতিহাসে বর্ণনা করিতাম" — ('রাজমালা' - কৈলাসচন্দ্র সিংহ - পৃষ্ঠা - ২৪৬-২৪৭)

কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ। শুধু রাজকাহিনী বর্ণনেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। ত্রিপুরার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের এক বিস্তৃত বিবরণও তিনি দিয়েছেন, যা বিশেষ যুক্তি-তথ্য সংবলিত। তাছাড়া তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও রাজ্যগুলির বিস্তৃত বিবরণও এই গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। লেখকের স্বচ্ছ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে এই গ্রন্থপাঠে অনুধাবন করা যায়।

ত্রিপুরাকে জানার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। গ্রন্থটি লেখকের অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার একটি প্রকৃষ্ট দলিল। ত্রিপুরার যথাযথ ইতিহাস জানার

ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি অপরিহার্য। এই গ্রন্থকে রাজমালা না বলে ত্রিপুরার 'গেজেটিয়ার' আখ্যা দেওয়াই মনে হয় যুক্তিযুক্ত।

কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় সম্পাদিত রাজমালা মূলতঃ দুর্গামণি উজীরের রাজমালার অনুসরণে লেখা হয়েছে। ধর্মমাণিক্য এবং অমরমাণিক্য থেকে কল্যাণমাণিক্য পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনে লেখক দুর্গামণি উজীরের রাজমালাকে অনুসরণ করেছেন। তবে তাঁর স্বকীয়তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়, 'মধ্যমণি' সংযোজনে। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের রাজমালার প্রথম তিনটি লহর-এ 'মধ্যমণি' সংযোজিত হয়েছে, যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতে লেখক রাজবংশের রাজত্বকালের শাসন সংক্রান্ত ও রাজনীতিগত বিভিন্ন দিকের বিস্তৃত বিবরণ এবং ত্রিপুরার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের তথ্যবহুল বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন —

> ''রাজমালা ত্রিপুরা রাজবংশের বৃত্তান্ত হইলেও ইহার সঙ্গে উক্ত অঞ্চলের তদানীন্তন সমাজ ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।''
>
> ('বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' - ৩য় খন্ড —
> প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১২২৮)

এইদিক থেকে বিচার করলে কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের রাজমালার একটি স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য হলো —

> "The three time volumes of the Tripura chronicle in Bengali verse, the Rajmala, edited with commentaries, notes and illustrations by Kaliprasanna Sen .... give a full account of the Hindu - Bodo culture of Tripura in all its aspects, with full coloured illustrations and photographs." (Kirata - Jana - Kriti" - page - 139)



কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের রাজমালার প্রথম লহরের খুব একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই বললেও চলে। কারণ, এই লহরে পৌরাণিক যুগই বিশেষভাবে প্রাধান্যলাভ করেছে। তবে পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় লহরে ত্রিপুরার রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস যথাযথ ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাজমালার ঐতিহাসিক ঘটনার কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও এর ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। মনে হয়, প্রাচীন সংস্কৃত রাজমালা বর্তমান বাংলা রাজমালার মূল ভিত্তি, তাছাড়া লোকমুখে প্রচলিত জনশ্রুতি রাজমালা রচনে কার্যকরী হয়েছে।

"কৃষ্ণমালা" কাব্য

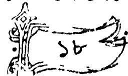
কবি রামগঙ্গা শর্মা।

'কৃষ্ণমালা'র কাহিনী পরিচিতি ঃ-

মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের দুই পাটরাণীর গর্ভে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পাঁচপুত্রের মধ্যে দুইজন অকালে মারা যাওয়ায় অবশিষ্ট তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ইন্দ্রমণি ইন্দ্রমাণিক্য নামধারণ করে রাজা হলেন, যুবরাজ হলেন মধ্যমপুত্র কৃষ্ণমণি আর ছোটভাই হরিমণি হলেন বড়ঠাকুর। তাঁরা তিনজন মিলে সুখে রাজ্যশাসন করছেন — "এমন সময় বিপদ ঘটাইল বিধাতায়।" দক্ষিণদিক পরগণায় সমসের গাজী নামে এক তস্কর, যার দস্যুবৃত্তিই ছিল জীবিকার্জনের একমাত্র পেশা তার জমিদার হবার সাধ মনে জাগে। তখন নিজ মনোবাসনা পূর্ণ করবার জন্য সমসের রোশনাবাদ দখল করতে উদ্যোগী হয়ে হাজীহোসেন নামে ঢাকার এক মোগলপ্রধান, যার নবাব আলীবর্দি খাঁর সঙ্গে ছিল বিশেষ হৃদ্যতা তার সঙ্গে মিলিত হলেন। হাজীহোসেন ও সমসেরের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। হাজীহোসেন ও সমসেরের পক্ষ নিয়ে ইন্দ্রমাণিক্যের বিরুদ্ধে নবাবকে উত্তেজিত করলেন এই বলে —

> ইন্দ্রমাণিক্য পাশ বহু টাকা বাকী।
> আজি কালি দেই বলি নিত্য দেয় ফাঁকি।।
> ....
> যদি পরাক্রম নাহি কর তার সনে।
> হারা হৈবা রোশনাবাদ লয় মোর মনে।।

নবাব তখন সব শুনে ইন্দ্রমাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তাদের আদেশ দিলেন। দুইপক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। কিছুকাল যুদ্ধ করার পর নবাবের সঙ্গে বিবাদ করা ঠিক হবেনা ভেবে ইন্দ্রমাণিক্য নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মনস্থ করলেন এবং সমসেরের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠা যাবে না ভেবে নবাব সাক্ষাতে যাবার সময় যুবরাজ কৃষ্ণমাণিককে বলে গেলেন —



তস্কর সমসেরে রাজ্য পাইল আমার।
তুমি চলি যাও ভাই পর্ব্বত মাঝার।।
পর্ব্বতে আছয়ে পর্ব্বতীয়া প্রজাগণ।
তা সবাকে সঙ্গে করি থাকহ আপন।।

তারপর ইন্দ্রমাণিক্য নবাব দরবারে গিয়ে আর দেশে ফিরলেন না। মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে পুরী নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগলেন।

এদিকে যুবরাজ কৃষ্ণমণি রাজা ইন্দ্রমাণিক্যের রাণী, রাজ-পরিজন ও সহগামীদের সহ রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে অশেষ দুঃখ-কষ্টে জীবনযাপন শুরু করলেন। পরে কৈলাসহরে পুরী নির্মাণ করে সকলকে নিয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। এদিকে সমসের ও হোসেন কৃষ্ণমাণিকে ধরে আনবার জন্য পাঁচকড়ি নামে সেখানকার এক পূর্বতন প্রজাকে নিযুক্ত করলো। পাঁচকড়ি হোসেনের সাহায্য নিয়ে কৃষ্ণমণিকে আক্রমণ করায় কৃষ্ণমণি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে ধর্মনগর হয়ে পাথারিয়া দেশে হাজির হলেন। সেখানকার জমিদার মহম্মদ নাসির যুবরাজ কৃষ্ণমাণিকে সাদর অভ্যর্থনা করে বললেন —

শুন মহারাজ তুমি বিখ্যাত ভুবন।
আমি হেন ভৃত্য তোমার আছে কোনজনে।।
কৃপা করি মোর দেশে করহ বসতি।
আপনার রাজ্য হেন জানি নরপতি।।

কৃষ্ণমণি তখন নাসিরের কথায় প্রীত হয়ে দিনকতক সেখানে বসবাস করে হিড়িম্বদেশে চলে গেলেন। সেখানকার রাজা রামচন্দ্রধ্বজ কৃষ্ণমণিকে পেয়ে খুব প্রীত হলেন ও আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলেন। তারপর সব বৃত্তান্ত শুণে বললেন — 'ই-দেশে তোমার জান না করে সংশয়।।" কৃষ্ণমণি এই প্রিয়বাক্যে খুশী হয়ে তিন বৎসর সেখানে অবস্থান করলেন এবং ভগ্নী সঙ্গামাকে হেড়ম্বরাজের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করলেন। ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে দূতের মাধ্যমে ইন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছায় সকলেই খুব দুঃখিত হলো।

অবশেষে যুবরাজ কৃষ্ণমণি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যথাবিহিত শ্রাদ্ধাদি কার্য সমাপন করলেন।

হিড়িম্বদেশের দক্ষিণে বরবক্রনদীর ওপারে কুকিরা বাস করে। সেই অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায় কুকিরা ত্রিপুরার প্রজা হিসাবে বিবেচিত। সেখানে ত্রিপুরার রাজাদের প্রতিষ্ঠিত এক দেবীমূর্তি আছে। কুকিদের বিশ্বাস এই দেবী খুব জাগ্রত। তাই প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় কুকিরা এই দেবীর কাছে পূজা দিয়ে আনন্দোৎসবে লিপ্ত হয়।

শিলাময়ী এক দেবী আছেন তথায়।
স্থাপন করিছে পূর্ব্বে ত্রিপুর রাজায়।।
সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ ধরে দশ কর।
দেবী নামে পূজা তান হয় পূর্ব্বাপর।।

হেড়ম্বরাজ্যে যুবরাজ কৃষ্ণমণির অবস্থানের সংবাদ পেয়ে কুকিরা ভেটসহ সেখানে এসে কৃষ্ণমণিকে তাদের দেশে নিয়ে যেতে চাইলো। কৃষ্ণমণি তখন তাদের খুশী করবার জন্য সপরিবারে কুকিদের দেশে গিয়ে খর্গ নদীর তীরে পুরী নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগলেন।

খর্গ নদীর তীরে পুরী নির্মাইয়া।
তথা রৈল যুবরাজ পরিবার লৈয়া।।

কুকিরাও তখন ভক্তি গদগদ চিত্তে —
করিয়া দেবতা জ্ঞান প্রতি নিত্য সেবে।।

এদিকে ত্রিপুরার সিংহাসনে তখন সমসের গাজী অধিষ্ঠিত এবং হাজিহোসেন হলেন মন্ত্রণাদাতা। সমসের গাজী সিংহাসনে বসেই প্রজাদের নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিরা পর্বতাঞ্চলে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে ঢাকায় বন্দী অবস্থায় উজীর উত্তরসিংহ ত্রিপুরাবাসীদের পত্রের মাধ্যমে এই অনুরোধ জানালেন যে, তারা যেন সমসের গাজীর আনুগত্য কোন অবস্থায় স্বীকার না করে।

শুনহ ত্রিপুর সব হৈয়া সাবহিত।
সমসেরের সঙ্গে না মিলিয়া বা কদাচিত।

ত্রিপুরাবাসী তখন উত্তরসিংহের নির্দেশ অনুযায়ী সমসের গাজীর আনুগত্য না মেনে পর্বতাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। সমসের তখন নিজেকে বিপন্ন বোধ করে নানাভাবে দেশত্যাগীদের দল ভাঙ্গাতে কৃতসংকল্প হয়ে শেষপর্যন্ত বৃদ্ধ রামধন উজীরকে নিজদলে টানতে সক্ষম হলেন। রামধন উজীর তখন সমসেরের পক্ষে ত্রিপুরাবাসীদের আনার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে দেশভক্ত সেনাপতিদের হাতে প্রাণ হারালেন। তারপর ত্রিপুর সেনাপতিরা গোমতী তীর্থের পূর্বে মায়োনী পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত রিহাঙ্গ পাড়ায় গেলেন। কিছু সংখ্যক প্রজারাও তাদের সঙ্গে অনুগমন করলো। এদিকে রামধন ঠাকুর নিহত হয়েছে খবর পেয়ে হাজীহোসেন ত্রিপুরার প্রজাদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার সর্তে উত্তরসিংহকে মুক্তি দিলেন। উত্তরসিংহ সর্তানুযায়ী প্রজাদের সমসেরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলায় ত্রিপুর সেনাপতিরা তার এই বিপরীত মনোভাবের জন্য তাকে বন্দী করে রিহাঙ্গ পাড়ায় নিয়ে গেলেন।

তারপর ত্রিপুরাবাসীরা কৃষ্ণমণিকে রিহাঙ্গে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালো তিনি এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রিহাঙ্গে এসে ত্রিপুর প্রধানদের ডেকে বললেন —

রাজ্য হেতু চেষ্টা নাই কহ কি কারণ।।
উদ্যোগ বিহনে কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয়।
দিবেক কেবল দৈবে কাপুরুষে কয়।।

এই কথায় উৎসাহিত হয়ে ত্রিপুর প্রধানরা আবদুল রজক নামে সমসেরের এক অনুচরকে ত্রিপুরার পক্ষে যোগদানের জন্য প্ররোচিত করলো। প্রথমে রাজী হয়েও কার্যকালে আবদুল রজক সমসেরের পক্ষেই রয়ে গেলো। ত্রিপুরার কলঙ্কস্বরূপ রণমর্দননারায়ণ সমসেরের পক্ষে গেলেন। যুদ্ধে সমসের জয়ী হওয়ায় পরাজিত কৃষ্ণমণি রিহাঙ্গ ছেড়ে লাঙ্গাই নদীর তীরে অবস্থিত বঙ্গপাড়ায় চলে গেলেন।

সমসের তখন আবদুল রজক ও রণমর্দনারায়ণের উপর রিহাঙ্গের ভার আরোপ করে ফিরে এলেন। বুঝতে পারলেন ত্রিপুর সৈন্যদের ও জনসাধারণের রাজানুগত্য অপরিসীম। ফলে ত্রিপুর রাজবংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে না বসালে তাদের বশে আনা এবং সহযোগিতা লাভ করা যাবে না ভেবে সমসের তখন ধর্মমাণিক্যের পৌত্র বলঙ্গ ঠাকুরকে উদয়পুর থেকে এনে লক্ষ্মণমাণিক্য নাম দিয়ে রিহাঙ্গের সিংহাসনে বসালেন।

লক্ষ্মণমাণিক্য নাম তখনে করিয়া।
রাজা করিলেক তানে রিহাঙ্গেতে গিয়া।।

কিন্তু ত্রিপুরার জনসাধারণ তাতেও বশ্যতা স্বীকার করলো না। এদিকে ত্রিপুর প্রধানরাও বসে নেই, তারা নূতন উদ্যমে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে জয়দেব কবরার নেতৃত্বে রিহাঙ্গ আক্রমণ করে শত্রুসৈন্যদের পরাস্ত করলেন। পরাজিত লক্ষ্মণমাণিক্য তখন আবদুল রজক ও রণমর্দন সহ আত্মরক্ষার্থে সমসেরের কাছে পালিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে খুচুদফা ও লুচিদফা নামে দুইজন কুকি দস্যু ত্রিপুরী প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করলো। ফলে যুবরাজ প্রজাদের রক্ষার জন্য চেষ্টিত হলেন। নিজ পরিবারবর্গকে হিড়িম্ব দেশে রেখে তিনি কুকি উপদ্রবের সমাধানকল্পে নিজ অনুগত রাংখলপাড়ার কুকিদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। কৃষ্ণমণি তাদের সব বুঝিয়ে বলাতে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। যুবরাজ যুদ্ধের ফলাফল জানবার উৎসুক্যে দেবীর পূজা করতে গিয়ে অনুভব করলেন — "যুদ্ধে জয় না হৈব-হৈব উপদ্রব।" তবু যুবরাজ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু সেই যুদ্ধে ত্রিপুর সৈন্যরা পরাজিত হলো। যুবরাজ কৃষ্ণমণি তখন নিজেই যুদ্ধে গেলেন। অতর্কিতে একটি বিষমাখা তীর তাঁর পায়ে এসে বিঁধায় তিনি হতচেতন হলেন। চেতনা হারাবার আগে যুবরাজ ভক্তিভরে দেবীর ধ্যান করে চৌতিশা স্তব করায় প্রাণ ফিরে পেলেন। রাংখলপাড়ার বহু প্রজা নিহত হয়েছে দেখে তিনি ছাকাছেব পাড়ায় গিয়ে গোবর্ধন সেনাপতিকে আবার যুদ্ধে পাঠালেন। যুদ্ধে যাবার পূর্বে আবার দেবীর পূজা করে যুবরাজ এবার

জয়ের আভাস পেলেন। প্রবল উৎসাহে গোবর্ধন একে একে কুকি দুস্যুদের দমন করলেন। আছেকদফার কুকিরা ভেটসহ এসে যুবরাজকে এই অভিযোগ জানালো—

আমি সব ত্রিপুর রাজার প্রজা বটি।
কিন্তু খুচুঙ্গের সঙ্গে বলে নাহি আঁটি।।
খুচুঙ্গকে দমন করহ তুমি এবে।
ত্রিপুর রাজাকে কর দিব আসি সবে।।

তারপর খুচুঙ্গকে দমন করে গোবর্ধন আবার লুচিদফা কুকি দমনে অগ্রসর হলেন। লুচিদফার সৈন্যসংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। গোবর্ধন তবু সাহসে ভর করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এই ভরসায় যে, কুকিরা বন্দুকের ব্যবহার জানে না, শুধু ঢাল-তলোয়ারই তাদের একমাত্র সম্বল। ফলে যুদ্ধে বন্দুকের ব্যবহার দেখে ভীত হয়ে লুচিদফা বশ্যতা স্বীকার করলো। গোবর্ধন তখন তাদের কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে ফিরে এলেন।

এইভাবে কুকি দমনের পর যুবরাজ কৃষ্ণমণি লোক মারফৎ হিড়িম্বদেশ থেকে নিজ পরিবারবর্গকে এনে চাথেঙ্গা নদীর তীরে পুরী নির্মাণ করে প্রজাদের সহ সেখানে বসবাস করতে লাগলেন।

রামচন্দ্রধ্বজের পুত্র হরিশ্চধ্বজ তখন হিড়িম্ব রাজ্যের রাজা। নাবালক রাজার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ পুরোহিত রাজ্য পরিচালনা করছেন। সেইসময় বরবক্র নদীর উত্তরে চাথেঙ্গা নদীর কূল পর্যন্ত ছিল হিড়িম্ব রাজ্যের সীমানা। হিড়িম্ব রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ যুবরাজ কৃষ্ণমণির এই অবস্থান খুব সুদৃষ্টিতে গ্রহণ করলেন না। ভাবলেন আজ না হলেও অদূর ভবিষ্যতে-যুবরাজ হিড়িম্ব রাজ্য আক্রমণ করতে পারেন। তখন সিদ্ধান্ত হলো —

এথা যুবরাজকে আনিয়া পকেড়িয়া।
তথা হতে খেদাইব অপমান দিয়া।।

এই সংবাদ পেয়ে যুবরাজ নিজ দুরবস্থার কথা ভেবে আবার পূর্ব উপকূলে ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলেন। এদিকে হিড়িম্ব সেনারা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে যাত্রাপুর এসে পৌঁছলো। একদিন পাত্র-মিত্র সহ যুবরাজ কৃষ্ণমণি শিকার করতে গিয়ে হিড়িম্ব সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন। কিন্তু নিজ সৈন্য কম থাকায় যুবরাজ পরে শোধ নেওয়া যাবে ভেবে পূর্ব উপকূলে ফিরে গেলেন। হিড়িম্ব সেনারা তখন যুবরাজের পরিত্যক্ত পুরী লুণ্ঠন করে করে দেশে ফিরে গেলো।

এদিকে নবাবের আদেশে সমসের গাজী বন্দী হলেন। নবাব তার দস্যুবৃত্তির খবর পেয়ে তাকে নিধন করলেন।

নবাব নিকটে যদি উপস্থিত হৈল।
দস্যু বটে সত্য এই নবাবে জানিল।।
ততক্ষণে দিল তাকে নিগড় বন্ধন।
কতদিন পরে তাকে করিল নিধন।।

সমসেরের পর তার অনুচর আবদুল রজক আবার উৎপাত শুরু করলো। কৃষ্ণমণি তখন শ্রীহট্টের শাসনকর্তা আলিমের সহায়তায় তাকে দমন করলেন।

এইসময় হিড়িম্ব দেশের কয়েকজন প্রজা অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃষ্ণমণির সঙ্গে এসে যোগ দিয়ে বললো যে, যদি যুবরাজের হিড়িম্ব রাজ্য দখল করার অভিলাষ থাকে, তবে তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। যুবরাজ তখন পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য সৈন্য-সামন্ত সহ যুদ্ধ করবার জন্য তৈরী হলেন। কিন্তু কার্যকালে হিড়িম্ব দেশের প্রজারা বিশ্বাসঘাতকতা করে হিড়িম্ব রাজের পক্ষে গিয়ে জানালো যে, ত্রিপুর সৈন্য দেশ আক্রমণ করতে আসছে। হিড়িম্বরাজ এই খবরে যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন। দুই পক্ষের যুদ্ধে ত্রিপুর সৈন্যরা জয়ী হলো। খাসপুর পর্যন্ত দখল করার পর যুবরাজের কাছে পত্র গেলো এই বলে—

রাজ্য ছাড়ি ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করি।
ভঙ্গ দিয়া গিয়াছে হিড়িম্ব অধিকারী।।

অতএব — "আপনে আসিয়া এই দেশে হও রাজা।" কিন্তু কৃষ্ণমণি নিজের দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। ফলে উত্তরে লিখলেন —

আমি সে দেশেতে রাজা হইব কি কারণ।।
যবে আমা নিজ রাজ্য দেয় নারায়ণ।
পৈত্রিক দেশেতে রাজা হইব তখন।।

তারপর যুবরাজ ত্রিপুর সেনাপতিদের দেশে ফিরে আসতে আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে জয়ের আনন্দে ত্রিপুর সৈন্যরা হিড়িম্ব দেশে তিনমাস অবস্থান করলো। এদিকে হিড়িম্বরাজ জয়ন্তিয়া দেশের রাজার কাছে এই বিপদে তাকে সাহায্য করবার জন্য — "যৈন্তা দেশেতে দূত দিল পাঠাইয়া।" যৈন্তারাজ তখন ত্রিপুর সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য যে সৈন্য পাঠালেন তাদের যুদ্ধ কৌশলে বেশ কিছু ত্রিপুর-সৈন্য বিনষ্ট হলো।

সেইসময় মেহেরকুলের শাসনকর্তা ছিল আবদুল রজকের পুত্র সোনাউল্লা। ত্রিপুর সেনাপতিরা তখন রাজ্য উদ্ধারের জন্য মেহেরকুল আক্রমণ করলো। এই অতর্কিত আক্রমণে সোনাউল্লা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যাওয়ায় মেহেরকুল ত্রিপুর সৈন্যদের অধিকারে এলো। এরপর ত্রিপুরসৈন্যরা অগ্রসর হয়ে দক্ষিণদিকে আবদুল রজককে আক্রমণ করলো। যুদ্ধে আবদুল রজককে পরাজিত করে যুবরাজ কৃষ্ণমণি নিজ রাজ্য দখল করলেন এবং খোয়াই নদীর তীরে এক পুরী নির্মাণ করে চলে এসে দুইজন বিশ্বস্ত অনুচরকে রাজ - স্বীকৃতির জন্য মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে পাঠালেন। মুর্শিদাবাদ থেকে তখন খিলাতসনন্দ নিয়ে মীর আজিজ এলেন মেহেরকুলে। সেখানে ইন্দ্রমাণিক্যের পুরানো বিশ্বস্ত কর্মচারীদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি রয়ে গেলেন। কিন্তু

মীরআজিজের মনে ছিল রাজ্যলিপ্সা, ফলে তিনি কিছু সৈন্য যোগাড় করে দুইবার যুদ্ধ করেও হেরে গেলেন। এই যুদ্ধে তার পুত্র মীরইছব ওসেনাপতি জিয়নখাঁর মৃত্যু হওয়ায় অরনন্যোপায় হয়ে তিনি ঢাকায় পালিয়ে যান। এইভাবে শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য নিষ্কন্টক হলো এবং যুবরাজ কৃষ্ণমণি তারপর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজভক্ত প্রজাদের অভিলাষ অনুযায়ী সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

এগারশ সত্তের সন হএত তখন।
আগরতলা রাজধানী করিল রাজন।।
....
তারপরে পাত্রগণে রাজার আদেশে।
নির্মাইল নগর আগরতলা দেশে।।

(রাজমালা - চতুর্থ লহর - কৃষ্ণমাণিক্য
খন্ড — পৃষ্ঠা - ৫১)

কিন্তু কিছুদিন পর রাজ্যে আবার উৎপাত শুরু হলো। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মহম্মদ রেজা খাঁ ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করায় কৃষ্ণমণিকে আবার রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হলো। এই সময় হ্যারী ভারলেস্ট সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজরা চট্টগ্রাম আক্রমণ করে। কৃষ্ণমণি তখন ইংরেজদের সহায়তায় আবার রাজ্য ফিরে পেলেন। ইতিমধ্যে আবদুল রজক আবার উৎপাত শুরু করায় কৃষ্ণমণির নিয়োজিত মাণিকলাল নায়ের তাকে দক্ষিণশিকের যুদ্ধে পরাস্ত করে মুর্শিদাবাদে ধরে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে হত্যা করা হয়।

মুর্শিদাবাদেতে নিল বান্ধি হাতে গলে।।
তথা তাকে ধরি বধিল পরাণে।
গেল সেই পাপমতি শমন ভবনে।।



ইতিমধ্যে কুকিপ্রজারা কর দিতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় গোবর্ধন ঠাকুর ও ভদ্রমণি সেনাপতি তাদের দমন করলেন।

এদিকে ইংরাজ প্রধান হ্যারী ভারলেষ্ট ব্রহ্মদেশ অভিযানে কৃষ্ণমণির সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কৃষ্ণমণি তখন হৃদ্যতার ভিত্তিতে জয়দেব রায় ও লুচির্দপ নারায়ণকে তাঁর সাহায্যার্থে পাঠালেন।

তা সবের সহিতে চলিল জয়দেবে।।
তান সঙ্গে চলে লুচিদর্প নারায়ণ।
প্রনমিয়া নৃপতিরে চলে দুইজন।।

হ্যারী ভারলেষ্ট তখন তাদের সঙ্গে করে হিড়িম্ব রাজ্যে গেলেন। হিড়িম্বরাজ তাঁদের দেখে ভীত হয়ে পালিয়ে গেলেন। সেখানে অবস্থানকালে হ্যারী ভারলেষ্ট দূতমুখে খবর পেলেন, মুর্শিদাবাদের নবাব কাশেমআলী খানের আদেশে তাঁর দেওয়ান বৃন্দাবন ঢাকায় এসে ইংরেজ কুঠি লুট করছে। তখন তিনি তাদের দমন করবার জন্য সত্বর সুলটিন সাহেবকে পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধে নবাবপক্ষ হেরে গেল। তারপর সুলটিন সাহেব সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাবকে আক্রমণ করলেন। নবাব যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যাওয়ায় বাংলা ইংরেজদের অধিকারে এলো।

নবাব পলাই গেল হারি পাই লাজ
বাঙলার অধিপতি হইল ইংরাজ।।

ইতিমধ্যে হ্যারী ভারলেষ্ট হিড়িম্ব রাজ্য থেকে ফিরে এসে চট্টগ্রামে বাস করতে লাগলেন। এই সুযোগে মহারাজ ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র বলরাম রায় মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাবের সমর্থনলাভ করে ত্রিপুরা রাজ্য দখল করতে এগিয়ে এসে আবার অবস্থা বুঝে পালিয়ে গেলেন। এদিকে ময়ূর সাহেবকে কেন্দ্র করে ইংরাজদের সঙ্গে কৃষ্ণমণির অকস্মাৎ বিবাদ শুরু হয়। ইংরাজদের সঙ্গে শত্রুতার ফল ভাল

হবে না ভেবে তিনি ১১৭৬ ত্রিপুরাব্দের পৌষমাসে (১৭৬৬ খ্রীষ্ঠাব্দে) নিজেই হ্যারী ভারলেষ্টের সঙ্গে কোলকাতায় গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। — ''ত্রিপুর এগারশত ছিয়াত্তর সন। পৌষমাসে নৃপ কলিকাতায় গমন।'' পরে তাঁর সহায়তায় মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে নিজের স্বত্ত্ব কায়েমী করে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে এসে 'মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য' নামধারণ করে দেশ শাসনে প্রবৃত্ত হলেন। এইভাবে ত্রিপুর ইতিহাসের একটি সংঘাতপূর্ণ অধ্যায় শেষ হলো। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণমালা ঃ—

ত্রিপুরার রাজদরবারে রাজবংশীয়দের কাহিনী ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ে এক শ্রেণীর কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যগুলির মূল ভিত্তি ইতিহাস হবার ফলে এইগুলিকে ইতিহাসশ্রিত কাব্য বলা যায়। বিভিন্ন সময়ের লেখা 'রাজমালা', 'রাজ-রত্নাকর', 'শ্রেণীমালা', 'চম্পকবিজয়', 'গাজীনামা' প্রভৃতি কাব্যগুলি এই শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে। আলোচ্য কাব্য 'কৃষ্ণমালা'ও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ত্রিপুর রাজবংশীয়রা সব সময়ই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। উপরি-উক্ত কাব্যগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাঙালী স্বভাবতঃই আত্মবিস্মৃত হবার ফলে ইতিহাসের প্রতি তাদের স্বাভাবিক প্রবণতার অভাব ছিল। সেইজন্যই 'রাজসিংহ' রচনার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপ ছিল যে, বাঙালীর কোন ইতিহাস নাই। অথচ বাঙলারই পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ হয়তো বংশ-গরিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অথবা অন্য যে কোন কারণে নিজেদের অতীত কাহিনী সংরক্ষণে উৎসাহী হয়েছিলেন যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। রাজা রাজধর মাণিক্য জয়ন্ত চন্তাইকে যেভাবে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাস রচনার ধারা সম্বন্ধে তিনি মোটেই অজ্ঞ ছিলেন না। রাজধর মাণিক্য কৃষ্ণমাণিক্য সম্বন্ধে জয়ন্ত চন্তাইকে প্রশ্ন করছেন —

রাজ্য ছাড়ি বিদেশেতে গেলেন যখন।
তাঁহার সঙ্গতি বল গেল কতজনে।।
দেশছাড়ি কোথা ছিল কতেক বৎসর।
পুনরপি কোন মতে হৈল রাজ্যেশ্বর।।
কতদিন নিজ দেশে হৈল নরপতি।
করিল কতেক যুদ্ধ কাহার সংহতি।।
কোন যুদ্ধে কোনজনে সেনাপতি ছিল।
কোথা জয় পাইল কোথা পরাজয় হৈল।।
কতদিন ছিল বনে পাইয়া নিজ দেশ।
কত দান ধর্ম্ম রাজা করিল বিশেষ।।
শুনিতে সে সব কথা মোর মনে লয়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্ব কথা কহ মহাশয়।।

তার উত্তরে জয়ন্ত চন্তাই কৃষ্ণমাণিক্যের অনেক কীর্তিকাহিনীর কথা বললেন, কারণ তিনি ছিলেন বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

কত শুনিয়াছি কত দেখিয়াছি সাক্ষাত।
সে সব বৃত্তান্ত আমি জানি নরনাথ।।

এরফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'কৃষ্ণমালা' কাব্যে ইতিহাসের যথার্থ উপকরণ রয়েছে, যা সিদ্ধ ও সুপ্রচুর।

'কৃষ্ণমালা' কাব্য রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) সংঘাতময় জীবন ও বীরত্বের কাহিনী নিয়ে রচিত। রাজা হয়েও কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্ব খুব সুখের ছিল না। অনেকবার তাঁকে রাজ্যলাভের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যচ্যুত অবস্থায় তিনি দীর্ঘদিন বনে-জঙ্গলে পরিভ্রমণ করেছেন এবং সময়ে সময়ে রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

করেছেন। ত্রিপুরার অন্যান্য রাজাদের মত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তিনি রাজা হয়ে সিংহাসনে বসতে পারেননি। রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের এই সংগ্রাম রাণা প্রতাপসিংহের জীবন-সংগ্রামকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দীর্ঘকাল দুঃখ-দারিদ্র্যে দিন কাটিয়ে কখনও প্রকাশ্যে, কখনও অপ্রকাশ্যে তিনি ত্রিপুরার স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসা ও গৌরবের দাবী রাখে। দীর্ঘকাল সংগ্রাম করার পর পরিশেষে ১১৭০ ত্রিপুরাব্দের (১৭৬০খ্রীঃ) ১লা পৌষ যুবরাজ কৃষ্ণমণি "মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য" নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজধর মাণিক্য যখন ত্রিপুরার রাজা, তখন তিনি জয়ন্ত চন্তাই-এর মুখে জ্যেষ্ঠতাতের বীরত্ব কাহিনী শুনে খুব উজ্জীবিত হন এবং এই অপরিসীম বীরত্বের কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করার মানসে রামগঙ্গা নামে এক ব্রাহ্মণকে ডেকে এই কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনার আদেশ দেন।

শ্রী শ্রীযুত রাজধর মাণিক্য রাজার।
আদেশে করিব কৃষ্ণমালার প্রচার।।
রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের বিমল বৃত্তান্ত।
জয়ন্ত চন্তাই মুখে শুনি আদি-অন্ত।।
....
জয়ন্ত চোন্তাই মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া।
রামগঙ্গা নামে দ্বিজ আনে আদেশিয়া।।
আমি রামগঙ্গা স্থানে কহিল রাজন্।
কর দ্বিজ বড় এক পুস্তক বচন।।

দুর্গামণি উজীরের রাজমালায় এই প্রসঙ্গে বক্তব্য হলো —

উজীর বলে বিজয় মাণিক্য অভ্যন্তরে।
কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজ হৈল তার পরে।।

তান কীর্তি রাজধর মাণিক্য আদেশে।
জয়ন্ত চন্তাই পূর্ব্বে বলিছে বিশেষে।।
কৃষ্ণমালা নাম পুস্তক বিস্তার কাহিনী।
রামগঙ্গা-বিশারদ রচিল তখনি।।

(রাজমালা-চতুর্থ খন্ড — কৃষ্ণমাণিক্য খন্ড — পৃষ্ঠা — ৪৬)

কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে কবি কাব্যে কিছু উল্লেখ করেননি। তবে রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকালের (১৭৮৫ খ্রীঃ — ১৮০৩ খ্রীঃ পর্যন্ত) কোন সময়ে এই কাব্য রচিত হয়েছিল বলে অনুমেয়।

কবি নিজ দৈন্য সম্পর্কে সচেতন, তাই কাব্যের শুরুতেই বিদগ্ধজনের কাছে সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে বলছেন —

পন্ডিত জনেরে কহি বিণয় বচন।
অশুদ্ধ দেখিলে পদ করিবা শোধন।।
সাধুয়ে পাইলে গ্রন্থ সদর্থ করয়।
যদি দোষ দেখে তাহে উদ্ধারিয়া লয়।।
গুণ না দেখিয়া দোষ দেখে খল জনে।
তাহার দৃষ্টান্ত এই দেখ বিদ্যমানে।।

'কৃষ্ণমালা' হস্তলিখিত কাব্য। যে কোন কারণে মুদ্রণের কোন অবকাশ হয়নি। বীরের যুদ্ধ - কাহিনীকে কেন্দ্র করে কাব্য-সাহিত্য লেখার প্রবণতা প্রথম দেখা যায় ঊনবিংশ শতকে বঙ্কিমসাহিত্যে। তারপর আধুনিক যুগে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও মধুসূদনের কাব্যে এই প্রচেষ্টা আরও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকে বিচার করলে ত্রিপুরায় রচিত রাজমালা, রাজ-রত্নাকর, কৃষ্ণমালা, চম্পকবিজয়, গাজীনামা প্রভৃতি কাব্য নিঃসন্দেহে অগ্রগামীত্বের দাবী রাখে।

রাজা ধন্যমাণিক্যের আমল (১৪৬৩ - ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে) থেকেই ত্রিপুর রাজদরবারে সংস্কৃতের প্রসারতা কমে গিয়ে বাংলা ভাষা প্রথম রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বাংলাভাষায় উৎসাহদানের জন্য তিনি রাম নামে একজন কবির দ্বারা 'প্রেত চতুর্দ্দশীর পাঁচালী' রচনা করিয়েছিলেন। তাছাড়া 'উৎকল-খন্ড পাঁচালী', 'যাত্রা রত্নাকরনিধি' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় লেখা হয়।

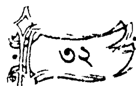
শ্রী ধন্যমাণিক্য রাজা কমলার পতি।
উৎকলখন্ড পাঁচালী রচাইল মহামতি।।
জ্যোতিষে যাত্রা রত্নাকর-নিধি আর।
পাঁচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার।।
(রাজমালা - ধন্যমাণিক্য খন্ড - পৃষ্ঠা - ২৯)

তাছাড়া তিনি জনসাধারণের মধ্যেও বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীন প্রসারতা ঘটান। সংস্কৃত প্রাকৃতজনের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য না হবার ফলে রাজারাও দেখা যায়, এর পৃষ্টপোষকতায় বিমুখ ছিলেন। ফলে সর্বজনবোধ্য বাংলা ভাষায় ত্রিপুরার দরবারী সাহিত্যগুলি রচিত হয়। 'কৃষ্ণমালা'র কবিও এই প্রসঙ্গে বলছেন —

রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের যতেক বৃত্তান্ত।
আমা ঠাঁই কহিয়াছে চন্তাই জয়ন্ত।।
সে সব সংবাদ তুমি করিয়া শ্রবণ।
প্রাকৃত ভাষায় এক পুস্তক রচন।।
দেববাণী বুঝিবারে নারে সর্ব্বলোকে।
পয়ার প্রবন্ধে সবে বুঝিবেক সুখে।।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে "কৃষ্ণমালা" —

জয়ন্ত চন্তাই নামে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা রাজা কৃষ্ণমাণিক্যেব



জীবনকাহিনী রাজা রাজধর মাণিক্যের নিকট বিবৃত হয়েছে যা 'কৃষ্ণমালা' কাব্যে যথাসম্ভব বিধৃত। জয়ন্ত চন্তাই এই প্রসঙ্গে নিজেই বলছেন —

কত শুনিয়াছি কত দেখিয়াছি সাক্ষাত।
সে সব বৃত্তান্ত আমি জানি নরনাথ।।

ফলে 'কৃষ্ণমালা' কাব্যের কাহিনীতে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ঘটবার সুযোগ কম বলেই ধারণা করা যায়। এই কাব্য নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ। রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকাল, বিভিন্ন ধরণের সংঘাতপূর্ণ ঘটনাবলী ও তথ্য এবং স্থানীয় ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণে এই কাব্য বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ।

কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকাল থেকে রাজা রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকাল পর্যন্ত ত্রিপুরার কাল, অরাজকতার কাল বলে চিহ্নিত। কোন সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রশাসন না থাকার ফলে দেশের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ব্যাপক আকারে ছিল। এই সময়ে যে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, কাব্যে তার উল্লেখ আছে।

অরাজক হৈয়া রাজ্য দিন কত ছিল।।
উপদ্রব হৈল দেশে না আছয়ে রাজা।
দুর্ভিক্ষ মরক হৈয়া মরিলেক প্রজা।।

রাজ্যে অরাজকতার সুযোগ নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের স্থানে স্থানে কুকি প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজাকে কর দেওয়া বন্ধ করতো। কিন্তু একদিকে রাজ অনুচরদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য, অন্যদিকে কৃষ্ণমাণিক্যের জেদ, আত্মবিশ্বাসের জন্যই এইসব আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়েছিল। কুকি প্রজাদের জীবন-প্রণালীর নানা তথ্য, তৎকালীন পাহাড়-পর্বত, নদী-উপত্যকার নাম, ত্রিপুর রাজবংশীয় ও রাজ অনুচরদের কূটনৈতিকতার বিভিন্ন কাহিনীতে 'কৃষ্ণমালা' কাব্য খুবই তথ্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ।



পার্বত্য প্রজারা সুযোগ বুঝে মাঝেমাঝে বিদ্রোহ প্রকাশ করলেও তাদের যে অপরিসীম রাজানুগত্য ছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। রাজ সন্দর্শন থেকে সাময়িক বিচ্ছিন্নতাই এইসব বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। প্রয়োজনের সময় আবার তারা বিনা বিচারে রাজপক্ষ সমর্থন করে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছে। কৃষ্ণমাণিক্য যখন রাজ্যচ্যুত অবস্থায় হিড়িম্ব দেশে বাস করছিলেন, তখন বরবক্র নদীর দক্ষিণে বসবাসকারী কুকি প্রজারা এসে বললো —

আমি সবে পুরুষাণুক্রমে তুমি রাজা।
আমরাহ পুরুষাণুক্রমে তোমার প্রজা।।
....
আমি সবে সেবা করিবেক নিতিনিতি।
পরিবার সনে তথা চল নরপতি।।

এই পর্বতীয়া কুকি সম্প্রদায় পরম নিষ্ঠাভরে পুরুষাণুক্রমে রাজসেবা করে এসেছে। এদের নিষ্ঠা ও আনুগত্যের জন্যই ত্রিপুরার রাজবংশের নানারকম আত্মকলহ থাকা সত্ত্বেও মুসলমান আক্রমণকে প্রতিহত করে সুদীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি, সময় বিশেষে রাজা ও রাজ অনুচরদের আহার্য বস্তুও তারা দিনের পর দিন যুগিয়েছে।

ভক্ষণ সামগ্রী যত দেয় কুকি সবে।
করিয়া দেবতা জ্ঞান প্রতি নিত্য সেবে।।

তাছাড়া যুবরাজ কৃষ্ণমণি যখন রাজ্য হারিয়ে বনে-জঙ্গলে দিনের পর দিন পরিভ্রমণ করেছেন, তখন এরাই রাজাকে সবদিক থেকে রক্ষা করেছে, নানাভাবে সাহায্য করেছে। বহিঃশত্রুরা পার্বত্য অঞ্চল বারবার আক্রমণ করলে কুকিদের সাহস ও অমিত বিক্রমের জন্যই তাদের প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরার স্বাধীনতাকে বারবার রক্ষা করেছে এরাই। তাই এদের অবদান ত্রিপুরার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে।

সমসের গাজী একটি নাম, যিনি ত্রিপুরার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ চরিত্র। তিনি কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন ও ত্রিপুরা দখল করেন। ফলে রাজ্যচ্যুত কৃষ্ণমাণিক্য ত্রিপুরার বণপ্রদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কৃষ্ণমালা কাব্য অনুযায়ী সমসের গাজীর পরিচয় হলো — 'ডাকাইত'। দস্যুবৃত্তিই ছিল তার একমাত্র পেশা।

সমসের গাজী এক আছিল তস্কর।
পরগণে দক্ষিণশিক ছিল তার ঘর।।
দস্যুবৃত্তি করি ধন করিয়া সঞ্চয়।
হইবারে জমিদার তার মনে লয়।।

এবং "তার সঙ্গে নানা জাতি ডাকাইত আছিল।" অবশ্য ত্রিপুরার সমস্ত ঐতিহাসিক কাব্যে সমসের গাজীর একই পরিচয় বিধৃত। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের অল্পকাল পরে ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর ত্রিপুরার তৎকালীন রাজা যশোধরমাণিক্যের কাছে হস্তীকর দাবী করে বসলেন। যশোধরমাণিক্য তা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে বন্দী করে দিল্লীতে নেওয়া হলো। সেখানে হস্তীকর দানের স্বীকৃতি দিয়ে তিনি মুক্ত হলেন। এই সময়েই ত্রিপুরার নানাস্থানে মুসলমান জমিদার নিযুক্ত করা হয়। তারপর দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য মোগল প্রাধান্য কিছুটা খর্ব করলেও হস্তীকর দাবী থেকে মুক্তি পেলেন না। পরবর্তীকালে ইন্দ্রমাণিক্য মুর্শিদাবাদ দরবারে দেয় কর ঠিকমত না দিতে পারায় সমসের গাজী এই সুযোগটুকুই গ্রহণ করলেন। মোগল প্রধান হাজি হোসেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাঁর মারফৎ নবাবকে বলে পাঠালেন —

রাজা ইন্দ্রমণি কর না দিল সর্বথা।।
ইন্দ্রমাণিক্যের পাশ বহু টাকা বাকী।
আজি কালি দেই বলি নিত্য দেয় ফাঁকি।।
পূর্বেই ত্রিপুর রাজা নবাব সহিতে।
শুনিয়াছি নিরুপণ করিছে নানামতে।।



রাজা ইন্দ্রমাণিক্যের সঙ্গে তখন রাজ্যলিপ্সু সমসেরের তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শেষে ইন্দ্রমাণিক্য বোঝাপড়ার জন্য গেলেন মুর্শিদাবাদের দরবারে। কিন্তু তিনি আর ফিরে না এসে সেখানকার গঙ্গাতীরে বাস করাই মনস্থ করলেন। এদিকে যুবরাজ কৃষ্ণমণি সমসেরের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারলেন না। পরে ইন্দ্রমাণিক্যের নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিপুরার বনপ্রদেশে চলে গেলেন।

তস্কর সমসের রাজ্য পাইল আমার।
তুমি চলি যাও ভাই পর্বত মাঝার।।
পর্বতে আছয়ে পর্বতীয়া প্রজাগণ।
তা সবাকে সঙ্গে করি থাকহ আপন।।

ত্রিপুরার রাজসিংহাসন সমসেরের অধিকারে এলেও ত্রিপুরার প্রজাসাধারণ তাকে মেনে নেয়নি। হস্তীকর দেবার প্রতিশ্রুতিতেই সমসের নবাবের সমর্থন লাভ করেছিল। ত্রিপুরা দখল করার পর সেই প্রতিশ্রুতি পালনের নিমিত্ত খেদার কাজ শুরু করতে গেলে ত্রিপুরাবাসীরা চরম অসহযোগিতা করে। সমসের তখন অনন্যোপায় হয়ে বাংলাদেশের লোক দিয়ে খেদার কাজ সম্পন্ন করে।

না আসিল ত্রিপুর লোক তখনে জানিয়া।
খেদা করে সমসের বাঙ্গাল লোক দিয়া।।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে রাজাবিহীন ত্রিপুরার জনসাধারণ আপন অসহায় অবস্থার মধ্যেও সমসের গাজীকে সমর্থন করেনি। সমসের তখন প্রজাদের সমর্থন লাভের জন্য এক কৌশল অবলম্বন করলেন। নিজে সিংহাসনে না বসে ধর্মমাণিক্যের পৌত্র বনমালী ঠাকুরকে 'লক্ষ্মণমাণিক্য' নাম দিয়ে সিংহাসনে বসালেন। তিনি নামে মাত্র রাজা হয়ে রইলেন কিন্তু দেশের সর্বময় কর্তা হলেন সমসের গাজী। কিন্তু — "তথাপিও নাহি মিলে ত্রিপুর সমুদায়।"



ত্রিপুর প্রজাদের পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণমাণিক্যের দীর্ঘকাল রাজ্য হারিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থানের অন্যতম কারণ হলো মুসলমান শক্তির সংঘবদ্ধতা আর ত্রিপুর-শক্তির দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতা। অথচ শুধু প্রজারাই নয়, ত্রিপুরী প্রধানদেরও তিনি সমর্থন লাভ করেছিলেন। রাজার সঙ্গে তারাও সেদিন — "মন দুঃখে করে বাস অরণ্যেতে গিয়া।"-সমসের কোন অবস্থায় প্রজাদের সমর্থন না পেয়ে শেষপর্যন্ত দল ভাঙ্গাতে চেষ্টিত হলেন। একমাত্র উজীর রামধন বিশ্বাস সমসেরের দলে এসে ত্রিপুরী প্রধানদের সমসেরের অনুচর হতে মন্ত্রণা দেওয়ায় তারা স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন — "আমরা তাহারে কর না দিব কখন।" আর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য উজীর রামধন বিশ্বাস তাদের হাতে নিহত হলো।

কিন্তু তা সত্তেও ত্রিপুরী প্রধানরা সব সময় বিশ্বস্ত ছিলেন বলে মনে করবার কোন কারন নেই। পূর্বাপর অনুধাবন করলে এই সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, ঐকান্তিক চেষ্টা ও একাত্মতার অভাবেই কৃষ্ণ মানিক্য বহুবার পরাজিত হয়েছেন। অবশ্য কৃষ্ণ মানিক্যেরও তা অজানা ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন-

"আমরার আত্মদলে চিত্ত শুদ্ধি নাই,
সেই সে কারনে এত পরাভব পাই"

'কৃষ্ণমালা'র দ্বিতীয় খন্ডে মায়োনী নদীর তীরে ত্রিপুর সেনাপতি কাঠিরায়ের সঙ্গে সমসেরের যুদ্ধে সমসেরই জয়ী হলেন শুধু ত্রিপুর প্রধানদের নিষ্ঠা ও চেষ্টার অভাবে। এই পরাজয়ের পর দল ভেঙ্গে যায়।

উত্তর সিংহ নারায়ন উজির প্রভৃতি।
না আছিল চিত্ত শুদ্ধি যুবরাজ প্রতি।।
ছিদ্র পাইয়া উজীর প্রভৃতি কতগুলো।
রিহাঙ্গ ছাড়িয়া গেল হাকড় মন্ডল।।



ত্রিপুরার রাজশক্তি যে অমাত্যবর্গের হাতে কত অসহায় অবস্থায় ছিল, তা এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারনাই মনে বদ্ধমূল হয়।

কৃষ্ণমালার কবির কাব্যবোধ অপেক্ষা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী যে বিশেষ সুদৃঢ় ছিল, তা তাঁর ঘটনা বিন্যাস থেকে প্রমানিত হয়। ত্রিপুরার বীরত্ব কাহিনীকে তিনি ঐতিহাসিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বার বার মুসলমান আক্রমনকে প্রতিহত করে ত্রিপুরা বীরত্বের গৌরব অর্জন করেছে এবং তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে ঔদার্য। ত্রিপুর সেনাপতি জয়দেব রায় যখন আবদুল রজকের সৈন্য দলকে পরাস্ত করলেন, তখন বেশ কিছু সৈন্য পালাতে না পেরে তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করে প্রান ভিক্ষা চাওয়ায় তিনি চরম ঔদার্যে নিজ সৈন্যদলকে বলেন —

শরণাগতের বধ যুক্তি নাহি হয়।।
ক্ষমা কর রণে সবে বীরধর্ম স্মরি।
হত শেষ সৈন্যসব যাওক ঘরে ফিরি।।

কিন্তু এত করেও সমসের গাজী ত্রিপুরায় একচ্ছত্র আধিপত্য রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর দস্যুতার খবর শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে এসে পৌঁছলো। নবাব তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ প্রাণদন্ড দিলেন।

সমসের গাজীকে ধরি নিবার কারণ।
নবাব আদেশে দূত আসিয়া তখন।।
সমসের গাজীকে লৈয়া করিল গমন।
....
কতদিন পরে তাকে করিল নিধন।

সমসেরের মৃত্যু সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। দুর্গামনি উজীরের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়।



দুষ্টতা জানিয়া তাকে সাবধানে রাখে।
তোপেতে উড়ায় গাজী সর্ব্বলোকে দেখে।।

কিন্তু 'গাজিনামা' কাব্যের কবি সমসেরের মৃত্যু সম্পর্কে অন্য অভিমত পোষণ করেন। তিনি বলছেন যে রংপুরে আগাবাখর ষড়যন্ত্র করে তোপমুখে তাকে উড়িয়ে দেন। কিন্তু তাতে সমসেরের মৃত্যু হয়নি বলেই কবির ধারণা। তাঁর এ সম্পর্কে অভিমত হলো —

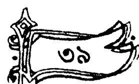
মোহাশব্দ হৈল তোপ ধুমে অন্ধকার।
প্রহরেক অন্ত পুড়ি হৈল ছারখার।।
কেহ বোলে দেখি তানে মক্কা মদিনাত্র।
অনিত্য সংসার ছাড়ি বদন লুকাত্র।।
— গাজি নামা

সমসের গাজীর ত্রিপুরায় আধিপত্য থাকাকালীন তাঁর অনুচর আবদুল রজক ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে দক্ষিণশিক ও মেহেরকুল অধিকার করে ত্রিপুরার সমতল ভূমিতে তিনি কায়েমী হয়ে বসলেন।

সমসের গাজিরকে নবাব নিছে ধরি।
আবদুল রজাকে এবে রাজ্য অধিকারী।।

তখন আবার আবদুল রজককে বিতাড়িত করার প্রশ্ন দেখা দিল। তারই ভিত্তিতে ত্রিপুর প্রধানরা রাজাকে এক পত্রে লিখছেন —

সমর করিয়া তাকে করি পরাজয়।
হইবা নৃপতি যদি শ্রীহরি করয়।।



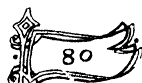
কৃষ্ণমাণিক্য তখন সুচিন্তিত পরিকল্পনায় শ্রীহট্টের নবাব আবুতানির শরণাপন্ন হলেন। পূর্বে ইন্দ্রমাণিক্যের সঙ্গে নবাবের বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। সেই পথ ধরে নবাব কৃষ্ণমাণিকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। তাঁর আন্তরিক সাহায্যের জন্যই আবদুল রজক যুদ্ধে পরাজিত হয়। কিন্তু আবদুল রজকের পুত্র সোনাউল্লা তখন মেহেরকুলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। লুচিদর্পনারায়ণ তাকেও কঠোর হস্তে দমন করলেন। এইভাবে একে একে ত্রিপুরায় মুসলিম আধিপত্য বিনষ্ট হলো। যুবরাজ কৃষ্ণমণি তখন সিংহাসন নিষ্কন্টক দেখে মুর্শিদাবাদে পরোয়ানার জন্য দূত পাঠালেন। যুবরাজের দূত তখন —

নবাব নিকটে গিয়া হৈল উপস্থিত।
জানাইল সমাচার নবাব বিদিত।।
যুবরাজ নরপতি হইতে কারণ।
পরোয়ানা নবাবে দিলেন ততক্ষণ।।

এইভাবে রাজস্বীকৃতি পাবার পর যুবরাজ কৃষ্ণমণি আপাততঃ কৈলাগড়ে (বর্তমান কসবা) বসবাস করবেন বলে ঠিক করে ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৭৬০ খ্রীঃ) আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমী তিথিতে কৃষ্ণমাণিক্য নামধারণ করে রাজা হন।

আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব দশমীর দিনে।
ত্রিপুরা এগারশত সত্তেরের সনে।
কৃষ্ণমাণিক্য রাজখ্যাতি হইল তখন।
(রাজমালা - চতুর্থ লহর -
কৃষ্ণমাণিক্য খন্ড - পৃষ্ঠা - ৫০)

প্রজারাও এই খবরে খুশী হয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলো। কবি প্রজাদের এই আনন্দ উৎসবের একটি সুন্দর বর্ণনা কাব্যে দিয়েছেন।



তারপর রাজ্যের প্রধানরা এসে রাজানুগত্য প্রদর্শন করে বললো —

চকোর বিকল যেন নিশাচর বিনে।
তেনমত আমি সব তোমার কারণে।।

কৃষ্ণমণিও অতীতের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে গিয়ে রাজ্যরক্ষায় মন দিলেন। বিশ্বস্ত অনুচরদের হাতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের ভার আরোপিত হলো। নবাব পক্ষের ফৌজদার মীরআজিজের দেওয়ান রামবল্লভ কর প্রদানের ব্যাপারে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে গেলেন। ঠিক হলো যে নবাব পক্ষের খাজনা ফৌজদার মীরআজিজের মারফৎ পাঠানো হবে। কিন্তু এই সূত্র ধরেই আবার বিপদ এলো। মীরআজিজ ত্রিপুরা দখল করার মনোবাসনায় চট্টগ্রাম থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আক্রমণ করলেন কিন্তু লুচিদর্পনারায়ণের সামনে টিকতে না পেরে পালিয়ে গিয়ে জয়দেব রায়কে আক্রমণ করলেন। জয়দেব রায় পূর্ব থেকে প্রস্তুত থাকায় মীরআজিজ তাঁর সঙ্গেও পেরে উঠলেন না। অতঃপর পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। যুদ্ধে তাঁর পুত্র মীর ইছব নিহত হলো।

ত্রিপুরায় ইংরেজদের আগমন এবং কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে ইংরেজ সম্পর্ক —

মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণ করার পর নবাবের পাওনা চাক্‌লা, রোশনাবাদের রাজস্ব নিয়ে নবাবের ফৌজদারের সঙ্গে কৃষ্ণমাণিক্যের বিবাদের যে সূত্রপাত হয়, তাকে ভিত্তি করেই ইংরাজরা ত্রিপুরায় আসেন। কৈলাস সিংহ মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রাজস্ব নিয়ে কলহ যখন সংগ্রামে উন্নীত হলো, তখন ফৌজদার কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নবাবের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। নবাব তখন ইংরাজ বাহিনীর সাহায্যের জন্য গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে সৈন্য প্রেরণ করতে অনুরোধ করলেন। গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের নির্দেশে তখন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হ্যারী ভারলেষ্ট ১৭৬১ সালে নবাবী ফৌজদারের সাহায্যার্থে লেঃ মেথুসকে পাঠালেন ত্রিপুরায়। নবাবপক্ষে

সৈন্য পাঠানোর পেছনে ত্রিপুরায় বাণিজ্য বিস্তার করাই ছিল ইংরাজদের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। তাঁদের এই উদ্দেশ্যকে স্পষ্টতর করার জন্য কৈলাস সিংহ মহাশয় গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের হ্যারী ভারলেষ্টকে লেখা একটি পত্র উদ্ধৃত করেছেন। —

> "ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ত্রিপুরা
> অধিকার করিবে এবং নবাবের কর্মচারীগণকে
> বলিবে যে তাহারা এই ঘটনা নবাবকে
> জানাইতে পারেন। নবাব এ সম্বন্ধে যাহা প্রশ্ন
> করিবেন তাহার উত্তর আমরা নবাবকে
> প্রদান করিব।"
> (রাজমালা - কৈলাসচন্দ্র সিংহ - পৃষ্ঠা - ১২৮)

এতে বোঝা যায়, নবাবের পক্ষে ত্রিপুরা অধিকার করা ইংরাজদের উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও নবাবেরই প্রয়োজনে ইংরাজ সৈন্য ত্রিপুরায় আসে। ইংরাজরা এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে কৃষ্ণমাণিক্যকে অতি সহজে পরাস্ত করে ত্রিপুরার সমতল অংশ অধিকার করলেন। অবশ্য শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাসাশ্রিত কবিতা' গ্রন্থে অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যসহ কৈলাস সিংহের মতকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণমালায় এইসব ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। তবে এটুকু সত্য যে, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের সময়েই ইংরেজদের সঙ্গে ত্রিপুরার বন্ধুত্ব ও যোগসূত্র স্থাপিত হয়। চট্টগ্রামের ইংরাজ শাসনকর্তা হ্যারী ভারলেষ্টের সঙ্গে কৃষ্ণমাণিক্যের বন্ধুত্বের কথাই কৃষ্ণমালায় বিশেষ করে বলা হয়েছে।

কৈলাস সিংহ মহাশয় আরও বলেছেন যে, ইংরাজদের কাছে কৃষ্ণমাণিক্যের আত্মসমর্পণের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা রোশনাবাদের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করে এবং রেসিডেন্ট লিক্ সাহেবকে রোশনাবাদের প্রথম শাসনকর্তা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা রোশনাবাদের রাজস্ব ১০০০০১ টাকা ধার্য করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, কৃষ্ণমালা কাব্যে এই

প্রসঙ্গেরও কোন উল্লেখ নেই। তবে কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যুর পর অরাজকতার সুযোগে লিক্ নামে একজন ইংরাজ যে রাজ্য পরিচালনা করেছেন, তার উল্লেখ রয়েছে।

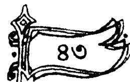
শ্রীকৃষ্ণমাণিক্য যদি পরলোক হৈল।
অরাজক হৈয়া রাজ্য দিন কত ছিল।।
....
লিক্ নামে এক ইংরাজে রাজ্য শাসে।।

কিন্তু এই প্রসঙ্গেও মতদ্বৈততা বর্তমান। কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যুর পর মহারাণী জাহ্নবী দেবী কিছুকাল রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু সেই সময় ইংরাজ সরকারের পক্ষ থেকে যে লিক্ সাহেব শুধু কর গ্রহণ করতেন তা রাজমালায় লিখিত আছে।

লিক্ সাহেব জমিদারী প্রজার কর লয়ে।
রাজ্যের মুস্‌রা রাণী পায় সে সময়ে।।

তবে নুরনগরের কাছে কৈলাগড়ে কৃষ্ণমাণিক্য যুদ্ধ না করে ইংরাজদের কাছে যে নতি স্বীকার করেছেন, এসব কথা কৃষ্ণমালায় নেই।

১৭৫৯ - ৬০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন মহম্মদ রেজা খাঁ। তিনি রোশনাবাদ দখল করার বাসনায় দেওয়ান রামশঙ্করকে যুদ্ব করার জন্য সৈন্য পাঠালেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে ইংরাজেরও দেওয়ান ছিলেন। কিছুদিন যুদ্ধ করার পর কৃষ্ণমাণিক্য সন্ধি করতে চাইলে দেওয়ান রামশঙ্কর সন্ধি করতে অস্বীকার করে কৈলাগড় আক্রমণ করলেন। এই আক্রমণ ঠেকাতে না পেরে কৃষ্ণমাণিক্য পশ্চাদপসরণ করে ভাদুঘর গ্রাম পেরিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে গেলেন। এই সময়েই রেজা খাঁ ইংরাজপ্রধান হ্যারী ভারলেষ্টের দ্বারা আক্রান্ত হন।



হেনকালে বহুতর সৈন্য সঙ্গে করি।
ইংরাজে চাটিগ্রাম লইলেক ঘিরি।।
হাড়ি বিলাস নামে সাহেব হাসিয়া।
মামুদ রাজাখাঁকে দিল খেদাইয়া।

এই খবর পেয়ে দেওয়ান রামশঙ্কর তৎক্ষনাৎ চট্রগ্রাম চলে গেলেন। ফলে কৃষ্ণমাণিক্য আবার রাজ্য ফিরে গেলেন। কৃষ্ণমালার বর্ননা অনুযায়ী চট্রগ্রাম অধিকারের পর লেঃ মেথুস রোশনাবাদ জয় করতে এলেন। তাতে কৃষ্ণমাণিক্য ভীত হয়ে সিঙ্গারবিলে আশ্রয় নিলেন। মেথুস সাহেব তখন আশ্বাস দিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং মরিয়ট সাহেবকে কুমিল্লা রেখে তিনি আবার চট্রগ্রামে ফিরে গেলেন।

কৃষ্ণমালার এই ইংরাজ সম্পর্কের অংশ খুব স্পষ্ট নয়। মহম্মদ রেজা খাঁকে দমন করে ইংরাজ ত্রিপুরায় এলো, না নবাবী ফৌজদারের সাহায্যার্থে এলো, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত থাকায় কোন সঠিক ধারনা মেলে না। কৃষ্ণমালার বক্তব্যও এই ক্ষেত্রে সঠিক বলে মনে হয় না। তবে কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে ইংরাজের সম্পর্ক যে খুব হৃদ্যতাপূর্ন ছিল, এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। চট্রগ্রামের শাসনকর্তা হ্যারী ভারলেষ্টের সঙ্গে কৃষ্ণমাণিক্যের বন্ধুত্ব যে বহুকালের তা কবির উল্লেখেই স্থির প্রত্যয় হওয়া যায়। ‘ইষ্টালাপ পরস্পরে ছিল বহুতর’’ সুদৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তিতো কৃষ্ণমানিক্য ইংরাজদের রাজপুরীতে হোলী খেলায় নিমন্ত্রন করেছিলেন। হ্যারী ভারলেষ্ট ও খুশী মনে এই নিমন্ত্রন গ্রহন করে কয়েকজন ইংরাজসহ ত্রিপুর রাজবাড়ীতে এলেন।

বিধিমতে দোলযাত্রা করি সমাপন।
পাঠাইল সাহেব নিকটে নিমন্ত্রন।।
ইংরাজ সকলে পাইয়া নিমন্ত্রন।
রাজপুরে গেল হুলি খেলার কারন।।

কবি এই হোলী খেলার বিবরন ও অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন—

আতর গোলাপ গন্ধে সভা আমোদিত।।
সুগন্ধি আবিরচূর্ন আনি ভারে ভারে।
পুঞ্জ পুঞ্জ করি রাখে সবার মাঝারে।
পাত্রগন সহিতে বসিল মহারাজ।
হাড়িবিলাস সাহেবপ্রভৃতি ইংরাজ।।
সবে মিলে বসি তথা খেলাইল হুলি।
ফল্গুচুর্ণ পরস্পরে অঙ্গে মারে মেলি।।
সুললিত নানা বাদ্য চতুর্দিকে বাজে।
নর্ত্তকী সকল নাচে মনোহর সাজে।।

ইংরাজদের এই রাজপুরীতে হোলী খেলার বিবরন আর কোথাও নেই। হোলী উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবার পর হ্যারী ভারলেষ্ট ব্রহ্মদেশ অভিযানে রাজাকে সঙ্গী হতে বললেন। কৃষ্ণমানিক্য তখন রাজকার্যবশতঃ নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করে ত্রিপুর প্রধান জয়দেব রায় ও সেনাপতি লুচিদর্প নারায়নকে ইংরাজ সাহেবের সঙ্গে দিলেন।

এই সময় পূর্বভারতের ইতিহাসে দেখা যায় দ্রুত পট পরিবর্তন। কৃষ্ণমাণিক্য আবার এক বিপদের সম্মুখীন হলেন। মেয়ার সাহেব (কৃষ্ণমালায় যাকে 'ময়ূর' বলা হয়েছে) রোশনাবাদ দখল করতে এগিয়ে এলেন। যুদ্ধে জয়ী হয়েও কৃষ্ণমাণিক্য চিন্তিত হলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে হ্যারী ভারলেষ্টের সাহায্যকল্পে তিনি তখন কলিকাতায় চলে গেলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের ব্যক্তিত্ব ও ত্রিপুরাবাসীর সাহস ও বিক্রম সুবিদিত। সুদীর্ঘকাল বনে - বনান্তরে কাটিয়ে, যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে তিনি এখন ক্লান্ত ও অবসন্ন। মনের সেই জোর আর নেই

— নেই সেই সাহস ও আত্মবিশ্বাস। বীর্যবান চরিত্রের এ এক করুণ পরিণতি। কৃষ্ণমালার কবির বর্ণনাগুণ নিঃসন্দেহে উন্নতমানের। অতি সুন্দরভাবে কৃষ্ণমাণিক্যের নিজের কথায় এই করুণ পরিণতির রূপটি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। উজীরকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণমাণিক্য বলছেন —

শুনহ উজীর তুমি নিশ্চয় বলিয়ে আমি
মনে বাঞ্ছা নাই পৃথিবীর।
দুঃখ এই বড় ছিল চোরে রাজ্য হরি নিল
ইকারণে দহিত শরীর।।
দ্বাদশ বৎসর বনে ভ্রমিলাম নানা স্থানে
সেইসব আছে তোমা মনে।
তাহে যত ক্লেশ পাইল ভাগ্যেতে জীবন রৈল
স্মরিতে শিহরি উঠে প্রাণে।।
ভগবানে দয়া করি স্বদেশে ঘটাইল ফিরি
সেই চোর করিয়া বিনাশ।

কৃষ্ণমাণিক্য ১১৭৬ ত্রিপুরাব্দে (১৭৬৬ খ্রীঃ) কোলকাতায় এলেন। কোলকাতায় এসে কালিঘাটে মায়ের পূজা দিলেন, যার সুদীর্ঘ বিবরণ কাব্যে রয়েছে। কোলকাতায় আসার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে বলরাম ঠাকুরের বিরুদ্ধে নবাবী পরোয়ানা সংগ্রহ করা, অন্যদিকে কিংলাক ইংরাজের গতিরোধ করা। হ্যারী ভারলেষ্টও বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করলেন। নবাব দরবারে গিয়ে কৃষ্ণমাণিক্যকে পরোয়ানা পাইয়ে দিলেন। কৃষ্ণমাণিক্যের বৈচিত্র্যময় জীবনের অংশ এইখানে শেষ হয়েছে। তারপর তিনি কিছুকাল নির্বিবাদে রাজত্ব করেছিলেন।

- কৃষ্ণমালার মূল্যবোধ শুধু রাজনৈতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির দিক থেকেও এর মূল্যবোধ রয়েছে।

কৃষ্ণমালা কাব্যে দেখা যায়, কৃষ্ণমাণিক্য যুদ্ধে কুকিদের বিষমাখা তীরে আহত হয়ে মূর্ছিত প্রায় অবস্থায় নিজ মঙ্গলের জন্য দেবীর চৌতিশা স্তব করছেন। এখানে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব খুব স্পষ্ট। কারণ মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে চৌতিশা স্তব অন্যতম। মঙ্গলকাব্যেও দেখা যায়, নায়করা বিপন্ন হয়ে দেবীর চৌতিশা স্তব করেছেন। এই কাব্য অষ্টাদশ শতকের পরিসরে লিখিত। পনের শতকের লেখা মঙ্গলকাব্যের প্রভাব কবির উপরে থাকাই যুক্তিযুক্ত।

কুকি সংস্কৃতি —

লুসাই ও কুকিরা মূলতঃ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ত্রিপুরার পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা। প্রাচীনকালে এরা 'কিরাত' নামে পরিচিত ছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সমতল ভূমির অধিবাসীরা তাদের কিরাত নামে অভিহিত করেছিল। কাছাড়ের অধিবাসীরা তাদের লুসাই বলতো। এই নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন - 'লু' শব্দের অর্থ মাথা এবং 'চাই' শব্দের অর্থ হলো কর্তন করা। ফলে লুসাই শব্দের অর্থ একত্রে দাঁড়ায় মাথা কর্তনকারী। এটি স্বীকৃত যে, লুসাই শব্দ 'লুচাই' শব্দেরই অপভ্রংশ। উনিশ শতকের মধ্যভাগেও লুসাইরা তাদের নেতাদের শেষকৃত্যের সময় মাথা কাটাতো। লুসাই ও কুকি দুইটি ভিন্ন উপজাতি নয়, বরং এই দুইটি শব্দ মূলতঃ সমার্থক। লুসাই-এর তুলনায় কুকি সমধিক পরিচিত শব্দ। পরবর্তীকালে এই কুকিরা পনেরটি ভাগে বিভক্ত হয়, তারমধ্যে মাত্র পাঁচটি শ্রেণীর কুকি উপজাতিকে ত্রিপুরায় দেখতে পাওয়া যায়।

'কৃষ্ণমালা' কাব্য নয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই নয়টি অধ্যায়ের পরিসরে কবি কুকিদের জীবনযাত্রা, যুদ্ধপদ্ধতি ও তাদের সমাজের যে বিভিন্ন চিত্র এঁকেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। যদিও মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের সংঘাতময় ও বৈচিত্রপূর্ণ জীবনকাহিনী বিধৃত করাই কবির মূল লক্ষ্য ছিল, তবু এরই ফাঁকে ফাঁকে পার্বত্য কুকি জাতির জীবনকাহিনী বিস্তৃতভাবে কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কুকিরা জাতি হিসাবে দুর্ধষ ও বেপরোয়া। এইজন্য ত্রিপুরার যুদ্ধ বিগ্রহে সমসময় কুকিদের ছিল বিরাট ভূমিকা। কৃষ্ণমাণিক্য বহুবার এদের সুষ্ঠু যুদ্ধ পদ্ধতি ও নিষ্ঠার জন্যই জয়লাভ

করেছিলেন। তাছাড়া কুকিরা যে ত্রিপুরার সামরিক বিভাগে প্রধান ভূমিকায় ছিল, তা কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তও উল্লেখ করেছেন।

"ত্রিপুরা, রিয়াং, জমাতিয়া ও কুকি প্রভৃতি
পার্বত্য জাতিকে চিরদিনই সামরিক বিভাগের
মেরুদন্ডস্বরূপ পাওয়া যাইতেছে।"
(রাজমালা - তৃতীয় লহর - পৃষ্ঠা - ১৭৫)

কুকিদের যুদ্ধ পদ্ধতি

কৃষ্ণমাণিক্যের সময়ে এই কুকিরাই সমর-সজ্জায় বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। কৃষ্ণমালার কবির বাস্তবচিত্র বর্ণনের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রখর ছিল বলেই কুকিদের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনাগুলো কাব্যে সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। কৃষ্ণমাণিক্য একবার বিদ্রোহী খুচুঙ্গ কুকি প্রজাদের দমন করবার জন্য অধিকাংশ সৈন্য পাঠিয়ে মাত্র অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি যখন রাংখলপাড়ার শিবিরে অবস্থান করছিলেন, তখন এই সুযোগে কুকিরা এসে অকস্মাৎ শিবির আক্রমণ করে। তাদের রণসজ্জার একটি বর্ণনা কবি দিয়েছেন, যা এককথায় অপূর্ব।

কটিতে বসন নাই দিগম্বর বেশ।
সকল মস্তক জুড়ি আছে মুক্ত কেশ।।
গবয়ের চর্ম্ম নির্ম্মিত দীর্ঘ ঢাল।
পৃষ্ঠে দোলে করেতে কুকিয়া তরয়াল।।
লোহার টোপর মাথে রাঙ্গীবস্ত্র গায়।
তীক্ষ্ন ধরে শেল হাতে রণে আগুয়ায়।।
তীর কোষে ভরা আছে বিষে মাখা তীর।
হাতে দিব্য ধনু রণে নির্ভয় শরীর।।

কবির দৃষ্টি যে কত তীক্ষ্ন তার পরিচয় উপরি উক্ত বর্ণনায় মেলে। কুকি বিদ্রোহের কারণ ও তাদের অভিযোগ কবি স্বল্প কথায় এমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন, যারফলে এখানে কবির সূক্ষ্ন ইতিহাসবোধও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

সে আছেকদফা কুকি থাকে দিগম্বর।
পূর্ব্বাপর ত্রিপুরা রাজাকে দেয় কর।।
এখনে খুচুঙ্গ সঙ্গে সে সব মিলিয়া।
কর না দিয়াছে তারা দুন্দিয়া হইয়া।।
তথা গিয়া তা সবাকে করিয়া দমন।
লুটিয়া লইল তা সবার বহুধন।।
তবে সে সকল কুকি পরাভব পাইয়া।
কারার নিকটে আসিলেক ভেট লৈয়া।।

পার্বত্য অঞ্চলের বন্য প্রজারাও প্রয়োজন হলে রাজাকে কর দেওয়া বন্ধ করতো। এর কারণ সম্পর্কে কবি বলছেন —

আমি সব ত্রিপুর রাজার প্রজা বটি।
কিন্তু খুচুঙ্গের সঙ্গে বলে নাহি আটি।।
খুচুঙ্গকে দমন করহ তুমি এবে।
ত্রিপুর রাজাকে কর দিব আসি সবে।।

এখানে কর না দেবার কারণ সুস্পষ্ট। ত্রিপুর রাজা যদি দুর্দিনে আশ্রয় না দেয় এবং প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা না করে, তবে করের মাধ্যমে আনুগত্য স্বীকারের কোন প্রশ্ন উঠে না। পর্বতবাসীরা স্বভাবধর্মে সহজ ও সরলমনা। অন্য চিন্তা না করে রাজাকে কর দেওয়া বন্ধ করার পথকেই সহজতর ও সঙ্গত বলে মনে করেছে। পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নানা জাতের পর্বতবাসীরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত

হয়ে বসবাস করছে। তাদের সমাজব্যবস্থা ও জীবনধারার কিছু কিছু চমকপ্রদ ঘটনা কাব্যে কাব্যরসে সমৃদ্ধ হয়ে আছে। কুকিদের অভিনব যুদ্ধ পদ্ধতির বর্ণনাও কাব্যে আছে। ত্রিপুর সৈন্যরা যুদ্ধ করতে আসছে খবরে তারা সবাই আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য একত্রিত হলো। তারপর —

একত্র হইয়া সব পথেতে আসিয়া।
বৃক্ষ কাটি আনি বৃক্ষে রাখয়ে বান্ধিয়া।।
শিলাগণ আনিয়া বান্ধিয়া রাখে গাছে।
কাটি দিব সেনাগণ আইসে যদি কাছে।।

কবির দৃষ্টি যে কত স্বচ্ছ ও ব্যাপক তার প্রমাণ কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু খুচুঙ্গ কুকিদের সঙ্গে ত্রিপুর বাহিনীর যুদ্ধজয় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। ত্রিপুর সৈন্যরা তাদের বিক্রমে ভীত হয়ে যখন পলায়নপর, তখন সেনাপতি গোবর্ধন রায় তাদের নৈতিক সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য বললেন —

রণত্যজি যদি এবে যাও পলাইয়া।
কি বলিব যুবরাজ নিকটেতে গিয়া।।
অতএব মরণ জীবন হতে ভাল।
না কর মরণ ভয় যুদ্ধ হেতু চল।।
জিনিলে পাইবে যশ মৈলে ইন্দ্রপুরী।
ইহা জানি কর রণ ভয় পরিহরি।
জন্মিলে অবশ্য জান মরে সর্ব্বজনে।
যশ অপযশমাত্র রহে ত্রিভুবণ।।

এতে কাজ হলো। স্বর্গে যাবার আশ্বাস মানুষের মনে চিরকাল প্রেরণার সঞ্চার করেছে। ফলে তারা নূতন উদ্দীপনায় আবার যুদ্ধে এগিয়ে এলো।



কুকি সকলেহ মদ্য খাইয়া তখন।
আগু হৈয়া খুচুঙ্গদের সঙ্গে করে রণ।।

যুদ্ধ জয়লাভের পর সন্ধিচুক্তি দিয়ে কবি এই প্রসঙ্গ শেষ করেছেন। প্রজারা যেমন পর্বতবাসী, তেমনি রাজাও বনচারী, ফলে ভেট নিতান্তই সাধারণ।

ভেট লৈয়া চলে যথা কবরা আছয়।
অশ্ব দিল তিন গোট বায়ু জিনি গতি।।
শতেক গবয় দিল করিয়া প্রণতি।।
খেস বস্ত্র কাংশ থাল দিল ভারে ভারে।
গজদন্ত যত দিল কেবা গণে তারে।।

রাজাও তাতেই খুশী।

ত্রিপুরা ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলের কুকি সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার বিচিত্র তথ্যের ইতিহাসে কৃষ্ণমালা কাব্য মুখর। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে এই অঞ্চলের অশিক্ষিত বন্য জাতির জীবনের উপর দিয়ে যে দুর্যোগ ও ঘটনাস্রোত একদা প্রবাহিত হয়েছিল, তার ইতিহাস কবি নিপুণভাবে কাব্যে পরিবেশন করেছেন। সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে এই কুকিরা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে বসবাস করতো। কিন্তু তারা মোটেই দুর্বল ছিল না। যুদ্ধপ্রিয় জাতি হিসাবে এদের প্রসিদ্ধি আছে। এদেব অধীনে বিরাট সৈন্যদল থাকতো এবং ত্রিপুব রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে তাবা কব দেওয়া বন্ধ কবতো। তাদের শক্তি যেকোন অবস্থায় ন্যূন ছিল না, তাব প্রমাণ কাব্যে রয়েছে।

সে কুকিব মলাল ছুবব নামে আছে।
সত্তর হাজাব সৈন্য আছে তাব কাছে।।

কিন্তু বন্দুকের ব্যবহার তারা জানতো না বলেই শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুর সৈন্যদের কাছে হেরে যেতো।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের বৈচিত্র্যময় ও দুঃসাহসিক জীবনকাহিনী কবির জন্যই কৃষ্ণমালা কাব্যে অক্ষয় হয়ে রইলো। ত্রিপুরার কোন গ্রন্থেই কৃষ্ণমাণিক্যের জীবন কাহিনী এত বিস্তৃতভাবে নেই। এমনকি ত্রিপুরার ইতিহাস ও রাজন্যবর্গের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত রাজমালায়ও কৃষ্ণমাণিক্য সম্পর্কে এত তথ্য নেই। এদিক থেকে বিচার করলে 'কৃষ্ণমালা' কাব্যের মূল্যবোধ অপরিসীম। এই কাব্যে কবি ত্রিপুরার বহু তথ্য অতি সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। রাজ্যচ্যুত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থান করতে গিয়ে কৃষ্ণমাণিক্যকে কুকিদের সংস্পর্শে বারবার আসতে হয়েছে। ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির বসবাস। তারমধ্যে কুকির' অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধতায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে কুড়িয়ে বাস করে। কুকিদের গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে ভাগ করে থাকার বিবরণ কাব্যে পাওয়া যায়।

এই কুকিরাই ত্রিপুরারাজার প্রজা হিসাবে প্রধান। তারা রাজাকে নানা অবস্থায় যেমন আন্তরিকভাবে সাহায্য করে, আবার সময় বিশেষে বিরুদ্ধতা করতেও কুন্ঠিত হয় না। এই কুকিদের উৎস সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত হলো —

> "The Kuti Chin tribes present an important branch or section of the Assam Indo-Mongoloids. They have their Kinsmen in Burma and appear to have settled in fairly ancient times in Manipur and to Lushai Hills, as well as in the Chittagong Hill tracts. From Lushai Hills and Manipur they came in large numbers to Tripura States, where they form an important section of the people. ('Kirata - Jama - Kriti' - Page - 48)

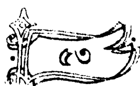
'কৃষ্ণমালা' কাব্য এই কুকিদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি তথ্যে সমৃদ্ধ।

কুকিদের ধর্মীয় চিন্তাধারার সুষ্ঠুরূপও কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তারা নদী-বৃক্ষকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। হিড়িম্বদেশের দক্ষিণে আছে বরবক্র নদী। এর অন্য নাম খলংমা। তার দক্ষিণে আছে বৃফলি নদী। কুকিদের জীবনে এই নদীর প্রভাব অপরিসীম। কৃষ্ণমালার দ্বিতীয় খন্ডে এই প্রভাব সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—

সে নদীর প্রভাব আছয়ে অতিশয়।
তথা বহুলোকে পূজা তাহান করয়।।

আবার আর্যহিন্দুদের অনুসারী হয়ে শাস্ত্রসম্মতভাবে তারা হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করতো। কাব্যে কবি দুর্গাপূজার বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু দেখা যায় ত্রিপুরা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের ধর্ম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুর্গাপূজার কোন প্রচলন ছিল না। অতীতে কুকিদের মধ্যে বাঙালী প্রভাব কতটুকু পড়েছিল, তারও কোন পরিমাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। কুকিরা যে হিন্দু দেব-দেবীর পূজার কতটুকু অনুসারী এবং তাতে বাঙালী প্রভাব কতটুকু মিশ্রিত হয়েছে, তা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে একথা সত্য যে, শাস্ত্রসম্মত হিন্দুধর্মের বিশেষ কোন প্রভাব তৎকালীন ত্রিপুরায় ছিল না। দেখা যায়, ধন্যমাণিক্য ও ধর্মমাণিক্যের আমল থেকেই উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণরা ত্রিপুরায় আসতে থাকেন। তারা ত্রিপুরার জাতীয় জীবনে খুব একটা শাস্ত্রগত ও ধর্মগত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। শুধু রাজাদের মধ্যে কিছুটা হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তার করতে তারা সক্ষম হয়েছিলেন। কৃষ্ণমণির অভিষেকের সময় দেখা যায়, হিন্দু প্রথায় বিশিষ্ট হিন্দু পুরোহিতরা বেদমন্ত্র পাঠ করে তাঁর অভিষেক পালন করেছেন।

স্বর্ণঘটে পুরোহিত ভরি গঙ্গোদক।
বেদমন্ত্রে করিলেক রাজ অভিষেক।।



তবে কুকিরা যে ত্রিপুরারাজার অনুগত হয়ে রাজাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আন্তরিকভাবে মেনে চলতো তারও প্রমাণ আছে। কুকিরা ত্রিপুরারাজার স্থাপিত মূর্তির পূজা করতো।

শিলাময়ী দেবী এক আছয়ে তথায়।
স্থাপন করিছে পূর্বে ত্রিপুর রাজায়।।
সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ ধরে দশকর।
দেবী নামে পূজা তার হয় পূর্বাপর।।
....
দুর্গোৎসবকালে তথা যত কুকিসব।
গবয়াদি বলি দিয়া করয়ে উৎসব।।
(কৃষ্ণমালা কাব্য)

এই দেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্যও কবি দেখিয়েছেন। দেবী ইচ্ছামত বিভিন্ন কুকিপাড়ায় অবস্থান করেন। স্থানান্তরে যাবার বাসনা হলে দেবী স্বপ্নে বলেছেন — "যাইতে হইলে ইচ্ছা স্বপ্নে আসি কয়।" আবার দেবীর ইচ্ছা না হলে তাকে নড়ানো যায় না।

দেবীর ইচ্ছায় চারিজনে পারে নিতে।
নতুবা চারিশত লোকে না পারে লাড়িতে।।

অলৌকিক মাহাত্ম্যের জন্যই দেবী কুকিদের ভক্তি-অর্ঘ্য পেয়েছেন।

ত্রিপুরার বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে যে সব কুকিরা বাস করে তাদের কিরাত বলা হয়।

এইমত বহু কুকি আছয়ে তথায়।
কিরাত ই-সব নাম শাস্ত্রীয় ভাষায়।।



বহুকাল ধরেই পূর্ব-ভারতীয় মঙ্গোলীয় জাতিদের কিরাত বলা হচ্ছে। মহাভারতেও কিরাত জাতির উল্লেখ আছে। দিগ্বিজয়কালে ভীমের হাতে কিরাতরা পরাজিত হয়।

বৈদেহস্তস তু কৌন্তেয়, ইন্দ্রপর্বতম্ অন্তিকাৎ।
কিরাতাধিপতিন্ সপ্ত বৈজয়াৎ তত্র পান্ডবঃ।।

অর্থাৎ - তখন কৌন্তেয়, পান্ডববীর, বৈদেহ দেশের কাছে ইন্দ্রপর্বতের পাশে কিরাত অধিপতিদের পরাজিত করেন। এই পার্বত্য জাতিদের শাস্ত্রীয় নাম কিরাত।

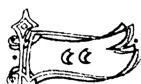
হিড়িম্বাধিপতি রামচন্দ্রধ্বজের কাছে পরিবারবর্গকে রেখে কৃষ্ণমাণিক্য পূর্বকূলে গোমতী নদীর তীরে রিহাঙ্গ পাড়ায় এসে নিজের মঙ্গলকামনায় চতুর্দশ দেবতার পূজা করলেন।

যুবরাজ আদেশে চোন্তাই ধনঞ্জয়।
চতুর্দশ দেব পূজা তথাতে করয়।।

প্রয়োজনে সবক্ষেত্রে কুকিরাই যে শুধু রাজাকে সাহায্য করেছে তা নয়, সময় বিশেষে আবার কৃষ্ণমাণিক্যও তাদের দুরবস্থায় সাহায্য করেছেন। কুকিদের সমূহ বিপদ জেনে তিনি হিড়িম্বাধিপতিকে লিখলেন —

পূর্বকূলে আমা প্রজা বৈসে কুকিগণ।
দস্যু আসি তা সবাকে করে বিড়ম্বণ।।

অতএব দস্যুদের দমন করবার জন্য নূতন উদ্যমে রাজাদেশে কুকিরা রাংখলপাড়ায় এসে একত্রিত হলো। রাজা তাদের মদ-মাংস খাওয়ালেন। ভোজনপর্ব সমাধা করে কুকিরা যুদ্ধ করবার জন্য বীরদর্পে আস্ফালন করতে লাগলো। এরাই ত্রিপুর রাজাদের দুর্দিনের সঙ্গী, আবার এরাই রাজার আশ্রয় না পেলে কর দেওয়া বন্ধ



করে। এরা এত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর যে, খুব অল্পে যেমন তুষ্ট হয়, আবার অল্পেই বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হয় না।

কুকি নারীরাও যে বীরত্বের দিক থেকে কম যায় না, তার একটি চমকপ্রদ কাহিনী কৃষ্ণমালায় রয়েছে। কৃষ্ণমাণিক্যের সেনাপতিরা সমসেরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলে গেল তখন রাংখলপাড়ার ত্রিপুর ছাউনীতে কৃষ্ণমাণিক্য একা রয়েছেন। দ্বারপ্রান্তে শুধু একজন প্রহরী আর — "নারী-বৃদ্ধ-শিশু সবে সুখি নিদ্রা যায়।" এই অবস্থায় রাত্রির অন্ধকারে খুচুঙ্গ কুকিরা নীরবে ছাউনি আক্রমণ করলো। খুচুঙ্গ কুকিরা এককথায় দুর্বার — নিষ্ঠুর তাদের প্রকৃতি। তারা যাকে পায় তাকেই নির্বিচারে হত্যা করে। তখন অনন্যোপায় হয়ে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে এক কুকি ধাত্রী মরিয়া হয়ে লড়াই শুরু করলো। ধাত্রী তখন —

ঘরের চালেতে করিলেক আরোহন।।
পৃষ্ঠের উপরে পৌত্র বস্ত্রে বন্ধি রাখি।
খুচুঙ্গ কুকিরে তীরে হানে চালে থাকি।।
খুচুঙ্গ দেখিয়া তাকে হানে এক তীর।
দুইজন প্রানবিন্ধি তীর হইল বাহির।।

কুকি নারীর এই বীরত্ব কাহিনী ত্রিপুরার ঐতিহ্যকেই প্রতিষ্ঠা দেয়।

জীবনযাত্রার দিক থেকে বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কুকিরা সহায়-সম্বলহীন নিঃস্ব হলেও এরা পরিশ্রমী জাত। এরা খেটে খায়। দৈনন্দিন কাজেও তারা কঠোর পরিশ্রম করে এবং পর্বতাঞ্চলে ভারী বোঝা বহন করে নিয়ে যায়। কৃষ্ণমানিক্য স্থানান্তরে যাবেন। তখন-

চিঠি পাই কুকি সব আসিল ত্বরায়।
তলাই বলই আর ভার বই যায়।।

তাছাড়া তারা সব সময় ন্যাংটা থাকে। কোন বসনের বালাই নেই।



প্রজাহিসাবে কুকি সম্প্রদায় ঃ—

চাথেঙ্গ নদীপারেতে যে কুকি বসয়।
সকল মারের কুকি তা সবারে কয়।।
সে নদীর দক্ষিনেতে যত কুকি থাকে।
সে সব ছিমের কুকি কহে কুকি লোকে।
লেংটা থাকে তারা বস্ত্র নাহি পরে।
এইসব নাম সেই সব কুকি বরে।।

কিন্তু এরা সহায়-সম্বলহীন হলেও রাজাকে তাদের কর দিতেই হয়। একদিকে তাদের উপর রাজার আধিপত্য এবং অন্যদিকে কুকিদের রাজানুগত্য এই দুইয়ের মিশ্রিত ফল হিসাবে তারা যে কোন ভাবে কর দেবার ব্যবস্থা করতো। ত্রিপুরার রাজাদের পার্বত্য অঞ্চলের এই সবজাতির উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল।

রাজাও তাঁর ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য কর আদায় করতে কুন্ঠিত হতেন না এবং কর না দিলে তাঁদের সংঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। কুকিরা সামরিক শক্তিতে প্রবল ছিল । কোন কোন কুকি সর্দারের সত্তর হাজার পর্যন্ত সৈন্য ছিল বলে কৃষ্ণমালায় বলা হয়েছে। এদের সামরিক শক্তির কথা চিন্তা করে রাজাকেও সতর্ক থাকতে হতো। কৃষ্ণমাণিক্য কুকিদের সৈন্য সংখ্যা জেনে ভীত হয়েছিলেন।-

সে কুকির মলাল ছুবর নামে আছে।
সত্তর হাজার সৈন্য আছে তার কাছে।।
সৈন্যের গননা শুনি মনে লাগে ভয়।
কিরূপ করিয়া তারে করিব বিজয়।।

কিন্তু পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, কুকিরা বন্দুকের ব্যবহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ফলে সৈন্য সংখ্যা বেশী হলেও তারা ত্রিপুর সেনাপতিদের সঙ্গে এই কারনে পেরে উঠতো না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের একমাত্র হাতিয়ার ছিল 'শেল'।

ছেল মাত্র অস্ত্র কুকি সকলের হাতে।
নিকটে না আসি তারা না পারে মারিতে।।
শিবির সমীপে যবে আইসে কুকিগন।
বন্দুক প্রহারে কত হারায় জীবন।।

তবু কুকিদের সংঘবদ্ধতা ও একাগ্রতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। তারা আত্মরক্ষার জন্য, তাদের সংঘবদ্ধ ভাবে লড়াইয়ের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকে। তাদের দুর্যমনীয় সাহস । বন্দুকের ভয় তাদের নেই। ষাট হাজার কুকি বেপরোয়া হয়ে মরন পন করে বন্দুকের গুলির সামনে লড়াই করতেও কুন্ঠিত হয়নি। হিড়িম্বদেশ জয়ে এই কুকিদের অবদান সম্পূর্ন একক। তারা শত্রু হলেও মহৎ - এদের বিশ্বস্ততার কোন তুলনা নেই।

যে কুকিরা কৃষ্ণমাণিক্যের সুখ দুঃখে, হিড়িম্বদেশ জয়ে এবং সমসেরের মতো দুর্দান্ত দস্যুর বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণমাণিম্যকে বারবার আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছে। রাজ অভিষেকের সময় তাদের কোন আমন্ত্রন নেই। কাব্যে অভিষেক বর্ণনায় কুকিদের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক। সম্পদে বিপদে, দৈনন্দিন জীবনে এরাইতো ছিল রাজার নিত্য সহচর।

যুদ্ধে কুকিরা বিষমাখা তীর ব্যবহার করে। এই বিষ কোথা থেকে এলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে কবি কাব্যে একটি লৌকিক কাহিনীর অবতারনা করেছেন, যা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। এই লৌকিক কাহিনীটি পরবর্তী ''ত্রিপুরার রূপকথা'' পর্যায়ে আলোচিত হবে।

কৃষ্ণমালা কাব্যে দেশী-বিদেশী শব্দের ব্যবহার

রাজা রাজধর মানিক্যের রাজত্বকালেই (১৭৮৬ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ) 'কৃষ্ণমালা' কাব্যে রচিত হয়েছে। ত্রিপুরার পূর্বাপর ইতিহাস অবলোকন করলে এই সত্যই প্রমানিত হয় যে, এই রাজ্যে বারবার মুসলমান আক্রমন হয়েছে। ফলে ত্রিপুরার কথ্য ভাষার সংঙ্গে আরবী, ফার্সী ও হিন্দী শব্দ প্রচুর মিশ্রিত হয়েছে। 'কৃষ্ণমালা' কাব্যে কিছু আরবী, ফার্সী ও হিন্দি শব্দের ব্যবহার লক্ষনীয় ।



“চম্পকবিজয়”

কবি সেখ মহদ্দিন

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ—

প্রকারের দিক থেকে বিচার করলে ‘চম্পকবিজয়’কে ঐতিহাসিক কাব্য বলাই সঙ্গত। ত্রিপুরার ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হয়। ত্রিপুরার রাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৬৮২ - ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। নরেন্দ্র মাণিক্য ছিলেন রত্নমাণিক্যের পিতৃব্য পুত্র। ব্যক্তিজীবনে তিনি দ্বারিকাঠাকুর বলে পরিচিত ছিলেন। রাজা রামমাণিক্যের সময়েই তিনি প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে নরেন্দ্রমাণিক্য নাম ধারণ করে রাজা হয়ে পরে রামমাণিক্যের চেষ্টায় তিনি ঢাকায় কারারুদ্ধ হন। কিন্তু কিছুকাল পরে রাজা দলসিংহ নামে এক রাজবংশীয় ব্যক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নরেন্দ্রমাণিক্য পালিয়ে যান এবং দলসিংহের সৈন্যদলের সহায়তায় উদয়পুর অধিকার করে রাজা হয়ে বসেন। তারপর রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালেই রাজা নরেন্দ্রমাণিক্য পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (১৬৯৩ - ৯৪ খ্রীঃ)। তাঁর বিদ্রোহের ফলে রত্নমাণিক্যের সাময়িক রাজ্যচ্যুতি ঘটে। ‘চম্পকবিজয়’ কাব্যে এই ঘটনাই প্রধান যা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

ত্রিপুর রাজবংশের শক্তিশালী রাজা হলেন কল্যাণমাণিক্য। তিনি ১৬২৬ - ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে দোর্দন্ড প্রতাপে রাজত্ব করেন। তারপর তাঁর পুত্র গোবিন্দমাণিক্য ও ছত্রমাণিক্য (নক্ষত্র রায়) কিছুকাল রাজত্ব করেন। গোবিন্দমাণিক্যের মৃত্যুর পর (সম্ভবতঃ ১৬৬৯ খ্রীঃ) রামমাণিক্য বার বছর রাজত্ব করেন। ১৬৮২ খ্রীঃ তাঁর পুত্র রত্নমাণিক্য রাজা হন। রত্নমাণিক্যের বয়স তখন পাঁচ, মতান্তরে সাত। রামমাণিক্য জীবিতকালেই শ্যালক প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ বলিভীম নারায়ণকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। তারপর রত্নমাণিক্য রাজা হবার পর স্বীয় অনুজ দুর্যোধন, রাজবংশীয় গৌরীচরণ এবং চম্পকরায় এই তিনজনও যুবরাজ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু রাজ্য পরিচালনায় বলিভীম নারায়ণ,

গৌরীচরণ ও চম্পকরায়ের প্রাধান্যই বেশী ছিল। তাঁরা নাবালক রাজা রত্নমাণিক্যের পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যকে তিন অংশে ভাগ করে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

ত্রিপুরার এই সময়ের ইতিহাস নানা জটিলতায় আবৃত। ফলে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার অনেকক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য। চম্পকরায়ের মৃত্যু সম্পর্কে যদিও নানারকম খবর ছড়িয়ে আছে, কাব্যে কিন্তু এই সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। 'চম্পকবিজয়' কাব্যের ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণ করার সময় এই সম্পর্কে যথাসাধ্য বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করা হবে। তবে চম্পকরায় যে নাবালক রাজা রত্নমাণিক্যের মন্ত্রীত্বের কিছু দায়িত্ব নিয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

কবি ও কাব্য ঃ—

'চম্পকবিজয়' কাব্যের কবির নাম সেখ মহদ্দিন। এছাড়া কবির আর কোন পরিচয় কাব্যে পাওয়া যায় না। পারিবারিক সম্পর্কিত কোন উল্লেখও কাব্যে নেই। কাব্যের সর্বত্র চম্পকরায় মীরখাঁর প্রাধান্যই বেশী। এই অর্থে মীরখাঁই কাব্যের প্রধান চরিত্র। বিদ্রোহী রাজা নরেন্দ্রমাণিক্যের আক্রমণে চম্পকরায় চট্টগ্রামে পালিয়ে গিয়ে মীরখাঁর সাহায্য চেয়ে পাঠান। কবির মতে, মীর খাঁর সাহায্যেই চম্পকরায় ত্রিপুরায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন এবং রত্নমাণিক্য রাজ্য ফিরে পান। মীরখাঁ ত্রিপুর রাজবাহিনীতে কাজ করতেন। রাজা রত্নমাণিক্যের রাজ্য পুনরুদ্ধারে যেসব সেনাপতি বিশেষভাবে সহায়তা করেন, তাদের মধ্যে মীরখাঁ অন্যতম। শৌর্যে-বীর্যে-পরাক্রমে মীরখাঁ যে ত্রিপুরারাজ্যে অতুলনীয়, কবি তা উচ্ছ্বাসপূর্ণভাবে কাব্যে ব্যক্ত করেছেন। —

মীরখাঁ গাজি জান সর্বত্র নায়ক।
সর্বপক্ষে আপনে যে রাজ্যের পালক।।



অন্যত্র —

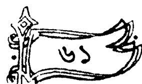
শ্রীমত মীরখাঁন পরম উপকারী।
যার দৃষ্টিপাতে শত্রু সব যায় মরি।।

মীরখাঁর আদেশে যে কবি কাব্য রচনা করেছেন তার স্বীকৃতি কাব্যের সর্বত্র সুপ্রচুর।

১। মীর খাঁ যে ভুবনে পূজিত।
তাহান আদেশ ধরি শিরস্ত্রাণ মান্য করি
মহদ্দিয়ে করিল রচিত।।
২। শ্রী মীরখাঁ গাজি ভুবন দুর্জয়।
তাহান আদেশ ধরি মহদ্দিয়ে কয়।।
৩। মীরখাঁ গাজির পদ করি শিরস্ত্রাণ।
হীন মহদ্দিয়ে ভণে পাঁচালী ব্যাখ্যান।।
৪। শ্রীযুক্ত মীরখাঁন প্রতাপে ভাস্কর।
কহে হীন মহদ্দিয়ে তান আজ্ঞাপর।।
৫। তাহান আদেশ সুনি মনে করি সার।
হীন মহদ্দিয়ে ভনে পাঁচালী পয়ার।।

তবে 'রাজমালা' ব্যতীত অন্য কোন ইতিহাসে মীরখাঁর উল্লেখ নেই। কাব্যে মীরখাঁর সঠিক পরিচয়ও কবি দেননি। তবে কাব্যপাঠে এইটুকু বোঝা যায় যে তিনি ত্রিপুর রাজ পরিবারের শুভানুধ্যায়ী এবং বুদ্ধি বিবেচনায় ছিলেন তুলনাবিহীন। কাব্যের আরম্ভে কবি যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করেছেন।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি মহদ্দিন সাহেবের ভাষা।
কোথা হনে কোথা যাই নাই দিশ্ দিশা।।



কাব্যের আরম্ভে কবি সচেতন ছিলেন বলে সবিনয়ে বলছেন —

যেই পদ দেখ মন্দ ছন্দ করি লৈবা।
আমি অধমেরে কেহ চর্চা না করিবা।।

কাব্যের কাল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। মীরখাঁর আদেশে রাজা রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালের (১৬৮২ - ১৭১২খ্রীঃ) কোন সময়ে কবি এই কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন বলে অনুমেয়।

ত্রিপুর বংশের ইতিহাস বর্ণনাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য কবি তা কাব্যের শুরুতেই জানিয়ে রেখেছেন।

ত্রিপুর বংশের কথা করিমু রচন।
অপরাধ মাগি আমি সভার চরণ।।

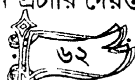
শ্রীরত্ন মাণিক্য গুনে অনুপাম।
তান পদতলে করি সহস্র প্রণাম।।

চম্পকরায়, মীরখাঁ ও ত্রিপুরার রাজপরিবারের সবাই
কবির অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলেই কবি বলছেন—

গহিন সমুদ্রে পড়ি মুক্তা তুলিলাম।
মনের হরিষে মুই পসার বৈসাইলাম।।

নিজ দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন কবি বলছেন —

যেই পদ দেখে মন্দ ছন্দ কারি লৈইবা।
আমি অধমের কেহ চর্চ্চা না করিবা।।
মহাজনে দোষ পাইলে ছাপাইয়া রাখেন্ত।
নিকৃষ্টের কর্ম জান প্রচারি দেয়ন্ত।।



কাব্যটি সম্পূর্ণ নয়। রাজা নরেন্দ্রমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চম্পকরায় মীরখাঁর সাহায্যে নরেন্দ্রমাণিক্যের চরদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে এলেন ঢাকায়। নরেন্দ্রমাণিক্য এই খবর পেয়ে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন — এইখানেই কাব্যের শেষ। কবি কেন যে এখানে কাব্য শেষ করলেন তা আজ আর বোঝবার উপায় নেই। রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যদি চম্পকরায়ের সঙ্গে নরেন্দ্রমাণিক্যের আবার যুদ্ধ বাঁধিয়ে কবি চম্পকরায়ের বীরত্বকে কাব্যে প্রতিফলিত করতেন, তবে বোধহয় কাব্যের নামকরণ সার্থক বলে বিবেচিত হতো।

কাব্যের শুরুতেই দেববন্দনার পরে রাজা রত্নমাণিক্যের গুণগানের মাধ্যমে কবি কাব্য শুরু করেছেন। কবির বক্তব্য অনুযায়ী রাজা রত্নমাণিক্য সর্বগুণান্বিত।

বৈষ্ণব শরীর রাজা বিষ্ণু অবতার।
অবতার জন্ম হেন ঘোষয়ে সংসার।।
নির্মল শরীর পূর্ণ যেন গঙ্গাধর।
তানে যেবা রিপু ভাবে যাহে রসাতল '

রাজা রত্নমাণিক্যের পরেই কবি চম্পকরায় সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। যে চারজন রাজা রত্নমাণিক্যের আমলে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হন, তাদের মধ্যে চম্পকরায় যে বিশেষ গুণের অধিকারী তা কবির বর্ণনায় পাওয়া যায়।

বুদ্ধিমন্ত গুণশ্রেষ্ঠ মহা যুবরাজ।
বুদ্ধি পরাক্রমেতে শাসন্ত রাজ কাজ।।
....
মহাশয় চম্পকরায় পন্ডিত প্রবর।
উদয়পুর মধ্যে যেন নব শশধর।।
....
জগন্নাথসুত যদি যুবরাজ না হৈত।
রাজার রাজ্যের পরে অনর্থ পড়িত।।

তারপর মীরখাঁ যে সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ও উদারচেতা ছিলেন, কবি তাও ব্যক্ত করেছেন —

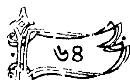
মহাসত মীরখাঁন মহা ধনুর্ধর।
যাহার প্রতাপ গেল দিগ দিগন্তর।।
....
আপনে না ভুঞ্জে ভুঞ্জায় অতিথিরে।
আপনে না পৈরে বস্ত্র পৈরায় অন্যেরে।।
ঘরে না থাকিলে কর্জ করি করে দান।
ভিক্ষুক দরিদ্র লোকের তোষয়ে পরাণ।।

কাব্য কাহিনী —

রাজা রামমাণিক্যের মৃত্যুর পর পাঁচ বছরের শিশু রত্নদেব রাজা হন। শিশু রাজার পক্ষ থেকে যুবরাজদ্বয় বলিভীম নারায়ণ ও চম্পকরায় রাজ্য পরিচালনা করছেন। বলিভীম নারায়ণ অত্যন্ত অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তাঁর এই উন্মত্ততার কারণ সম্পর্কে জানা যায়, তিনি রাজ্যলোভে রত্নদেবের বয়স্ক বৈমাত্রেয় ভাই অমরসিংহ ও শত্রু সিংহ নারায়ণকে হত্যা করে পঞ্চম বর্ষীয় বালক রত্নদেবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যান্য রাজবংশীয়রা তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। এমনকি চম্পকরায়ও তাঁর এই মনোবৃত্তির জন্য সাময়িকভাবে আত্মগোপন করেছিলেন — "সেকালে চম্পকরায় আছিল লুকাই"।

এদিকে বলিভীম নারায়ণ কোথায় কে কি করছে সেই খবরাখবরের জন্য সর্বত্র চর নিযুক্ত করেছেন।

এক আজ্ঞা বিনা' তার না ছিল দোসর।
প্রতি ঘরে ভ্রমিত বলিভীমের চর।।



কোনে কিবা যুক্তি করে বসয়ে কোথাতে।
চরে আসি কহে সব তাহান সাক্ষাতে।।
সর্ব্বদা তাহান ঠাঁই ছিল কাট মার।
তিল অপরাধে নর করিত সংহার।।
মত্ততা হইয়া তিনি না কৈল বিচার।
প্রাণী সব বধিয়া করিল ছারখার।।

এই সময় বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ (১৬৯০ - ৯৭ খ্রীঃ)। তার পূর্বে শাসনকর্তা ছিলেন শায়েস্তা খাঁ। শায়েস্তা খাঁর অবসর গ্রহণের পর সাময়িকভাবে মাত্র দুই বৎসরের জন্য বাহাদুর খাঁ বাংলাদেশের শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হন। কাব্যে বাহাদুর খাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। নূতন শাসনকর্তার খবরে বাংলার বিভিন্ন জমিদারেরা ভেট সহ বাহাদুর খাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এলেন না শুধু ত্রিপুরাধিপতি।

শাস্তাখাঁ নবাব যদি তৈগির হইল।
খান বাহাদুর তবে বাঙ্গালাতে আইল।।
সর্ব্বদেশের জমিদার আসিয়া মিলিল।
ত্রিপুর নৃপতি তবে গরহাজির হৈল।।

ফলে বাহাদুর খাঁ ক্রুদ্ধ হয়ে হস্তীকর দাবী আদায় করতে তাঁর সেনাপতি কেশর দাসকে পাঁচশো অশ্বারোহী সৈন্য সহ ত্রিপুরায় পাঠালেন। চরমুখে এই সংবাদ পেয়ে বলি ভীম নাবায়ণ প্রথমে অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন।

আমা হইতে কর কবে লইছে মগলে।।
....
তিন গোটা হস্তী পরে আর নাহি দিব।
উদ্যম করিলে সে আপনি শাস্তি পাইব।।

কিন্তু পরে সারারাত্রি চিন্তা করে শেষপর্যন্ত নিজেরও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য নবাবের সঙ্গে সন্ধি করাই শ্রেয় মনে করে বললেন —

যে হৌক সে হৌক মোর মিলনই যে সার।
বাদসার সঙ্গে না ধরিনু তলোয়ার।।

বাংলার শাসনকর্তার সঙ্গে কোনদিক দিয়েই পেরে উঠা যাবে না ভেবে পরদিন বলিভীম ত্রিপুর রাজবংশীয়দের শাসনকর্তার সঙ্গে একলক্ষ টাকা ও একশত হাতী দিয়ে সন্ধি করার কথা বললেন এবং আরও বললেন যে এতে শত্রু যদি মিত্র হয় তবে অযথা হানাহানি করে কি লাভ। কেশর লালও তাই চায়। দূতের মুখে খবর পেয়ে বলিভীম ভেটসহ গেলেন কেশরলালের কাছে। দুইজনে বন্ধুত্ব হলো। বলিভীম সসম্মানে আবার দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্বের খবরে নবাব তুষ্ট না হয়ে ক্ষিপ্ত হলেন। কারণ ত্রিপুরা জয়ের পরিকল্পনা নবাবের মনে অনেকদিন থেকেই ছিল। ফলে ক্রুদ্ধ নবাব পত্রসহ একজন দূতকে প্রেরণ করলেন কেশরলালের কাছে। বলে পাঠালেন, যেখানে এই সুযোগে ত্রিপুরা রাজ্য জয় করার কথা, সেখানে শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা তাঁর ঠিক হয়নি। অতএব —

যদি বা চাহ তুমি আপনার হিত।
বন্দী করি বলি ভীম আনহ ত্বরিত।

কেশর দাস এই চিঠি পেয়ে ভিত সন্ত্রস্ত হলেন। সৈন্য সামন্তদের সংঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হলেন, যদি বলি ভীম আসে তবে তাকে বন্দী করা হবে।

এদিকে বলিভীম চরের মুখে এই সংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে আত্মরক্ষার্থে উদয়পুর চলে যেতে চাইলেন। তখন উজির জয়মর্দন নারায়ন দেশের হিতকল্পে মোগলকে বুঝিয়ে শান্ত করতে বলিভীমকে বললেন। উজীরের কথায় বলিভীম উদয়পুর না গিয়ে ভীতচিত্তে মেহেরকুলেই থেকে গেলেন।



এদিকে নবাব ক্রুদ্ধ হয়েছেন জেনে কেশরদাস তাকে তুষ্ট করবার জন্য বলিভীমকে বন্দী করে আনতে পাঁচ জন অশ্বারোহী সৈন্য পাঠালেন। তারা বলিভীমের কাছে গিয়ে পাওনা হিসাবে হাতী দাবী করলো। —

তিন মাস অবাধ রহিছি তোমা দেশ।
হস্তীর পৈছার সংঙ্গে নাহিক উদ্দেশ।।
বিলম্ব করিতে মুই না পারিল আর।
লালারে হইছে ক্রোধ নবারে অপার।।

অতঃপর বলিভীম অন্তঃপুরে যেতে চাইলে তারা বাধা দিয়ে বললো —" হস্তি তংকা দিয়া তুমি করহ গমন।" রাজসভাসদেরা তাদের এই স্পর্দ্ধা সহ্য করতে চাইলেন না। "আজ্ঞাকর পঞ্চজন ফেলাই কাটিয়া।" কিন্তু বলিভীম তাতে রাজি না হয়ে তাদের বন্দীত্ব মেনে নিলেন। বলিভীমের বন্দীত্ব ও পতন বৃত্তান্তের মাধ্যমে এখানে কাব্যের প্রথম খন্ড শেষ হয়েছে। কাব্যের নামকরণ ও কবি খন্ডের শেষে উল্লেখ করেছেন।

" ইতি চম্পকবি জয় বলিভীম নারায়ন বন্দীঃ।"

বলিভীম বন্দী হবার পর ত্রিপুরা রাজ্যে রত্নমাণিক্যের পিতৃব্য জগন্নাথ দেবের বংশ আধিপত্য লাভ করে। ফলে তাঁরাই তখন রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করেন।

সূর্য প্রতাপ নারায়নকে করিল উজির।
পরম ধার্মিক বুদ্ধি গুনবন্ত ধীর।।
দেওয়ান মুন্সি হৈল চাম্পরায় ঠাকুর।
সুবা হৈল জয়মর্দ্দন বলবন্ত সুর।।



সেনাপতি মীরখাঁও এই সময় ত্রিপুরায় আসেন। মোগলের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার জন্য তাকে আনা হয়।

মীরখাঁরে আনি তবে উকিল করিল।
মোগল বুঝাইতে তবে তানে নিয়োজিল।।

এরফলে মীরখাঁ ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। এইসময়ে ত্রিপুর বংশীয় জয়দেব নারায়ণ নামে এক ব্যক্তি যুবরাজ হবার জন্য মীরখাঁকে না জানিয়ে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নবাব কোন অনুসন্ধান না করে নিজস্ব উদারতায় জয়দেব নারায়ণকে যুবরাজ পদে স্বীকৃতি দিলেন। ফলে তিনি উদয়পুরে যুবরাজ হয়ে বসলেন। মীরখাঁ এই খবরে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং জয়দেব নারায়ণকে এক চিঠির মাধ্যমে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন।

বড়ুয়ার পুত্র তুমি বড়ুয়ার নাতি।
তোমার মনেত কেনে জন্মিল কুমতি।।
রাজার বংশের মধ্যে জন্ম হয়ে যার।
সেইজন যুবরাজ পারে হইবার।।

তারপর নবাব দরবারে যেয়ে মীরখাঁ আপত্তি জানালেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে জয়দেব নারায়ণকে যুবরাজ পদ দেওয়া ঠিক হয়নি তাও বললেন।

এদিকে বলিভীমের বন্দীত্বের খবর পেয়ে দুর্গাঠাকুরের দুইপুত্র নরেন্দ্র ও গৌরীচরণ নিজ নিজ অংশ দাবী করে বসলেন। কিন্তু রাজকার্যে মীরখাঁ তখন অসীম ক্ষমতায় আসীন। তিনি তখন দুইভাইকে ডেকে এনে রাজা রত্নদেবের প্রতি কোন বিরুদ্ধ মনোভাব না রাখতে বললেন। মীরখাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল। ফলে তারা মীরখাঁর কথা মেনে নিল। মীরখাঁও রাজ্যে যাতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় তারজন্য গৌরীচরণকে যুবরাজ পদ দেবার জন্য দুইভাইকে



নিয়ে নবাব দরবারে গেলেন ও গৌরী চরণকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন। যুবরাজ চম্পকরায় এই খবর পেয়ে গৌরীচরণকে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য দলবলসহ মেহেরকূলে চলে এলেন এবং তাঁকে সসম্মানে উদয়পুরে নিয়ে গেলেন। রাজ্যের সবাই এতে খুব আনন্দিত হলো।

এই মতে গৌরীচরণ হইল যুবরাজ।
সর্ব্বলোক আনন্দিত ত্রিপুর সমাজ।।

ইতিমধ্যে বাংলার নবাব হয়ে এলেন ইব্রাহিম খাঁ, কাব্যে যার নাম বিরাহিম খান — "খান বিরাহিম হৈল বঙ্গ অধিপতি।" তিনি এসে রাজ্যের অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন রকম কর ধার্য করলেন। চরমুখে খবর পেয়ে খুশী হলেন যে ত্রিপুরায় যথেষ্ট হাতী আছে এবং কর হিসাবে হাতী পাওয়া যেতে পারে। ত্রিপুর রাজ-দরবার থেকে মীরখাঁ নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে পর নবাব তাঁকে এই মনোভাব জানিয়ে রাখলেন —

তোমার রাজার দেশে হস্তি বহুতর।
চরমুখে শুনিয়াছি সকল খবর।।

এদিকে গৌরীচরণ নরেন্দ্রদেবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে উজীর সূর্যপ্রতাপ নারায়ণকে বধ করলেন। নরেন্দ্রদেব তখন নবাব দরবারে ছিলেন। নেব্ — উজীর জয়মর্দ্দন নারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে গৌরীচরণকে বন্দী করলেন। মীরখাঁর মনেও এই প্রত্যয় হলো যে নরেন্দ্রদেব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। তিনি তখন নরেন্দ্রদেবকে নবাব দরবার থেকে বিতাড়িত করবার জন্য ত্রিপুর রাজদরবারের জন্য অন্য একজনকে নরেন্দ্রদেবের পরিবর্তে নবাব দরবারে পাঠাতে রাজা রত্নদেবকে লিখলেন এবং সবদিক থেকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করলেন। রাজা রত্নদেব তখন অনেক ভেবে অনুজ দুর্যোধন ঠাকুরকে পাঠালেন। কিন্তু মীরখাঁর এই খবরে ত্রিপুর দরবার সতর্ক হলো না। চম্পকরায় অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু —



"চম্পকরায়ের কথা কেহ নাহি শুনে।
আপনে আপনে হুলুস্থুল করে সর্ব্বজনে।।"

দরবারের যখন এই অবস্থা তখন অতর্কিতে নরেন্দ্রদেব এসে সসৈন্যে হাজির হলেন মেহেরকূলে। সেখানকার অধিবাসীরা তাদের দেখে ভীত - সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক - ওদিক পালিয়ে যেতে লাগলো। চন্ডীগড়ের সৈন্যরা এই অবস্থায় কিছু বুঝতে না পেরে মেহরকুলবাসীদের জিজ্ঞাসা করলো —

"কহ ভাই তুমি সব ধাও কি কারণ।"

তখন তাদের কাছে নরেন্দ্রদেবের সসৈন্যে আগমনের সংবাদ পেয়ে তারাও দ্রুত পালিয়ে গেলো। ফলে নরেন্দ্রদেব অতি সহজেই চন্ডীগড় দুর্গ অধিকার করলেন। চন্ডীগড় দুর্গ হাতছাড়া হবার পর ত্রিপুর-সৈন্যদল সমরে এগিয়ে এলো। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হবার পর রত্নদেবের সৈন্যদল পরাস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিল।

পরাজিত রত্নদেব আত্মরক্ষার্থে বনে গেলেন। ত্রিপুরাবাসীরা রত্নদেবকে ভাসবাসতো, ফলে তারাও রত্নদেবের সঙ্গে বনে গেলেন। এদিকে নরেন্দ্রদেব উদয়পুরে রাজা হয়ে বসে একজন সেনাপতিকে পাঠালেন রত্নদেবের কাছে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। সেনাপতি রত্নদেবকে খুঁজে বের করে সব বললেন। সেনাপতির কথায় বিশ্বাস করে রত্নদেব ত্রিপুরাবাসীদের সহ আবার উদয়পুরে ফিরে এলেন — ফিরলেন না শুধু চম্পকরায় এবং অনন্তরায়। তাঁরা সবার দৃষ্টির বাইরেই রয়ে গেলেন।

রত্নদেব সভায় আসার পর নরেন্দ্রদেব কপট ক্রন্দন শুরু করে বললেন ---

"বলে ভাই তুমি রাজা আমি সে সেবক প্রজা
কদাচিত নাহি আর ভাব।"



কিন্তু বলা সত্ত্বেও রত্নদেব আর রাজা হতে চাইলেন না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসাবে নরেন্দ্রমাণিক্যকে তিনি রাজা হতে বললেন। রত্নদেবের ইচ্ছায় ইতিমধ্যে গৌরীচরণও মুক্ত হয়ে ভাইয়ের কাছে ফিরে এলেন।

তারপর নরেন্দ্রমাণিক্য রত্নদেবের সভাসদদের ডেকে এনে যাদের শত্রু বলে মনে হলো, তাদের বন্দী করতে লাগলেন। পরে মনে হলো যে চম্পকরায় ও অনন্তরাম ধরা পড়েনি, ফলে তাদের জন্য চিন্তান্বিত হলেন। নরেন্দ্রমাণিক্য বন্দীদের হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। এই খবর পেয়ে গৌরীচরণ নরেন্দ্রমাণিক্যকে বন্দী বা হত্যা না করে প্রথমে চম্পকরায় ও অনন্তরামকে ধরতে পরামর্শ দিলেন। তাঁরা যে প্রধান শত্রু তাও বুঝিয়ে দিলেন। নরেন্দ্রমাণিক্য তখন বাদীদের হত্যা না করে অকথ্য নির্যাতন শুরু করলেন, আর পলাতক শত্রুদের সন্ধান করার জন্য দিকে দিকে চর নিযুক্ত করলেন।

বলদেব ঠাকুর ও জয়মর্দ্দন নারায়ণ খুব দুঃখে দিন অতিবাহিত করছিলেন। তাঁরা অনেক ভেবে মীরখাঁর কাছে এক পত্র পাঠালেন। ত্রিপুর রাজ্যর অন্যান্য শুভাকাঙ্খীরাও সেই সময় মীরখাঁর কাছে হাজির হলেন এবং নরেন্দ্রমাণিক্যকে কিভাবে উদয়পুর থেকে বিতাড়িত করা যায়, তারজন্য সবাই মন্ত্রণায় বসলেন

এদিকে চম্পকরায় ও অনন্তরামকে ধরার জন্য চর চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় যাবার পথও চর দ্বারা বেস্টিত। এঁদের ধরে দেবার জন্য চট্টগ্রামের শাসনকর্তাকে নিজ পক্ষে রাখতে গিয়ে নরেন্দ্রমাণিক্য দুটো হাতী ভেট দিলেন এবং সেই সঙ্গে একটি পত্রও লিখে পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত এঁদের ধরতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে রাজবন্দীদের অনেককে হত্যা করলেন।

চম্পকরায় ও অনন্তরাম অনেক কষ্ট সহ্য করে বনপথ দিয়ে দুর্গম অঞ্চল পেরিয়ে চট্রগ্রামে সেক সাদী নামে এক ফকিরের গৃহে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা চাইলেন। ফকির এঁদের রাজপুত্রের মতো চেহারা দেখে পরিচয় জানতে আগ্রহী হলে চম্পকরায় বললেন যে, তাঁরা উদয়পুর রাজবংশের লোক, জ্ঞাতির সঙ্গে বিবাদ হেতু পলাতক। ফকির তখন তাঁদের খাতির করে আশ্রয় দিয়ে বল্লেন যে নরেন্দ্রমাণিক্যের দূত

চট্টগ্রাম অবধি এসেছে এবং তারা চট্টগ্রামের সুবাদারকে দুটো হাতীও উপহার দিয়েছে। ফলে সুবাদার খুশী হয়ে পলাতক মন্ত্রীদ্বয়কে ধরে দেবার আদেশ সর্বত্র প্রচার করেছেন। ফকির তখন ব্যাকুল হয়ে বল্লেন —

তোমার দেখি মোর দয়া লাগে মনে।
সর্ব্বত্র কুশল তোমা রাখুক নিরঞ্জনে।।
তোমার লাগিয়া হানা বৈছে থরে থরে।
অকারণ আইলা এই দেশের মাঝারে।।

তারপর তাঁরা দুশ্চিন্তায় ফকিরের ঘরে দিন কাটাতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে চম্পকরায় মীরখাঁর কাছে এক পত্র পাঠালেন এই বলে —

নিকলিতে না পারিয়ে নিরোধিছে বাট।
পথে পথে আটক নিষধিছে চকি ঘাট।।
পিতৃ পিতামহের নিমক খাইছ তুমি।
অতএব তোমারে ভাবনা করি আমি।।
....
দেশরাজ্য রক্ষা কর রিপু কর নাশ।
আপনার যশ রাখ খন্ডাও মোর ত্রাস।।

মীরখাঁ এই সংবাদ পেয়ে যুবরাজ দুর্জয় সিংহের সঙ্গে পরামর্শ করে চম্পকরায় ও অনন্তরামকে উদ্ধার করতে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু যুদ্ধ করতে হলে সৈন্য ও অর্থ দুইই প্রয়োজন। মীরখাঁ তখন অন্যত্র অর্থ সংগ্রহে দ্বরাস্থ হয়ে তাদের বল্লেন যে যাঁর প্রসাদে তাঁর এই বিত্ত-বৈভব, সেই প্রতিপালক রাজা রত্নদেব আজ বিপন্ন, অতএব তাঁর হাত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্য ও অর্থের প্রয়োজন।

মীরে বলে যে আমারে কন্মিছে পালন।
বড়ই সংকটে পড়িয়াছে সেই জন।।
যাহার প্রসাদে মোর এ সুখ সম্পদ।
তান পরে পড়িয়াছে বিষম আপদ।।

মীরখাঁর বেগমরা সব শুনে খুব দুঃখিত হলেন। বিনা বিচারে সব অলংকার দিতে স্বীকৃত হয়ে বললেন—

যে জনে নিমক দিয়া করিছে পালন।
তার কার্য্য করিবারে কর প্রাণপণ।।
....
যত কিছু ধন আছে রজত কাঞ্চণ।
এইক্ষণে লৈয়া তুমি করহ গমন।।

এই বলে তারা —

যত অলংকার ছিল হস্তে কর্ণে।
খসাইয়া দিল সব তান বিদ্যমানে।।
সুবর্ণ রজত আছিল মণিমুক্ত হার।
নানারঙ্গে আছিল বিবিধ অলংকার।।

তারপর তারা নানা উৎসাহ বাক্যে মীরখাঁকে উত্তেজিত করতে লাগলেন যাতে তিনি পিছপা না হন। মীরখাঁ তারপর সেই সব অলংকার বাঁধা দিয়ে পাঁচহাজার টাকা সংগ্রহ করলেন। — "পঞ্চ সহস্র তংকা লৈল কর্জ্জ করিয়া।" পরে সেই টাকার সাহায্যে মীরখাঁ সৈন্য যোগাড় করে যুদ্ধের আয়োজন করে রামচন্দ্র হাজারী নামে এক বক্তিকে কিছু সৈন্যসহ পাঠালেন চম্পকরায়ের কাছে। রামচন্দ্রকে বলে দিলেন — যদি পথে কেউ আটক করে তবে যেন সে নবাবের সওয়ার বলে

পরিচয় দেয়। রামচন্দ্র চম্পকরায় ও অনন্তরামের সঙ্গে ফকিরের ঘরে মিলিত হয়ে তাদের মলিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে নিয়ে আসার সময় বাহাদুর সরদার নামে নরেন্দ্রমাণিক্যের এক অনুচরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বাহাদু সরদার বাধা দেওয়াতে দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত বাহাদুর সরদার পরাজিত হয়ে সৈন্যসহ পালিয়ে গেলেন। রামচন্দ্র হাজারীও তাদের দুইজনকে নিয়ে নির্বিবাদে ঢাকায় মীরখাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন। সবাই তখন একত্রিত হবার পর চম্পকরায় কেমন করে নরেন্দ্রমাণিক্য রাজা হলেন আর তাদেরও বনপ্রদেশে পালাতে হলো, তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

এদিকে বাহাদুর সরদার নরেন্দ্রমাণিক্যের দরবারে গিয়ে তার পরাজয়ের ইতিহাস ব্যক্ত করে লজ্জায় অধোবদনে সভা পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। সব শুনে নরেন্দ্রমাণিক্যেও আবার কোন সর্বনাশ হয় ভেবে বিশেষ চিন্তিত হলেন।

দুইজন মহাশত্রু হইল বাহেরে।
না জানি তথা গিয়া কোন চক্র করে।।

নরেন্দ্রমাণিক্য তখন তাঁদের ভয়ে যথাসম্ভব চন্ডীগড়, মির্জাপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি গড় সুরক্ষিত করার ভার ভ্রাতা গৌরীচরণের উপর আরোপ করলেন। নরেন্দ্রমাণিক্যের চেয়ে গৌরীচরণ ছিলেন অত্যন্ত কুটবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি তখন নরেন্দ্রমাণিক্যকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে মোগল শক্তি হিসাবে বড, তাদের সঙ্গে কোন অবস্থায় পেরে উঠা যাবে না, অতএব মোগল প্রতিনিধি আতাউল্লার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই শ্রেয়। শেষ পর্যন্ত গৌরীচরণের কথায় নরেন্দ্রমাণিক্য আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হলেও চতুর্দিকের গড়গুলি সুরক্ষিত করতে লাগলেন। এই যুদ্ধ-সজ্জার বর্ণনার মাধ্যমে কবি হঠাৎ কাব্য শেষ করেছেন।

কাব্যের মূল্যায়ন ঃ—

ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে 'চম্পকবিজয়' একেবারে মূল্যহীন নয়। ত্রিপুরার ইতিহাসে রাজাদের ও রাজপারিষদদের যে দ্রুত ভাগ্য পরিবর্তন ঘটতো তার একটি সুষ্ঠু চিত্র এই কাব্যে প্রতিফলিত। মীরখাঁ, রত্নমাণিক্য, বলিভীম নারায়ণ, নরেন্দ্রমাণিক্য, চম্পকরায় প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলি কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও নিঃসন্দেহে ইতিহাস স্বাক্ষরিত এবং ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপিত। ইতিহাস রসই এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। ভাগ্য বিড়ম্বিত চরিত্র রাজা রত্নমাণিক্য অকস্মাৎ সিংহাসনচ্যুত হয়ে নানা বাধা-বিপদ এড়িয়ে পলাতক জীবন-যাপন করাকালীন রাজার অনুরক্ত প্রজারা রাজাকে পুনরায় সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে — এই কাহিনী নিঃসন্দেহে ইতিহাসাশ্রিত কাব্যের যোগ্য বিষয়বস্তু।

কিন্তু বিষয়বস্তু উপভোগ্য হলেও কাব্যে কবি ততটা রসসৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। এর অন্যতম কারণ, কবির রসসৃষ্টি করার ক্ষমতার অভাব। রত্নমাণিক্যের রাজ্যচ্যুত অবস্থায় বনে গমন, চম্পকরায়ের চট্টগ্রাম পলায়ন এবং ফকিরের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনায় কবির ব্যর্থ প্রয়াস খুব প্রকট হয়ে উঠেছে। কাব্যের এইসব বর্ণনা নীরস বর্ণনার পর্যায়ে পড়ে। অথচ এই সব বর্ণনায় কবির রসসৃষ্টি করার অবকাশ ছিল প্রচুর। তবে পুরো কাব্যটি অনুধাবন করলে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, কবি গ্রাম্যভাবাপন্ন ও সাধারণ শিক্ষিত। উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি করতে হলে যে দক্ষতা ও প্রতিভার প্রয়োজন, কবি মহদ্দিনের সেই ক্ষমতা ছিল না। তাছাড়া কাব্যে অনেক গ্রাম্য শব্দ ছন্দের ও অর্থের প্রয়োজনে আরোপিত। যেমন—

১। কিন্তু কোন শাস্ত্র মধ্যে প্রমান না পাইছি।

২। দুহানের দুই মত শুন দেবগণ।।

৩। মনের হরিষে মুই পসার বৈসাইলাম।

৪। ত্রিপুর বংশের কথা করিমু রচন।

এইরূপ অনেক শব্দ কাব্যে রয়েছে যেগুলো গ্রামীণ কথ্যভাষার পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাতে যে নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির প্রয়োজন তা এই কাব্যে সিদ্ধ হয়নি, ফলে ঘটনার প্রবহমানতা রুদ্ধ হয়ে অনেক ক্ষেত্রে কাহিনীর সজীবতাকে ক্ষুন্ন করেছে। কাব্যের আকস্মিক সমাপ্তির প্রশ্নে এই কথাই মনে জাগে, যদি কবির অকস্মাৎ মৃত্যু না হয়ে থাকে তবে এত বড় বিষয়বস্তুকে চূড়ান্ত রূপ দেবার অক্ষমতাতেই তিনি মাঝপথে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

'চম্পকবিজয়' কাব্যের আখ্যানভাগ অত্যন্ত দুর্বল, ফলে পরিপুষ্টিলাভে সক্ষম না হওয়ায় কাব্যটি সার্থকতায় উন্নীত হয়নি। চরিত্রগুলিকে দুর্বলভাবে নাড়াচাড়া করার ফলে চরিত্রগুলিও অসার্থক এবং সজীবতা লাভে বঞ্চিত। প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে মীরখাঁ অন্যতম। তিনি যে প্রতাপশালী ও মহাধনুর্ধর, কবি তা উচ্ছ্বসিতভাবে কাব্যে ব্যক্ত করেছেন।

মহাসত্ত মীরখান মহাধনুর্ধর।
যাহার প্রতাপ গেল দিগ দিগন্তর।।

কিন্তু কাব্যের কোথাও মীরখাঁর বীরত্ব প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তবে একথা সত্য যে, রত্নমাণিক্যের রাজ্য পুনরুদ্ধারে তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয়। বীর মীরখাঁ অপেক্ষা হৃদয়বান মীরখাঁ রূপে কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে যুবরাজ চম্পকরায়ের বীরত্ব ও মহত্বকে প্রতিফলিত করার মনোভাব নিয়ে কবি কাব্য শুরু করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলছেন —

এহেন অপূর্ব্ব কথা শুনে যেইজনে।
বুদ্ধি সাহস তার বাড়ে সেইক্ষণে।।

আবার একই চিন্তাধারায় গ্রন্থের নামকরণ ও করা হয়েছে ' চম্পকবিজয়'। কাব্যের প্রথম খন্ডের শেষে এই নামকরনের উল্লেখ রয়েছে।



"ইতি চম্পকবিজয় বলিভীম নারায়ন বন্দী"।

চম্পকরায়ের পরাক্রমের উল্লেখও কাব্যে যত্রতত্র রয়েছে।

জগন্নাথ সুত যদি যুবরাজ না হৈত।
রাজার রাজ্যের পরে অনর্থ হইত।।

অন্যত্র— "মহাবীর চম্পকরায় বুঝিয়ে প্রধান।" কিন্তু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এই পরাক্রম ও বীরত্ব প্রতিফলিত হয়নি। রাজা রত্নমাণিক্যের রাজ্য হারিয়ে বনে গমনের সঙ্গে সঙ্গে চম্পকরায় ও পালিয়ে বনে গেলেন। কাব্যের শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তিনি লুক্কায়িত অবস্থায় রয়েছেন। কোন সক্রিয় ভূমিকা তাঁর ছিলনা। মোটকথা কবি তাঁদের বীরত্বের কথা মুখে মুখেই বলেছেন — তাঁদের জীবনের ও কর্মের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয় নি। তাছাড়া ঘটনার দিক থেকে নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির অবকাশ থাকা সত্বেও তার সদ্ব্যবহার কবি করতে সক্ষম হননি। নরেন্দ্রমাণিক্যের রাজ্য লাভ ও রত্নমাণিক্যের বনে গমন, গৌরীচরণের কারা বাস ও কারা মুক্তি, চম্পকরায়ের বনে পলায়ন, রামহাজারী ও বাহাদুর সরদারের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা গুলি কবি সহজ ভাবে বর্ণনাত্মক ভঙ্গীতে বলে গেছেন,ফলে নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির সুযোগ ঘটেনি এবং আখ্যায়িকা কাব্যের উপযোগী করে ঘটনাগুলি পরিবেশিত হয় নি, বরং ঘটনার গতি স্থানে স্থানে ব্যাহত হয়ে অকস্মাৎ কাব্য শেষ হয়েছে। কাব্যটি পড়লে স্বতঃই মনে হয় যে, বিষয়বস্তুটি কবি-প্রতিভার উপযোগী ছিল না।

তবে চম্পকবিজয়ের ভাষা নিঃসন্দেহে মধুর। কথ্য শব্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়। যেমন—

বন্দা, নিমক—	'বাদসাই বন্দা আমি তান নিমক খাই'।
নিখামান—	'মহাসত্ব ইদিলখাঁরে দিল নিখামান'।
নিগামান—	'রাজকার্যে সকলে করয়ে নিগামান'।

গুনাগার সোহিন— 'মুই বড় <u>গুনাগার</u> আশার সোহিন'।
নিকলিতে— '<u>নিকলিতে</u> না পারিয়ে নিরোধিছে বাট'।

বিভিন্ন ভাষার শব্দ যোজনার ফলে 'চম্পকবিজয়' কিছুটা কাব্যময় হয়ে উঠেছে। অলংকারের সুষ্ঠু শব্দচয়ন ও তার ব্যবহার কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুন। এইদিক থেকে কবি কিছুটা সার্থক।

প্রসাদগুণ ঃ—

কবি কাব্যে রস সৃষ্টি করতে সক্ষম না হলে ও তাঁর রচনার প্রসাদগুণকে অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে কাব্যের কিছু কিছু উদ্বৃতি উপরিউক্ত বক্তব্যের সারবত্তা প্রমান করবে। চম্পকবিজয়ের বিষয় বস্তু প্রসঙ্গে কবি বলছেন—

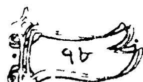
গহিন সমুদ্রে পড়ি মুক্তা তুলিলাম।
মনের হরিষে মুই পসার বৈসাইলাম।।

যুবরাজ চম্পকরায়ের গুন বর্ণনায়—

মহাশয় চম্পকরায় পন্ডিত প্রখর।
উদয়পুর মধ্যে যেন নব শশধর।।

কবি মীরখাঁর সহৃদয়তা ঘোষনা করতে গিয়ে বলেছেন যে দরিদ্রজন তাঁর কাছে সহজে আশ্রয় পায় ও সাদরে প্রতিপালিত হয়। আশ্রিতজন তখন আর তাকে ছাড়তে চায় না —

ফললোভে বৃক্ষ যেন না ছাড়ে পক্ষিগন।
দরিদ্র দুঃখিত সব করয়ে পালন।।



চম্পকরায়ের লুকিয়ে থাকা সময়কে কবি উপমা দিয়ে বলেছেন—

সেকালে চম্পকরায় আছিল লুকাই।
চন্দ্র যেন আছিলেক অম্যাবস্যা পাই।।
কাল অগ্নি মজি যেন আছিল যেমত।
কেশের আড়েতে যেন লুকাইছে পর্ব্বত।।

চন্দ্রসিংহ নারায়ণ মীরখাঁর কথা অনুযায়ী নরেন্দ্রমাণিক্যকে বাধা না দেওয়ায় চন্দ্রসিং নারায়ন নিহত হন। এই প্রসঙ্গে কবি উপমাস্বরূপ বলছেন—

সিংহ যদি পরাক্রম না করে আপনে।
বৃষে তারে মারিতে পারয়ে তৎক্ষণে।

চম্পকরায়ের জন্ম প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

ষোল কলা চন্দ্র যেন উদিত আকাশে।।
....
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন রাজেন্দ্র কোঁয়র।।

এরূপ অনেক উপমা-অলংকার কাব্যে রয়েছে যার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শেখ মহদ্দিনের ভাষার উপর দখলতো ছিলই, মোটামুটি কাব্যবোধ ও ছিল।

মধ্য যুগের জনপ্রিয় পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের মাধ্যমে কাব্যটি প্রনীত। কবি বিশেষ করে ত্রিপদী ছন্দের বর্ণন বৈচিত্র্যে কবিত্বের ছাপ রেখেছেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে কবির বর্ননা শক্তির পরিচয় খুবই প্রশংসনীয়। যেমন — নরেন্দ্রমাণিক্যের রাজ্য জয়ের পর রত্নমাণিক্য রাজ্য ছেড়ে বনে চলে যাচ্ছেন। সেই দৃশ্য বর্ণনায় কবির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।



বালবৃদ্ধ যুবা যত উদয়পুর আছে।
সর্ব্বজন চলি আইল নৃপতির কাছে।।
সর্ব্বজন কাদন্ত যে রাজারে বেড়িয়া।
মহাহুলুস্থুল হৈল উদয়পুর জুড়িয়া।।
হাহা রাজা রত্নদেব ত্রিপুর ঈশ্বর ।
কিরুপে বঞ্চিবা তুমি বনের ভিতর।।
নগরের লোক যত নরনারীগণ।
রাজারে বেড়িয়া সব করয়ে ক্রন্দন।।
বনে প্রবেশিতে গোঁসাই চলিলা আপনে।
আমরা সবেরে সমর্পিলা কার স্থানে।।
শ্যামল সুন্দর তনু কাটিবেক বনে।
দারুন রবির তাপ সহিবা কেমনে।।
সুপবিত্র তনুখানি যেন চাম্পার কলি।
কি মতে হাটিবা তুমি বনপথ চলি।।
এইমত লোকসব করন্ত ক্রন্দন।
শ্রীরত্নমাণিক্য রাজা বিষাদিত মন।।

রাজার দুর্দশায় ও বিচ্ছেদ বেদনায় শোকার্ত ত্রিপুরার প্রজাবৃন্দের মানসিক অভিব্যক্তি এই অংশে সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত। কবি সহজ সরল ভাষায় তাদের মানসিক অবস্থাকে চিত্রায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। কবির ঈশ্বর বন্দনা একই কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কল্যাণহস্ত যে সর্বত্র প্রসারিত এবং তিনি যে সর্বত্র বিরাজমান, এই অভিব্যক্তিকে কবি নানা উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

মৃত্তিকাতে বৈছে প্রভু কঠিন রূপধরি।
পক্ষী বাহন করি বায়ু অবতরি।।
জলমধ্যে রহিছেন স্থূল রূপ হৈয়া।
জলচর রক্ষা করে তাহাতে থাকিয়া।।



কাষ্ঠমূলে অগ্নিরূপে রহিছে ছাপিয়া।
জ্বালাইলে জ্বলে অগ্নি দেখহ ভাবিয়া।।
....
সর্ব্বস্থানে আছে প্রভু লুকিত হইয়া।
পুষ্পের ভিতরে যেন গন্ধ ছাপাইয়া।।
পুরুষ হইয়া নারী সঙ্গে কেলি করে।
নারীরূপ হইয়া পুরুষ চিত্ত হরে।।

কবির এই উপনিষদিক চিন্তাধারা খুবই প্রশংসার্হ। জাতিতে মুসলমান হয়েও হিন্দুধর্মে এই প্রগাঢ় অনুরক্তি বিস্ময়কর। রাজমালার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয়ও কবির এই ঈশ্বর বন্দনায় মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন—

" কবি মুসলমান হলেও হিন্দুর ইতিহাস
বলিয়া গ্রন্থখানা হিন্দুয়ানীভাবে রচনা পক্ষে
যথেষ্ঠ চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে
অনেকটা কৃতকার্য ও হইয়াছেন।"
(" ত্রিপুরায় বঙ্গ ভাষার প্রভাব "— 'রবি' পত্রিকা।)

সমাজচিত্র ঃ—

'চম্পকবিজয়' কাব্যে সমাজের চিত্র বলতে বিশেষ কিছু নেই। ভারতের একটি পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সেই রাজ-সিংহাসন কিভাবে হস্তান্তরিত হয়ে যায়, তারই ইতিহাস এই কাব্যে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক যে নিবিড় ছিল তার প্রমান কাব্যে রয়েছে। চম্পকরায়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব এবং রাজ্যের মন্ত্রনাদাতা হিসাবে মীরখাঁর একাধিপত্য তারই সাক্ষ্য বহন করে।



যশোবন্ত রসকীর্তি সাহা মিরখাঁন।
চম্পকরায়ের প্রিয় প্রানের সমান।।

তাছাড়া চম্পকরায় ও অনন্তরামের প্রতি আশ্রয়দাতা ফকিরের ব্যবহার হিন্দু মুসলিম সম্পীতির পরিচয় বহন করে।

সাবধানে থাক যে আমার অন্তঃপুর।
কদাচিৎ না নিকল পুরীর বাহির।।
তোমরা আসিছ হেন হৈছে মহারোল।
কদাচিৎ না নিকল রাখ মোর বোল।
তোমারে দেখি মোর দয়া লাগে মনে।।
সর্ব্বত্র কুশলে রাখুক নিরঞ্জনে।।

ধর্মের গোঁড়ামী যে ছিল না তার ও প্রমান কবির ঈশ্বর বন্দনাতে মেলে—

সর্ব্বস্থানে আছে প্রভু লুকিত হইয়া।
পুষ্পের ভিতরে যেন গন্ধ ছাপাইয়া।।
পুরুষ হইয়া নারী সঙ্গে কেলি করে।
নারীরূপ হইয়া পুরুষ চিত্ত হরে।।

রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে মীরখাঁর বিবিরাও মীরখাঁ থেকে কম নন। রত্নদেবকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠত করার জন্য যখন চম্পকরায় মীরখাঁর কাছে পত্রসহ দূত পাঠালেন তখন এই কার্য সম্পাদনের জন্য মীরখাঁ কোনোদিক থেকেই প্রস্তুত ছিলেন না। সৈন্য ও অর্থ দুয়েরই প্রয়োজন ছিল। তখন অনন্যোপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বিবিদের দ্বারস্থ হয়ে তাদের অলংকার চাইলেন। তারা কারন জিজ্ঞাসা করাতে মীরখাঁ বললেন—



মিরে বলে যে আমারে করিছে পালন।
বড়ই সংকটে পড়িয়াছে সেই জন।।

সেই কথা শুনে বিবিরা খুব দুঃখিত হয়ে আশ্রয়দাতাকে রক্ষা করার মানসে নির্বিচারে সব অলঙ্কার খুলে দিলেন।

তবে যত অলংকার ছিল হস্তে কর্ণে।
খসাইয়া দিল সব বিদ্যমানে।।

তাবপর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যাতে কোন বিলম্ব না হয় সেই জন্য তাঁরা মীরখাঁকে কর জোরে অনুরোধ কবলেন। আর বল্লেন যে রাজা যেহেতু তাদের প্রতিপালক ও রক্ষাকর্তা, সেই জন্য আর দেরি না করে যত তারাতাড়ি সম্ভব কার্য সম্পাদন বাঞ্ছনীয় এবং এই কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কবতে না পাবলে মীরখাঁ যেন তাদের কাছে মুখ না দেখায়।

যে জনে নিমক দিয়া করিছে পালন।
তার কার্য্য করিবারে কর প্রানপণ।।
যার নূন খাইছ তিনি হৈছে বনান্তর।
কি মতে আপনে এবে বসি রৈছ ঘর।।
এ সকল কর্ম যদি না পার করিতে।
যাবত না সিবা ফিরি মুখ দেখাইতে।।

এই ঘটনায় সাধারণের প্রবল রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া, রত্নদেবের রাজ্য হারিয়ে বনে গমন উপলক্ষে প্রজা-সাধাবনের কাতরোক্তি সহ রাজার সঙ্গে বনে গমন, প্রবল রাজাভক্তির সাক্ষ্য বহন করে। সহজ সরল অভিব্যক্তির মাধ্যমে কবি এই দৃশ্যটি সুন্দর বর্ননা করেছেন।



বাল বৃদ্ধ যুবা যত উদয়পুর আছে।
সর্ব্বজন চলি আইল নৃপতির কাছে।।
সর্ব্বজন কাদন্ত যে রাজারে বেড়িয়া।
মহা হুলুস্থূল হৈল উদয়পুর জুড়িয়া।।

রাজ্যে গুপ্তচরবৃত্তি যে চালু ছিল তারও প্রমান রয়েছে। বলিভীম নারায়ন যখন রাজ্যের কর্ণধার তখন রাজশত্রু চিহ্নিত করার জন্য দিকে দিকে চর নিযুক্ত হয়েছিল। রাজার বিরুদ্ধাচারীকে খুঁজে বের করার জন্য ঘরে ঘরে চর ঘুরতো।

প্রতি ঘরে ভ্রমিত যে বলিভীমের চর।।
কোণে কিবা যুক্তি করে বসয়ে কোথাতে।
চরে আসি কহে সব তাহান সাক্ষাতে।।

রাজা নরেন্দ্রমানিক্য চম্পকরায় ও অনন্তরামকে ধরবার জন্য দিকে দিকে চর নিযুক্ত করেছিলেন।

ঐতিহাসিক সত্য নিরূপন ঃ—

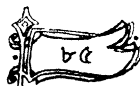
'চম্পকবিজয়' নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য, ফলে এই কাব্যের ঐতিহাসিক সত্য নিরূপন করা সর্বতোভাবে প্রয়োজন। 'চম্পকবিজয়' কাব্যের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। রত্নমানিক্যের রাজ্য লাভ ও রাজ্যচ্যুতি এবং পুনরায় রাজ্য লাভ, নরেন্দ্রমাণিক্যের সিংহাসন লাভ, রামমাণিক্যের শ্যালক বলিভীম নারায়নের যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যুবরাজ চম্পকরায়ের রাজ্যে কর্তৃত্ব ইত্যাদি ঘটনার ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে ঠিকই কিন্তু চম্পকরায় ও মীরখাঁর সম্পর্ক এবং মীরখাঁর যে বিরাট ভূমিকা কাব্যে প্রতিফলিত, ইতিহাস সেখানে অনেকটা নীরব। তবে মীরখাঁর প্রসংঙ্গ বাদ দিলে মূল ঘটনার সঙ্গে 'রাজমালার' মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পুরো কাব্যটি অনুধাবন

করলে এটুকু বোঝা যায় যে, মীরখাঁর চরিত্র সর্বতোভাবে প্রতিফলিত করাই ছিল যেন কবির উদ্দেশ্য। কাব্যের সর্বত্র মীরখাঁর গুনগান এই কথাই প্রমান করে। কাব্যের সর্বত্র মীরখাঁরই প্রাধান্য এবং ঘটনাগুলিও তাঁরই চিন্তাধারায় আবর্তিত। তবে আমিরখাঁ, রত্নদেবের অনুজ দুর্যোধন ও চম্পকরায় যে রত্নদেবের রাজ্য শাসনের ব্যপারে প্রধান সহায়ক ছিলেন তার উল্লেখ 'রাজমালায়' রয়েছে।

রত্নমাণিক্য উকিল আমিরখাঁ ছিল ———
আমিরখাঁ দুর্যোধন আর চম্পকরায়।
তিনে মিলি যত্ন রত্নমাণিক্য সহায়।।

চম্পকবিজয়ের মীরখাঁ ও এই আমিরখাঁ মনে হয় অভিন্ন। তবে এ কথা সত্য যে, কবি কাব্যে মীরখাঁকে অতিরঞ্জিত করে প্রতিফলিত করেছেন।

চম্পকবিজয়ের সময়কার ঘটনা খুবই জটিল। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের 'রাজমালা', কৈলাস সিংহের 'রাজমালা'র ইতিহাস, ত্রিপুরা বুরঞ্জী প্রভৃতি গ্রন্থে পরস্পর বিরুদ্ধ ঘটনার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। যার ফলে ঐতিহাসিক সত্য নিরূপন করা এককথায় দুরূহ। কৈলাস সিংহ মহাশয়ের 'রাজমালায় যে বিবরণ আছে তাহলো এই, রাজা রামমাণিক্যের মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসরের নাবালক পুত্র দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। রত্নমাণিক্যর নাবালকত্বের সুযোগে পিতৃব্য নরেন্দ্রমাণিক্য তাকে সরিয়ে রাজা হন। কিছুকাল পরে নরেন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যু হলে পুনরায় রত্নমাণিক্য ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। মাতুল বলিভীম নারায়ণ রত্নমাণিক্যের পিতৃদেবের আমলেই যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে রত্নমাণিক্য রাজা হয়ে অনুজ দুর্জ্জয়দেব, রাজবংশজ গৌরীচরন ও চম্পকরায় এই তিনজনকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেন। দুর্জ্জয়দেব ও বড় ঠাকুর চন্দ্রমনি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ার ফলে বলিভীম নারায়ণ, গৌরীচরন ও চম্পকরায়ের উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব আরোপ করা হয়। তাঁরা তখন ত্রিপুরা রাজ্যকে তিন অংশে ভাগ করে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।



যুবরাজ চম্পকরায়ের উপর নূরগনা পরগনা ও তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। চম্পকরায়ের মোহরাংকিত সনন্দ নূরনগরের তালুকদারদের কাছে এখনও রয়েছে বলে কৈলাশ সিংহ মহাশয় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ('রাজমালা'-পৃষ্ঠা-৯৫)। নূরনগর পরগনার অন্তর্গত বিদ্যাকুট নিবাসী রামনারায়ণ দেব ১২০৬ সালের ১৮ই বৈশাখ 'চম্পকবিজয়' কাব্যটি নকল করেন। কাব্য সমাপ্তিতে এই বক্তব্যের উল্লেখ রয়েছে।

> " শ্রীরামনারায়ন দেব, সাকিন-বিদ্যাকূট,
> পরগনা-নূরনগর-ইতি-সন-১২০৬ তারিখ
> ১৮ই ভাদ্র।"

এতে মনে হয়, ১২০৬ সালের পূর্ব্বেই এই লেখা হয়েছে। নকল পুঁথি ব্যতীত আজ আর মূলগ্রন্থ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই নূরনগর অঞ্চলের কোথাও এই কাব্য রচিত হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

ত্রিপুরা বুরঞ্জীতে বলা হয়েছে যে, রত্নমাণিক্যের বয়স যখন সাত বৎসর তখন রামমাণিক্য মৃত্যুকালে চম্পকরায়ের উপর রত্নমাণিক্যের ভার অর্পণ করেন। চম্পকরায় যখন সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা করছেন, তখন নরেন্দ্রমাণিক্য বাংলা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে ত্রিপুরা রাজ্য দখল করার জন্য এগিয়ে এলেন। রামমাণিক্যের ভ্রাতা নরেন্দ্রমাণিক্য — "বঙ্গাললৈ সৈ আগত পাৎসালৈ আরু দুই হাতী বঢ়াই দিম, চকার নবাবলৈকো এক হাতী দিম বুলি বঙ্গালর লোকলস্কর আনিলে। এই কথা শুনি চম্পক রায় পলাই ঢকালৈ গল।" পরে নরেন্দ্রমাণিক্য রাজ্য অধিকার করে রাজা হলেন এবং রত্নমাণিক্যকে কাছে রেখে সযত্নে পালন করতে লাগলেন। নরেন্দ্রমাণিক্য রাজ্যশাসন সঠিকভাবে করতে না পারায় রাজ্যে দুর্নীতি চরমে উঠলো। প্রজাদের নানাদিক থেকে নিগ্রহের আর অন্ত রইলো না। বিচার-আচার বন্ধ, সর্বত্র অরাজকতা বর্তমান। এমতাবস্থায় প্রজাসাধারণ গোপনে ঢাকায় চম্পকরায়কে এক চিঠি লিখলো এই বলে —



"নরেন্দ্রমাণিক্য রাজা হয়ে অনীতি প্রবর্তন করেছে, প্রজার সুখ-দুঃখের বিচার নেই। এই কারণে দেশ উচ্ছন্নে গেল। আপনিও ঢাকাতে গিয়ে নিশ্চিত রইলেন। এখন যাতে পূর্ব্বের মত রত্নমাণিক্যকে রাজা করে আপনি রাজ্যশাসন করতে পারেন তারই উপায় চিন্তা করে শীঘ্র আসবেন -- আমরাও আপনার সঙ্গে আছি একথা জানবেন।"

চম্পকরায় এই চিঠি পেয়ে খুব উজ্জীবিত হয়ে সৈন্য সামন্ত জোগাড় করে চন্ডীগড়ে এলেন এবং যুদ্ধে নরেন্দ্রমাণিক্য পরাজয় বরণ করে পালিয়ে গেলেন। পরে তাকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। এদিকে চম্পকরায় ক্ষমতায় আসীন হয়ে ভাগিনেয় কাশীরামকে হাতী খেদার ভার আরোপ করাতে রাজ্যের কিছু সংখ্যক লোক অসন্তুষ্ট হয়ে রত্নমাণিক্যকে এই বলে প্ররোচিত করতে লাগলো যে, চম্পকরায় নিজেকে রাজা বলে মনে করে এবং তিনি উপলক্ষ মাত্র। রত্নমাণিক্য প্রথমে এসব কথায় দোলায়িত না হলেও পরিশেষে তিনি স্তাবকদের কথায় ভুলে এর প্রতিবিধান করতে বদ্ধ পরিকর হলেন। এদিকে চম্পকরায় এই ষড়যন্ত্রের খবরে আবার ঢাকায় পালাতে গিয়ে পথে রাজ-অনুচরদের হাতে ধৃত হন। চম্পরায়কে হত্যা করার অভিপ্রায় রত্নমাণিক্যের ছিল না। বিরোধীপক্ষ রাজার এই মনোভাব বুঝে পথে চম্পকরায়কে তারা হত্যা করে।

রত্নমাণিক্যের রাজত্বের শেষ সময়ে যে চম্পকরায় রাজা হবার ইচ্ছা মনে পোষণ করেন, তার আভাস প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায়। — "রাজা হৈতে মনে তার হইল প্রর্তাষ।" কিন্তু এই অভিলাষ হয়তো ফলপ্রসূ করতে গিয়ে তিনি রাজভক্ত সৈন্যদের দ্বারা হত হন।

বিধাতা বিপক্ষ হৈলে বোদ্ধি হত্র নাষ।
রাজা হইতে মনে তার হইল প্রর্তাষ।।
রাজসন্য সব জত রাজাদিগে হইল।

সব দেখিয়া তবে চিন্তাজুক্ত হইল।।
জত সব পরিবার রাখীয়া দেসেতে।
প্রাণভয় পলাইয়া গেলেক বনেতে।।
রাজসন্য বন হতে ধরিয়া আনিল।
অপরাধ জানি তারে সংহার করিল।।

(প্রাচীন রাজ-মালা)

চম্পকরায়ের প্রথমবার ঢাকায় পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত বর্ণনা দিয়ে কবি আকস্মিকভাবে কাব্য শেষ করেছেন। চম্পকরায়ের মৃত্যু সম্পর্কে কবি সম্পূর্ণ নীরব। কৈলাস সিংহ মহাশয়ও তাঁর রাজমালায় এ সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করেননি। একমাত্র ত্রিপুরা বুরঞ্জী ও প্রাচীন রাজমালায় এই সম্পর্কে উল্লেখ আছে ঠিকই, কিন্তু ঘটনাগত কোন মিল নেই। তবে চম্পকবিজয়ের মূলকাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে কোন দ্বিধা নেই। চম্পকরায়ের মৃত্যু সম্পর্কে নানা বিরুদ্ধ অভিমত থাকায় কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তবে তিনি যে সুদীর্ঘকাল ত্রিপুরার শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়।

— ঃ —



শ্রেণী মালা

দুর্গা মনি উজির

'শ্রেণী মালা'গ্রন্থের রচয়িতা হলেন দুর্গা মণি উজীর। তিনি তৎকালীন ত্রিপুর রাজদরবারের একজন সাহিত্যানুরাগী ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ও 'রাজমালা' প্রনয়ন করেন। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর লেখা 'রাজমালা' অনুসরণে 'রাজমালা' সম্পাদনা করেন।

'শ্রেনীমালা' একটি কুলজি গ্রন্থ এবং চার খন্ডে বিভক্ত। ত্রিপুর রাজবংশ ধারার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন —

ত্রিলোচন দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিন ভূপতি।
তার পুত্র হৈল তৈ-দক্ষিণ যে নৃপতি।।
সেখল রাজার কন্যা বিবাহ করিল।
তার পুত্র সুদক্ষিন নৃপতি হইল।।
তস্য পুত্র তরদাক্ষিন অতি গুনবান।
তার পুত্র ধর্ম্মতার নৃপতি আখ্যান।।
তস্য পুত্র ধর্ম্মপাল হৈল নরপতি।
জীবহিংসা না করিল পালিলেক ক্ষিতি।।

ত্রিপুরা রাজ্যের শুরু থেকে একের পর এক কোন্ কোন্ রাজা এই রাজ্যে রাজত্ব করেছেন, তাঁদের নামের একটি সুষ্ঠু তালিকা গ্রন্থিটির প্রথম খন্ডে পাওয়া যায়। পরবর্তী তিনখন্ডে মহারাজা কল্যাণমানিক্য, গোবিন্দমাণিক্য, ধর্ম্মমাণিক্য, দূর্গামাণিক্য ও মুকুন্দমাণিক্য - এর বংশধারা ও তাঁদের কীর্তি-কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

গ্রন্থ প্রকাশের কোন তারিখ পাওয়া যায় না। তবে মহারাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৬-১৮৩০ খ্রীঃ) দুর্গামনি উজির সমগ্র রাজমালা গ্রন্থটি সংশোধন করে প্রকাশ করেন। 'শ্রেনীমালা' গ্রন্থটি হয়তো সেই সময়ের কিছু পরে লেখা হয়েছে।



'শ্রেনীমালার' মূল পান্ডুলিপি আগরতলায় উজীর বাড়ীতে সংরক্ষিত ছিল এবং পরবর্তী কালে তা অগ্নিকান্ডে দগ্ধ হয়। বর্তমানে মূলপান্ডুলিপির একটি নকল স্থানীয় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। ঐ নকল থেকে গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। মূল পান্ডুলিপি যে দগ্ধ হয়, তা জানা যায় নকল করা গন্থটির প্রথমে লেখা একটি চিঠিতে। নীচে চিঠিটির প্রতিলিপি দেওয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ শরনং

আগরতলা- উজীরবাড়ী,

সবিনয় নিবেদনম্

আপনি আমাদের বাড়ীর শ্রেনীমালা গ্রন্থখানি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে গত অগ্নিকান্ডে উক্ত গ্রন্থখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

স্বর্গীয় মাতা রাজকুমারী ঠাকুরানীর রচিত গানগুলি এ সঙ্গে পাঠানো গেল। নিবেদন - ইতি— ২৬-১২-২৯ ত্রিং।

নিবেদক

শ্রী ব্রজ.................... দেবী।

গ্রন্থ রচনার কারন নির্নয়ে কবি বলেছেন—

" বংশ বীজি না থাকিলে পরিচিত নহে।
পদবন্দ মতে উজীর দুর্গামণি কহে।। "

গ্রন্থটি উদ্দেশ্যমূলক, শুধু বংশধারা বর্ননা করা একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায় গ্রন্থটির কাব্যিক গুন অনুপস্থিত। ত্রিপুরার রাজাদের নাম ও তাঁদের বংশধারার ধারাবাহিক বিবরণ জানার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি একটি মূল্যবান দলিলবিশেষ।



গাজী নামা

কবি শেখ মনুহর।

গাজীনামার কাহিনী ঃ—

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিনাশিক-এর (এই স্থান বর্তমান বিলোনিয়ার অদূরে বাংলাদেশে অবস্থিত) জমিদার ছিলেন নাসির মহম্মদ। পীর মহম্মদ নামে তাঁর এক প্রজার সুলক্ষনযুক্ত একটি পুত্রের জন্ম হয়। পীর মহম্মদ খুশী হয়ে পুত্রের নাম রাখলেন সমসের গাজী। সেই সময়ে শ্রীধর আচার্য নামে এক সুপন্ডিত ব্যক্তি এই শিশুর জন্মবৃত্তান্ত গননা করে দেখেন, নবজাতক সর্বসুলক্ষনযুক্ত এবং ভবিষ্যতে প্রবল প্রতাপান্বিত হওযার সর্ববিধ লক্ষণ বিদ্যমান। পীর মহম্মদ জমিদারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সমসেরের ভাগ্য গণনার খবরে খুশী হয়ে জমিদার তাকে লালন পলেনের ভার গ্রহন করলেন। জমিদারের দুই পুত্রের সঙ্গে শিশু সমসেরেরও বড়ো হতে লাগলো। বাল্যকালেই সমসেরের অপূর্ব মেধার পরিচয় পেয়ে জমিদার নিজের পুত্রদের সঙ্গে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সমসেরও অল্পসময়ের মধ্যেই আরবী, ফার্সী, উর্দু, ও বাংলা ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করলেন। গাজীনামার কবি শেখ মনহুর আলী সমসেরের মেধাশক্তি সম্বন্ধে কাব্যে বলেছেন—

ছঅ মাসে বাঙ্গলার লিখিল বৃত্তান্ত।
পঠুক সকল কেহ নাই সমবন্ত।

এবং তার বিদ্যাশিক্ষার সাফল্যে বলা হয়েছে —

লেখাপড়া গুণবন্ত পীরের নন্দন।
দেখি গুরু হইলেক সানন্দিত মন।।



একদিন মাঠে খোলা ঠান্ডা বাতাসে সমসের শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত অবস্থায় যখন সে স্বপ্ন দেখছিল তখন মাঠে এক বিষধর সর্পের আবির্ভাব হয়। সঙ্গে ছিল রাখাল বালকেরা — তারা দিশাহারা হয়ে ছুটে গিয়ে জমিদারকে খবর দেওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি লোকজন ও পালিত কুকুর সঙ্গে নিয়ে মাঠে ছুটে এলেন। লোকজনদের চিৎকারে সমসেরের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ঘুম থেকে উঠে জমিদারকে দেখে সে তার স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলো —

মোর হস্তে ধরি এক খর্গ তিক্ষ্নধার।
গজের আম্বারি ভ্রমিত বনবেহার।।
খর্গের চমক আর করের পাচনে।
ভূবন জিনিতে পারে হেন লত্র মনে।।
দেখিলুম মোহাতরু ছাআতে বসিলুম।
ভাঙ্গিয়া পরিল বৃক্ষ মনে ভত্র পাইলুম।।
আরবর বটবৃক্ষ নতুন প্রল্যব।
ছবজা রঙ্গ ভাল সব পত্র অসম্ভব।

স্বপ্নের বর্ণনা শুনে জমিদারে তখন শ্রীধর পন্ডিতকে ডেকে এনে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে বললেন। শ্রীধর স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে বললো —

গজকান্দে চরে যেবা স্বপ্নের মাজার।
অবুর্শ্ব প্রদিস্টা বারে সংসারে তাহার।।
যে সকলে স্বপ্নে পাত্র খর্গ খরসান।
তাহার নামের দঞ্জা বাজে থানে স্থান।।
যে সকলে স্বপ্নে দেখে বৃক্ষ ছাআগতি।
সে সকল হত্র জান রাজ্য মহামতি।
বৃক্ষ ভাঙ্গি পরে যদি স্বপ্নে কদ্দাচন।
মাতাপীতা মির্ত্তু হত্র নতুবর জন।।

নতুবা মরিব রাজা কিবা জমীদার।

....

নতুন পর্ল্যব সাকা দেখে যেইজন।

অবর্শ্যা হইব সেই রাজ্যের ভাজন।।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে জমিদার ক্রুদ্ধ হলেও সমসের মনে মনে খুব খুশী হলেন।

কিছুদিন পর গদাহোসেন খন্দকার নামে এক পীরের সঙ্গে সমসেরের দেখা হয়। সমসের ভক্তি সহকারে সেই পীরকে একহাজার টাকা নজরাণা দিলে পীর গাজীকে একটি দৈবশক্তিসম্পন্ন অশ্ব দিয়ে আশীর্বাদ করে বল্লেন যে এই অশ্বের দৌলতে সে রাজা হবে।

পীরে বোলে মন দিয়া শুন পীরসুত।

এ সুবর্ণ ঘোড়ার জান কির্মতে বহুত।।

....

নাছির যাইব মারা পাইবা জমিদারী।

রাজবংস ভঙ্গ হৈবা অধিকারী।।

কিন্তু শিশু রাজার সঙ্গে তোমার হৈব মহারণ।

আল্লাত্র করিলে হৈবা রাজ্যের ভাজন।।

এই সুবর্ণ অশ্ব তোমা দিলুম কারণ।

মুল্লুক বিজত্র হৈবা জানিআ আপন।।

পীরের কথা শুনে সমসেরের মনে উচ্চাশা জেগে উঠলো। তার এক ভাই নাম ছাদু মিঞা, যে ছিল অমিত বলশালী, তার সঙ্গে সমসেরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হলো। কথিত আছে, ছাদু মিঞা একসময় স্বহস্তে দুটি বাঘ ও একটি বিশালকায় কুমীর মেরেছিল। সমসের ভাবলো যে জমিদার নাসির মহম্মদ যখন তাকে পুত্রস্নেহে পালন করছে, তখন তাকে পুত্রের অধিক দয়া করবেন। এই ভরসায় সে জমিদার



কন্যা দৈয়াবিবিকে বিয়ে করার বাসনা জানিয়ে জমিদারের কাছে প্রস্তাব পাঠালো। জমিদার এই প্রস্তাব শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সমসেরকে বেঁধে আনবার জন্য হুকুম দিলেন। জমিদারের অবস্থা তখন — "খেপিলে কুম্ভীর যেন না রহন্ত জালে।" সমসের এই খবর পেয়ে ছাদুর সঙ্গে পরামর্শ করে বেদরাবাদে কাটুয়ার ভৌমিক নূর মহম্মদের আশ্রয়ে চলে গেলেন। নাসির মহম্মদের সৈন্যরা পেছনে ধাবিত হলো ঠিকই, কিন্তু ছাদুর অমিত বিক্রমের জন্য সমরেকে বন্দী করা তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। — "না পারে ছাদুর লাগি গাজি মারিবারে।" সমসেরও ছাদু তাদের ভাগ্যের খবর জানার জন্য পুনরায় পীরের কাছে গেলেন। পীর তাদের ভরসা দিলেন এই বলে —

রোশনাবাদ অবুর্শ্ব হইব তেরা বষ।।
রাজাগোত্র ভঙ্গ হৈব পাইবা রাজধানি।
না রৈব এতাতে জমিদারের নিসানি।।

ছাদু নাসির মহম্মদকে হত্যা করার পরামর্শ দিলে সমসের তাতে রাজী হলেন না। কারণ যার নুন খেয়েছেন তার সঙ্গে তিনি বেইমানী করতে রাজী নন।

গাজিএ বলিলি হেন না শোভে বচন।
পাল্যকত্যা বধিলে কুফিপ নিরঞ্জন।।

কিন্তু ছাদু সমসেরের কথা না শুনে নাসির মহম্মদকে হত্যা করলো। সমসের এই খবর পেয়ে — "বহুল সন্তাপে গাজী করিলা রোধন।"

এদিকে নাসিরের পুত্ররা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সমসেরকে আক্রমণ করলো। সমসের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তাদের ডেকে বললো — "মোরে ভগ্নি বিবাহ দিআ রাখহ পরাণ।" কিন্তু নাসিরের পুত্ররা রাজী না হয়ে বীরদর্পে যুদ্ধ করে নিহত হলো। জমিদার কন্যা দৈয়াবিবি উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত পিতা ও ভ্রাতাদের শোকে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

দৈয়াবিবি দেখি হেন মনে দুক্ষ গুনি।
আনলে দহিয়া মৈল সোগে দুক্ষে পুনি।।

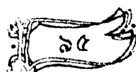
সমসের তারপর দক্ষিণশিকের জমিদার হলেন এবং সেখানকার প্রজাদের ডেকে বললেন যে তারা যদি সবদিক থেকে তাঁকে সাহায্য করে তবে তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

এদিকে নাসির মহম্মদের রতন চৌধুরী নামে এক বিশ্বস্ত কর্মচারী উদয়পুরে মহারাজের কাছে গিয়ে বললো যে, সমসের নামে এক ডাকাত জমিদার নাসির মহম্মদকে মেরে দক্ষিণশিক দখল করে বসে আছে, অতএব প্রতিকার চাই। রাজা এই কথা শুনে প্রতিকারার্থে সমসেরকে ধরে আনবার জন্য উজীর জয়দেব ও সেনাপতি লুচিদর্প নারায়ণকে দক্ষিণশিক পরগণায় পাঠালেন। কিন্তু সমসের যুদ্ধ না করে লুকিয়ে রইলেন এবং সুযোগমত গভীর রাত্রে উজীর জয়দেবকে অপহরণ করে নিয়ে গেলেন। পরদিন সকালে এই খবর পেয়ে ত্রিপুর সৈন্যরা সমসেরের বাড়ী আক্রমণ করলো। সমসের অসংখ্য ত্রিপুরা সৈন্য দেখে বুঝলেন যে পরাজয় নিশ্চিত, তখন কৌশল অবলম্বন করে উজীরকে উচ্চ গৃহের উপর বেঁধে রাখলেন যাতে শত্রুর নিক্ষিপ্ত গুলি বা তীর এসে উজীরের গায়ে বেঁধে। উজীর তখন প্রাণ ভয়ে ত্রিপুর সৈন্যদের ডেকে বললেন —

তুমি সবে না করিয় বাণ বরিষণ।।
অথ বাণ মার সবে মোহকে বিন্ধিব।
নতুবা গাজী এ মোরে কাটিয়া পারিব।।

উজীরের কথা শুনে ত্রিপুর সৈন্যরা যুদ্ধ না করে ফিরে গেলো। তখন সমসের উজীরকে নামিয়ে এনে খুব খাতির - যত্ন করে বললেন —

.... মোর সনদ আনাও।
মোকে জমিদারি দিয়া তুমি চলি যাও।।



উজীর তখন রাজাকে চিঠিতে লিখলেন যে জমিদারী না দিলে সমসের তাকে কোন অবস্থায় মুক্তি দেবে না, উপরন্তু বলেছেন —

লুটি নিব রোশনাবাদ বধিব তোমারে।।
বড়হি বিক্রম ধরে দুই গুণবন্ত।
রাজধানি নাহি দেখি হেন বিরয়ন্ত।।

রাজা এই চিঠি পেয়ে খুব ক্রুদ্ধ হলেন। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সভাসদদের পরামর্শে সমসেরকে সনদ পাঠালেন এবং এর বলে সমসের দক্ষিণশিকের স্বীকৃত জমিদার হলেন।

তারপর সমসের রাজার খাজনা ফাঁকি দেওয়ার জন্য কৌশলে রাজদরবারের কিছু লোককে হাত করে তাদের সাহায্যে তিন বৎসরের খাজনা ফাঁকি দিয়ে জোর করে মেহেরকুলের ইজারা নিলেন।

এই খবর নিয়ে রতন চৌধুরী রাজদরবারে গিয়ে বল্লেন যে সমসের জোর করে রোশনাবাদ দখল করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

নানা অস্ত্রে সাজিয়াছে বন্দুক কামান।
রোসনাবাদ মারিবারে করে অনুমান।।

রাজা তখন সমসেরকে বন্দী করবার জন্য দক্ষিণশিকে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করলেন। উজীর জয়দেবও ইতোমধ্যে খাজনা মিটিয়ে দেবার জন্য সমসেরের কাছে চিঠি পাঠালেন। কিন্তু সমসের খাজনা দিতে অস্বীকার করায় যুদ্ধ শুরু হলো। কাব্যে শেখ মনুহর এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। অবশেষে দেখা গেল পীরের আশীর্বাদ ও দৈব শক্তিই কার্যকরী হয়েছে। যুদ্ধের নিমিত্ত রাজার সৈন্যরা যখন কামানে আগুন দিল তখন — "ধমকে কামান ভাঙ্গি হৈল খানখান।" — ফলে রাজার সৈন্যরা বিপদ বুঝে পিছু হটে মহেশ পুষ্করিণীর পাড়ে চলে গিয়েও



শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলো। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা ইন্দ্রমাণিক্য শোকে বিলাপ করতে লাগলেন। এইসময়ে সমসের সুযোগ করতে লাগলেন। তারপর সুযোগ বুঝে সমসের ছয় সহস্র বলবান সৈন্য নিয়ে উদয়পুর আক্রমণ করলেন। সাতদিন যাবত তুমুল যুদ্ধ হলো, কিন্তু কোন পক্ষই জয়ী হলো না।

উদয়পুরের দেবী মাতাই ঠাকুরাণীর পূজা করতেন রাজা ইন্দ্রমাণিক্য। যুদ্ধের কারণে দেবীর পূজা বন্ধ থাকার ফলে দেবী মাতাই ঠাকুরাণী রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে স্বপ্নে সমসেরের শিয়রে এসে বললেন —

সুনরে সমসের গাজি চিননি আমারে।
বরদিতে আইলাম তোরে ছবে বাঙ্গলারে।।
মতাই ঠাকুরাণি আমি দেবচিহ্ন কাত্র।
নিদ্রা ছাড়ি উঠ জুদ্দ জিনহ লিলাত্র।।
কিছু মোকে মোহ বলি দেয় তুরমান।
অবশ্য জিনিবে জুদ্দ পুরিব কৈল্যাণ।।

সমসের ঘুম থেকে ওঠে ষোড়শপচারে মাতাই ঠাকুরাণীর পূজা দিয়ে আবার যুদ্ধ শুরু করলেন। যুদ্ধে সমসেরের জয় নিশ্চিত বুঝে রাজা ইন্দ্রমাণিক্য তখন অনন্যোপায় হয়ে মণিপুরে পালিয়ে গেলেন। সমসের এই সুযোগে যথেচ্ছভাবে উদয়পুর লুটপাট করে নিলেন।

তারপর সমসের উদয়পুরের সিংহাসনে নিজে না বসে রাজা উদয়মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালী ঠাকুরকে লক্ষ্মণমাণিক্য নাম দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেই সবকিছু করতে লাগলেন। লক্ষ্মণমাণিক্য শুধু সাক্ষীগোপাল হিসাবেই সিংহাসনে বসে রইলেন। প্রতি বৎসর নবাবের খাজনাও (একলক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা) মেটাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সমসের ছাদুর সুন্দর ভগ্নীকেও বিয়ে করলেন।

কিন্তু সমসেরের অর্থলোভ আর মেটে না, দিন দিন এই অর্থস্পৃহা বেড়েই চললো। এই অর্থলোভের বশবর্তী হয়ে তিনি একদিন তাঁর দলবলসহ চট্টগ্রামের

এক কৃপণ জমিদার মিরাহ্য চৌধুরীর বাড়ী আক্রমণ করে জমিদারের সিন্দুকে যে বাইশ লক্ষ টাকা ছিল, তার মধ্যে — "এক লক্ষ ধন ছাদুত্র গাজীএ লুটিয়া আনিল" তারপর সমসের একটি প্রাসাদ তৈরী করে সেখানে সুখে বসবাস করতে লাগলেন। প্রজাদের প্রতি যে তার সুবিচার ছিল, তার বিবরণ কবি কাব্যে লিপিবদ্ধ করেছেন।

লোকের বিচার গাজী করে ভাল মতে।
হকেত বেহক কেহ পারে করিতে।।
গাজির দোহাই পারে নগরে বাজারে।
গজে নাহি মরে লোক ব্যাগ্রে নাহি ধরে।।

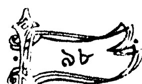
এদিকে সময়ের এই সমৃদ্ধিতে ছাদুর মনে শান্তি নেই। কারন তার সহায়তায় আজ সমসেরের এই সমৃদ্ধি, অথচ সে সব কিছু থেকে বঞ্চিত। ছাদুর অভিযোগ হলো—

আমি করি যুদ্ধ জঙ্গ নাম হয় তার।
আমি মারি ব্র্যাঘ্র ভালুক দোহাই তাহার।।
রাজ্য লইলাম কাড়ি রাজা ভাগে ডরে।
আদেশ ইনছাফ করে, না জিজ্ঞাসে সে মোরে।।

ফলে একদিন প্রকাশ্য সে সমসেরকে বললো—

তোর লাগি জমিদার নাসিরেরে মারি।
রাজবংশ তাড়াইনু রাজদন্ড কাড়ি।।
হুকুমজারি কর তুমি মোরে পরিহরি।
আমি যুদ্ধ জঙ্গ করি তুমি অধিকারী।।

ছাদু প্রচন্ড বিদ্বেষে গায়ের জোরে মাঝে মাঝে সমসেরের বিচার উল্টে দেয়। সমসের তাকে বিচারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে অনুরোধ করলো, কিন্তু ছাদু তা শুনলো না ফলে সমসের রেগে বললেন- -



বিচারের যোগ্য তুমি নহ কদাচন।
কেবল গায়ের জোরে বৈল কি কারণ ।

অবস্থা বুঝে সমসের বসির নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে ছাদুকে হত্যা করলেন। ছাদুর হত্যার খবর পেয়ে তার ভগ্নী শোকে একদিন প্রানত্যাগ করলো। মৃত্যুর সময়ে সে স্বামীকে বলে গেলো

তাহার বিক্রমে তোমার এ সব সম্পদ।
কে আর ধরিবে ঢাল আসিলে বিপদ।।

কিছুদিন পরে সমসের আবার বিয়ে করলেন। সমসেরের কন্যা তনুবিবি ইতিমধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় ঢাকার নবাব স্বতঃপ্রবৃত হয়ে তাকে বিয়ে করলেন সমসের যখন প্রতিষ্ঠার চরম শিখরে তখন ১৭৫১ খ্রীঃ তিনি একদিন সভাসদদের বারন না শুনে রওনা হলেন মুর্শিদাবাদে। যাবার পথে ঢাকায় জামাতা তাকে মুর্শিদাবাদে যেতে নিষেধ করা সত্বে ও তিনি কোন বাধা মানলেন না। ইতি মধ্যে নবাবের কাছে সমসের সম্পর্কে নানা অভিযোগ এসে পৌঁছেছিল। নবাব সমসেরকে দরবারে উপস্থিত দেখে বললেন— " বিচার বিহিনে কার বধিয়াছ প্রান।" এই অভিযোগের প্রতিবাদ স্বরুপ সমসের বললেন যে, তাঁর রাজত্বে সকলেই সুখে আছে এবং কোন চোর ডাকাত এলাকাতেই নেই। নবাব শুনে খুব খুশি হলেন। কিন্তু দরবারে সভাসদ অগাবাখর নামে সমসেরের এক শত্রু নবাবকে মন্ত্রনা দিল—

ভাটীর বাঘ বন্দী করি এরি দিলা কেনে।
আসিয়া মারিবে দেশ সম্মুখের সনে।।
. ...
অদ্যপি ভাল আছে বন্দী করি আনি।
আসিয়া পশ্চাতে তব হইবে পেরশোনি।।



কিন্তু নবাব তা বিশ্বাস করলেন না। অগত্যা আগাবাখর সমসেরকে ভুলিয়ে নিয়ে এলো রংপুরে। ইতোমধ্যে নবাব একজন হার্মাদকে তোপের মোখে উরিয়ে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। আগাবাখর তার বদলে— "সমসের গাজীরে নিয়া বান্ধিলেক তোপে।" আগাবাখরের ছেলে তখন তোপের মুখে আগুন দিল তখন কামানের গোলা সামনে না গিয়ে পেছন দিকে ছুটে এলো। ফলে আগাবাখরের পুত্র মারা যায়। দ্বিতীয়বার সমসেরকে তোপের মুখে বেঁধে আগুন দেওয়ার পর দেখা গেল — "মোহসন্ধ হৈল তোপ ধূম্মে অন্ধকার।" এতে সমসেরের মৃত্যু হলো কিনা জানা যায় না। কেও বলে এতেই তার মৃত্যু হয়েছে, আবার কেও বলে তাকে নাকি মক্কা-মদিনায় দেখা গেছে।

এদিকে সমসেরের মৃত্যুর খবরে দক্ষিণশিকের প্রজারা পিতৃশোক অনুভব করলো। কিছুকাল পর ত্রিপুরায় মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের শাসন শুরু হয়।

"গাজীনামা"র আলোচনা ঃ—

'গাজীনামা' ত্রিপুরার রাজআমলে হস্তলিখিত একটি ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য। এই কাব্যটি শ্রীযুক্ত লুথ্‌ফুল খবির সাহেব চট্রগ্রাম থেকে মুদ্রিত করে ছিলেন বলে শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর " বঙ্গ সাহিত্যের পরিচয় " (পৃষ্ঠা ১৪০৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবার ১৮১৩খ্রীষ্টাব্দে মৌলবী ঘরিব সাহেব এই কাব্যটি ছেপেছিলেন বলে শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর "ইতিহাসশ্রিত কবিতা" (পৃষ্ঠা - ১১২) গ্রন্থে বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে এই মুদ্রিত সংস্করন খুবই দুষ্প্রাপ্য।

'গাজিনামা'র নায়ক হলেন সমসের গাজী, যিনি ত্রিপুরার ইতিহাসে 'ডাকাইত' বলে পরিচিত। অনেকটা শনিগ্রহের মতো ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে তার আবির্ভাব হয় এবং ত্রিপুরার রাজ ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ের যোজনা করে আবার হঠাৎ মিলিয়ে যান। এই কাব্যের রচিয়তা হলেন শেখ মনুহর। তিনি যে গ্রামীন কবি তা কাব্যটি অনুধাবন করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কাব্যের বিভিন্ন

ক্ষেত্রে মুসলমানী শব্দের প্রচুর ব্যবহার কিছুটা দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করলেও যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির জন্যে এই আখ্যান কাব্যটির সরসতা ও বৈচিত্র্যময়তা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

"গাজীনামা" কাব্যের কালনির্ণয় ঃ—

'গাজি নামা'র কালনির্ণয় করতে গিয়ে 'রাজমালা'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছেন— "সম্ভবত ইহা আড়াইশ বছরের প্রাচীন গ্রন্থ।" কিন্তু এই বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই। এই কাব্য রচনার কোন তারিখ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে কাব্যের মধ্যে সমসের গাজীর মুর্শিদাবাদ যাবার তারিখ স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে।

এগারস উনসৈট্য সনের জৈষ্ঠমাসে।
জমাছা বারেতে জান জোহরে সেসে।।
উন্তিসা তারিখ সেই ছিল শুক্রবার।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সমসের গাজীর কাল ছিল আজ থেকে প্রায় সোয়া দু'শ বছর আগে। শেখ মনুহর গ্রাম্য কবি হওয়ার ফলে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল সীমিত। তাছাড়া তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। কবির পিতামহ ছিলেন সমসেরের সমসাময়িক। কবি তাঁর পিতামহের কাছ থেকে সমসেরের জীবন-কাহিনী শুনে এই কাব্য রচনা করেন।

কহে শেখ মনুহরে পাঞ্চালী রচিয়া।
পীতামোহ মুখে বাক্য সকল শুনিয়া।।

১৭৫১খ্রীঃ যদি সমসের গাজী মুর্শিদাবাদ যাত্রা করে থাকেন, তবে পিতামহ ও পৌত্রের ব্যবধানের সময়টুকু বাদ দিলে এই কাব্যটি অন্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত বলে অনুমেয়।



কবি পরিচয়ঃ—

কবি কাব্যে তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ছয়-সাত পুরুষের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁদের আদি নিবাস ছিল ভুলুরায়। তাঁর ঊর্ধতন ষষ্ঠ পুরুষের নাম ছিল সাহা মহম্মদ।

সাহা মহম্মদ নাম
ছিল তালুকদারি কাম।

তাঁর পুত্র—

তাহান নন্দনবর
রূপেগুনে পঞ্চশ্বর
এঁর নাম রমজান।

এই রামজানের পুত্রের নাম হলে' শেখ গাজী -- তিনি পরবর্ত্তী কালে ভুলুয়া ছেড়ে দক্ষিণশিকে এস বসতি স্থাপন করেন।

তাহার পুত্র সেকগাজী।
আল্যাতালা ছিল রাজী।।
আসাপুর্ন পুরিল কৈলান।
ছারিয়া ভুলুয়া দেষ।।
দক্ষিন সিক প্রবেষ।
থানা কৈলাপানুয়া মোকাম।

এই সেক গাজীর পুত্র হলেন জান মোহম্মদ—

তান পুত্র গুনালএ
জান মহাম্মদ হত্র
ধানে ধনে পুন্য অনুপম।

এই জান মোহম্মদের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নাসির্ মহম্মদ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম সাদাক মহম্মদ, যিনি কবির পিতামহ ছিলেন। কবির প্রমাতামহ তাহের উজীর এবং পিতামহেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা নাসির মহম্মদ সমসের গাজীর সমসাময়িক ছিলেন। কবির মাতৃকুলের পাঁচ পুরুষের বর্ণনাও কাব্যে লেখা আছে। মাতৃকুলের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলায়। পরবর্তী কালে ঘটনাচক্রে তারা দক্ষিনশিকে এসে বসবাস করতে লাগলেন।

গ্রাম্যকবি হলেও কবি সেখ মনুহর একেবারে অশিক্ষিত ছিলেন না, তিনি যে বিভিন্ন কাব্য পাঠ কবেছিলেন কাব্যের, রকমারী বর্ণনা ও ভনিতার বৈচিত্র্যই তা প্রমাণ করে। নানাধরনের ভনিতা তিনি কাব্যে আরোপ করেছেন। যেমন—

১) মাতাপিতা গুরুপীর করিয়া প্রনাম।
কহে সেখ মনুহরে গাজী মনস্কাম।।
২) সেখ মনুহর ভনে আমির নন্দন।
সমসের গাজী কথা অপূর্ব কথন।।
৩) সেখ মনুহর ভূনে গাজীর বিজয়ত্র।
৪) সেক মনুহরেক হে পাঞ্চালি সুরষ।
গাজির নীমা পুস্তক হেন মধুরষ।।

নাম করনঃ—

বিদগ্ধ সমালোচক দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর "বঙ্গ সাহিত্যের পরিচয়" -এ (পৃষ্ঠা-১৪০৭) এই কাব্যের নাম দিয়েছেন — "সমসের গাজীর গান।" কিন্তু উপরি উক্ত ৪নং ভানিতায় দেখা যায় কবি নিজেই কাব্যের নামকরণ করেছেন "গাজীনামা"।

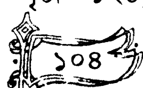
'গাজীনামা'র ঐতিহাসিক পটভূমিকা ঃ—

ত্রিপুরা রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে ত্রিপুরার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমসের গাজীর আবির্ভাব হয়। ত্রিপুরার যুবরাজ জয়মাণিক্য, বিজয়মাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্য সিংহাসন অধিকারের গোলযোগে যে বিপ্লবের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তারই সুযোগে সমসের গাজী হাজী হোসেনের (যিনি হেসেনাবাদ পরগনার ওয়াদ্দার ছিলেন) সহায়তায় ত্রিপুরা আক্রমন করেন। 'রাজমালা'র বর্ণনা অনুযায়ী—

গাজীত্র মনে করে ত্রিপুর রাজ্য লইতে।
হাজি হোসন মুরষ্টি করিল কোনমতে।।

অবশ্য সমসের গাজীর ত্রিপুরা আক্রমনের পূর্ব মুহূর্তে ইন্দ্রমাণিক্য সিংহাসনে আরোহন করেন। অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দৈবানুগ্রহ সমসেরকে বিশেষ ভাবে প্রেরনার সঞ্চার করেছিল। এই কারনেই তার সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রমাণিক্যের বারবার পরাজয় ঘটে। কিন্তু ত্রিপুরার জনসাধারণ সমসেরকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। কারণ ত্রিপুরার প্রজাসাধারণ ছিল অত্যন্ত রাজভক্ত। রাজ্য অধিকার করেও প্রজাদের অসহযোগিতার জন্য তাকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। ত্রিপুরার স্বনামধন্য সমালোচক কৈলাস সিংহ মহাশয় তাঁর 'রাজমালা'য় এই প্রসঙ্গে প্রজাদের মন্তব্য তুলে ধরেছেন।

> "আমাদের রাজবংশ ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও করপ্রদান করিব না, তুমি বাঙ্গালি, তোমার কথা আমরা গ্রাহ্য করিব না।"
> — ('রাজমালা' - পৃষ্ঠা - ১২৪)



• 'রাজমালা' রচয়িতা দুর্গামণি উজীরও লিখেছেন যে, সমসেরের রাজ্যলাভে ত্রিপুরার জনসাধারণ হাতিখেদার কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। সমসের তখন বঙ্গদেশীয় অনুচরদের সাহায্যে সেই খেদার কাজ সম্পন্ন করেন।

না আসিল ত্রিপুর লোক তখনে জানিয়া।
খেদা করে সমসের বাঙ্গাল লোক দিয়া।।

সুচতুর সমসের প্রজাদের এই অসন্তুষ্টির কারণ অনুধাবন করে এক কৌশল অবলম্বন করলেন। নিজে সিংহাসনে আরোহণ না করে উদয়মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র লবঙ্গ ঠাকুরকে লক্ষ্মণমাণিক্য নাম দিয়ে রাজা সাজিয়ে রাজ্য চালাতে লাগলেন। 'কৃষ্ণমালা' কাব্যে এর উল্লেখ আছে —

লোক আসি লবঙ্গ ঠাকুরকে লইয়া।
উপস্থিত হইলেক রিহাঙ্গেতে গিয়া।।
লক্ষ্মণমাণিক্য নাম তখনে করিয়া।
রাজা করিলেক তানে রিহাঙ্গেতে গিয়া।।

কিন্তু লক্ষ্মণমাণিক্য মাত্র সাত বৎসর বেঁচেছিলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্য এদিকে কয়েকবার সৈন্য-সামন্ত যোগাড় করে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেও কৃতকার্য হলেন না। পরে মীরকাশিম দিল্লীর মসনদে বসার পর কৃষ্ণমাণিক্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নবাব কৃষ্ণমাণিক্যের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ত্রিপুরেশ্বর বলে স্বীকার করলেন এবং সেইসঙ্গে সমসেরকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে বধ করলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হলো সমসেরের কাল।

'গাজীনামা' কাব্য একসময়ে ত্রিপুরায় বহুল প্রচলিত ছিল। বিদগ্ধ সমালোচক দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ও তাঁর "বঙ্গ সাহিত্যের পরিচয়" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন - - "এক সময়ে এই পুঁথি ত্রিপুরাঞ্চলে বিশেষ রূপ প্রচলিত ছিল।" —



(পৃষ্ঠা ১৪০৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — ১৯৪৪)। কিন্তু লোকমুখে কথিত হওয়ার ফলে 'গাজীনামা'র কাহিনী ধীরে ধীরে কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। ফলে মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রচলিত কাহিনীর কোথাও কোথাও অমিল আছে। ত্রিপরার বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "সৌভাগ্যক্রমে কৈলাস চন্দ্র সিংহ সংগৃহীত একটি আদ্যন্ত খণ্ডিত পুঁথি শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের সৌজনে আমরা দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। এই খণ্ডিত পুঁথিটি মূল পুঁথিটির একটি আধুনিক প্রতিলিপি — সম্ভবতঃ একশত বৎসররের প্রাচীন। মুদ্রিত সংস্করণটি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ভট্রাচার্য লিখিয়াছেন,—মুদ্রিত সংস্করনের মূল গ্রন্থের অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও পরিবর্তিত হইয়াছে।" -(ইতিহাসাশ্রিত কবিতা- প্রথম সংস্করণ-পৃষ্টা-১১২-১১৩)

জনসমাজে প্রচলিত অতিরঞ্জিত কাহিনীকেই বর্তমান সময়ে অনেকে 'গাজী নামা'র বিষয়বস্তু বলে মনে করেন। মূল পুঁথি অধুনা দুষ্প্রাপ্য বলেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

'গাজীনামা'র রচনাগুণঃ—

কাব্য হিসাবে 'গাজীনামা'র উৎকর্ষতা খুব বেশী নয় যদিও, তবু মাঝে মাঝে কবির রচনার বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষনীয়। তাছাড়া ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে এর মূল্য একেবারে কম-নয়। ত্রিপুরার রাজ-ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় এই কাব্যে বিধৃত। অবশ্য 'রাজমালা' 'কৃষ্ণমালা' 'চম্পকবিজয়' প্রভৃতি কাব্যেও সমসের গাজীর কাল সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এই কাব্যের কাহিনীর প্রমানিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ত্রিপুরার ইতিহাসে বিশেষভাবে দক্ষিণ দেশে সমসের "ডাকাইত" নামেই পরিচিত। কাব্যে কবি শেখ মনুহর চট্রগ্রামের জমিদার মিরাহা চৌধুরীর বাড়ির ডাকাতির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পূর্বাপর ঘটনা ও তথ্য অনুধাবন করলে এই ধারনাই বদ্ধমূল হয় যে, সেই জমিদার কৃপন স্বভাবের ছিল বলেই সমসের তার ধন সম্পত্তি লুট করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যলাভ করে সমসের দরিদ্র প্রজাসাধারণের প্রতি যে রাজোচিত ব্যবহার করেছেন তার বিস্তৃত বিবরণ কাব্যে পাওয়া যায়। তিনি অনেক হিন্দু মুসলমান প্রজাকে চাকলা রোশনাবাদের মধ্যে নিষ্কর ভূমি দান করেছেন।

"তবে গাজী যে সবারে দিল লখেরাজ।
....
বলে দিছে হেন রজক সমসের।
....
রায়ত হইয়া কর্তা দিয়াছেন নিষ্কর।।"

রাজ্যলাভের পব সমসের দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য মন সন্নিবেশ করেন। কবি শেখ মনুহর সমসেরের রাজ্যশাসন ও বিভিন্ন কীর্তি-কলাপের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সমসের অনেক হিন্দু-ব্রাহ্মণদের দেবোত্তর দিয়েছিলেন। সমসের বাজারে সব জিনিষের মূল্য যথোচিতভাবে ধার্য করে দিয়েছিলেন যার ব্যতিক্রম করা একান্ত দুঃসাধ্য ছিল।

হাটবাজারে গাজি মনাদি ফেরাই।
উজন করিয়া দিল নিরেক লিখাই।।
....
তৈল সের বারপণ ঘৃত চারিআনা।
গাজিতে করিয়া দিল এ সব ঠিকানা।।

প্রত্যেক জিনিসের ওজন ধারা হতো বিরাশীর মাপে—"হাটে বাজারে জথ বিরাসি ওজন।" অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগে দেশের বাজার দর কিরূপ ছিল তা উপরি উক্ত তালিকা থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শেখ মনুহর গ্রাম্যকবি হলেও তাঁর কাব্যের বিভিন্ন বর্ণনায় কবিত্বগুণ বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়। সমসের ক্ষমতায় আসীন হয়ে জগন্নাথ-সোনাপুর গ্রামকে গড়বন্দী করে এক বিশাল পুরী নির্মান করেন। গ্রামের চতুর সীমা এবং পুরীর সৌন্দর্য কবি খুব সহজ ভাষায় ও সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন।

দক্ষিননেতে ফেনি নদি, পূর্ব্বে গিরি।
মুড়াবন্দি, উত্তরেতে এহেন জলদি।।
পশ্চিমে মলয়াপানি তার মধ্যে ভদ্রাখানি,
মধ্যে যেন খিরুদের দধি।।

সৈন্য-সামন্ত সহ সমসেরকে বন্দী করতে গিয়ে উজীর জয়দেব যখন বিপরীতে সমসেরের হাতে বন্দী হয়ে ত্রিপুর-রাজার কাছে বাধ্য হয়ে সমসেরকে জমিদারী সনদ দেবার জন্য চিঠি লিখলেন, তখন সেই চিঠি পেয়ে মহারাজ খুব ক্রুদ্ধ হন। মহারাজের সেই সময়ের মাঁনসিক অবস্থা কবি সুষ্ঠু উপমা-অলঙ্কারের মধ্যেমে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন—

দন্ত পরে দন্ত ভিড়ি   দন্তে দন্তে কড়মড়ি
কর্ণে যেন ফুটিলেক সাল।
যেন প্রদ্দলিত ভানু   ফানি রিসে ডংসে তনু
জেন মর্ম্মে ভেদি গেল ছেল।।

কবি একাবলী ছন্দে সমসেরের মুক্তাগারের বর্ণনা করেছেন, যা নিঃসন্দেহে কাব্যগুণ সমৃদ্ধ—

এক তোলা ঘর সোভা। মুনীগন মোন লোভা।।
জেহেন অমরাপুরি। সভানের মোনহারি।।
দেখীতে নিয়া ছন্দা। জেন সত চন্দ্র বান্দা।।
ঝলকে তারকাগণ। চারি পাসে অভরন।।
সেই সে ঘরের ঝরা। পুতিত মুতির ছরা।।
জেহেন চামর দোলে। সুবর্ণ সুতির জলে।।
বিন্দু বিন্দু বারি মোহে। গ্রীষ্ম উষ্ম নাহি রহে।।
...... আনন্দ সানন্দ মন। জেন শ্রীবৃন্দাবন।।

ভান্ডার এবং পাকশালা প্রসঙ্গে কবির বর্ণনা এককথায় অপূর্ব।

পাকশালা দেওয়ানখানা তোসাখানা ভারি।
খুলিল অতিথিখানা ধুমধাম করি।।
ভান্ডারের অধিকার আছাদ ভান্ডার।
চন্দ্রমুদি করিতেছে খরচ খবরদারি।।
তোলকখানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া।
গাজি পালে সে সকলে অন্ন বস্ত্র দিয়া।।
সুন্দিপের অন্ধ এক হাফেজ আনিয়া।
কোরান পাড়ায় সবে পুন্যের লাগিয়া।।
হিন্দুস্থান হৈতে এক মৌলবি আনিল।
আরবি এলেম ছাত্রগনে শিখাইল।।
জগদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি।
শিখাইল ছাত্রগনে বাঙ্গলার বাণী।।

'গাজীনামা'র ভাব-ভাষা-ছন্দ ও বর্ণনাগুণ নিঃসন্দেহে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। কবি শেখ মনুহর সমসেরের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন একান্ত ভক্তের দৃষ্টিতে। বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও কবির কবিত্বগুণ এবং কাব্যের ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। চরিত্র সৃষ্টিতেও কবি বিশেষ পান্ডিত্য দেখিয়েছেন।

সমসেরের মৃত্যু সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। সমসাময়িক কাব্য 'কৃষ্ণমালা' ও 'গাজী নামা'র মধ্যেই এ সম্পর্কে অমিল লক্ষ্য করা যায়। গাজীনামায় কবি বলেছেন যে নবাব-পারিষদ আগাবাখরের চক্রান্তে সমসেরকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়। 'কৃষ্ণমালা'য় উল্লেখ আছে যে, সমসেরকে দস্যু জেনে নিধন করা হয়। আবার দুর্গামণি উজিরের 'রাজমালা'য় সমসেরের মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয়েছে—''তোপেতে উড়ায় গাজি সর্ব্বলোকে দেখে।'' এতে বোঝা যায় যে, সমসেরের মৃত্যু সম্পর্কে কোন সঠিক ধারনা কারও নেই। এমনকি কবিরও নেই। তবে তাঁকে যে হত্যা করা হয়েছে তা তিনটি ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে। কাব্যটি অনুধাবন করলে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, কবি শেখ মনুহর সমসেরের জীবন কাহিনী কাব্যে বিধৃত করেছেন কিছুটা উচ্ছ্বসিত আবেগে ঐ অন্ধভক্তিতে, যারফলে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো কিছু সত্যের অপলাপ হয়েছে।

— ঃ —

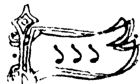
ত্রিপুরায় আধুনিক যুগ

(১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে)

ত্রিপুরার মহরাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের রাজত্বকালকে (১৮৬২ ১৮৯৬ খ্রীঃ) ত্রিপুরার স্বর্ণযুগ বলা যায়। তাঁর রাজত্বকাল থেকে ত্রিপুরায় আধুনিক যুগ শুরু হয়। মহারাজা বীরচন্দ্রের আগ্রহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এইসময় থেকে ত্রিপুরার সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ সুদৃঢ় হতে থাকে এবং ত্রিপুরায় সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চা একটি উত্তুঙ্গ অবস্থায় উন্নীত হয়। মহারাজা বীরচন্দ্র ছিলেন সুকবি ও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও সর্বসমক্ষে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। গুণীর সমাদর তিনি জানতেন বলেই তাঁর আমলে তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ সুদৃঢ় হয় এবং ত্রিপুরার রাজদরবারে বহু গুণী-জ্ঞানীর এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটে। সঙ্গীত কলারসিক বীরচন্দ্র সম্বন্ধে তৎকালীন ত্রিপুরার বিখ্যাত কর্ণেল মহিম চন্দ্র দেববর্মা বলেছেন —

> "স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র ছিলেন বাংলার বিক্রমাদিত্য। তিনি একাধারে বৈষ্ণব কাব্যরসিক কবি এবং সঙ্গীত ও ললিতকলাবিদ ছিলেন। এহেন রসিক চূড়ামণি, সাহিত্যের পাকা জহুরী মহারাজ বীরচন্দ্রের দরবার বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশে ভরপুব ছিল।"
> (দেশীয় রাজ্য - পৃষ্ঠা - ২০৮)

এই দরবারের খ্যাতি সুদূর কাশ্মীর পর্যন্ত পৌছেছিল। কথিত আছে যে, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়ক যদুনাথ ভট্টাচার্য ওরফে 'যদুভট্ট' কাশ্মীর রাজের কাছেই ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র ও তাঁর গুণীজনশোভিত দরবারের কথা শুনে আগ্রহান্বিত হয়ে কোলকাতায় এসে রাজা দিগম্বর মিত্রের পরিচয়পত্র নিয়ে ত্রিপুরার দরবারে আসেন। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি যখন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়নি, তখন রবীন্দ্রনাথের



'ভগ্নহৃদয়' পড়ে কবির মধ্যে এক বিরাট সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পেয়ে মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁর বিশ্বস্ত ও রাজদরবারের বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি রাধারমণ ঘোষ মারফৎ প্রশংসাপত্র পাঠিয়ে তরুণ কবিকে সম্বর্ধিত করেন এবং নিজের মহত্ত্ব ও উদারতায় কবিকে ত্রিপুরার বুকে টেনে আনেন। মহারাজা বীরচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার চরম নিদর্শন পাওয়া যায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনাও শান্তিনিকেতনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করার বিষয়ে তাঁর উৎসাহে। ত্রিপুর দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা যে সেইসময় দরবারসীমা অতিক্রম করে সুদূরপ্রসারী হয়েছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহারাজা বীরচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপুর দরবার তখন সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্পকলার একটি বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেই সময় রাজদরবারে মহারাজা বীরচন্দ্রকে কেন্দ্র করে গুণীজনের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটে। বাংলাদেশ তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরা এসে এই সভা অলংকৃত করেন। ত্রিপুর দরবারের এই সমাবেশের খবর ছিল ভারত বিস্তৃত। ভারত বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া ও সঙ্গীত রচয়িতা যদুভট্টের নাম এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তানসেন বংশজাত রবাব বা রুদ্রবীণবাদক ওস্তাদ কাশেম আলী খাঁ (ইনি সেনী বংশের বিখ্যাত বাদক জাফর খাঁর পুত্র সাদেক আলী খাঁর শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন), কাশ্মীর থেকে আগত কত্থক নৃত্যশিল্পী কুলন্দর বক্‌স্‌, গোয়ালিয়র থেকে আগত সুরশৃঙ্গার ও এগ্রাজবাদক হায়দর খাঁ, উত্তর প্রদেশের সেতার ও সুরবীণবাদক ওস্তাদ নিসার হুসেন, চন্দননগর নিবাসী ও তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজশিল্পী কেশব মিত্র ও পঞ্চানন মিত্র ওরফে পাঁচুবাবু, ধ্রুপদীয়া শিল্পী ক্ষেত্রমোহন বসু (সুরসিক মহারাজ বীরচন্দ্র এঁকে পরিহাসচ্ছলে "দ্রৌপদী" আখ্যায় ভূষিত করেন এবং রাজধানীতে ইনি এই নামেই সুপরিচিত ছিলেন), ঢাকা নিবাসী পাখোয়াজ শিল্পী রামকুমার বসাক, সেতার শিল্পী নবীনচন্দ্র গোস্বামী, খেয়াল ও টপ্পাগায়ক ভোলানাথ চক্রবর্তী, বর্ধমানের বেহালাবাদক হরিশ্চন্দ্র বা হরিদাস পাগলা, মনোহর সাহী কীর্ত্তনীয়া প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঢাকার সাধু তবলচী, কীর্তন রচয়িতা,

ভক্তগায়ক ও রাজকবি মদনমোহন মিত্র, রামপুর নবাব দরবার থেকে আগত ইমামী বাঈজী (ইনি দীর্ঘকাল ত্রিপুর রাজদরবারে বেতনভোগী ছিলেন), বারানসীর তৎকালীন গায়িকা চাঁদা বাঈজী (ইনি মধুকন্ঠী হওয়ায় আজীবন মহারাজার স্নেহধন্য হয়ে ত্রিপুরার বুকে কাটিয়ে গেছেন) প্রমুখ গুণী-জ্ঞানীদের অভূতপূর্ব সমাবেশে ত্রিপুর দরবার ছিল বিশেষ উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

রাজা ও রাজদরবারের প্রভাবে ও প্রেরনায় তখন রাজধানীর ঘরে ঘরে সঙ্গীতচর্চ্চার প্রচলন হয়। এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরার বিদগ্ধ সমালোচক ও সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বলেছেন—

> ''রাজার অনুকরণ রাজপরিবার ও প্রজাসাধারনের ধর্ম। এই সময় রাজনিকেতন এবং রাজধানীস্থ ধনী, দরিদ্র, ভদ্র, ইতর সকলেরই গৃহে সঙ্গীতচর্চা হইতেছিল।'' (পঞ্চমাণিক্য-পৃষ্ঠা-১০১)

মহারাজা বীরচন্দ্র যে কতবড় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তার প্রমান মেলে তাঁর ''হোরি'' ও ''ঝুলন'' কাব্য গ্রন্থে। ভাবে ও আন্তরিকতার গুনে কাব্য দুইটির সঙ্গীতগুলি খুবই সরস ও মধুর হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে প্রায় সব কয়টি গানই বৈষ্ণবীয় ভাবে লেখা। বৈষ্ণবপদ রচনাতে তাঁর ভক্ত হৃদয়ের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি ও অনুশীলন করেছিলেন বলেই বোধহয় বৈষ্ণবপদ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

সঙ্গীতের মতো চিত্রকলায় ও তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল। সঙ্গীত ও চিত্রকলায় তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র মানিক্যের এক বিরাট বৈষ্ণব বৈষ্ণবপদ সংকলনে পরম বৈষ্ণব বীরচন্দ্র বিখ্যাত চিত্রবিদ আলম কারিগরকে দিয়ে কয়েকটি ছবি তৈরী করিয়ে ঐ পদসংকলনে যে সংযোজিত করেন, মহাবাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যেব পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার আত্মকাহিনী ''আবর্জনার ঝুড়ি'' (১৯৭১) তে তার প্রমান মেলে। ছবিগুলি মুসলমান শিল্পীর

মাধ্যমে অঙ্কিত হলেও রাধা কৃষ্ণের লীলাচিত্রের কোথাও বিকৃতি ঘটেনি। বৈষ্ণব পদাবলীর একটি চিত্রসম্বলিত সুবৃহৎ সংকলন করার অভিপ্রায় মহারাজা বীরচন্দ্রের ছিল। এই কারনে বোধ হয় অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ রাজাদরবারের গ্রন্থাগারে সেই সময়ে সংগৃহীত হয় এবং এইকারণেই একলক্ষ টাকা ব্যয় করার সংকল্পও তিনি নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এই সংকল্প শেষ পর্যন্ত সিদ্ধ হয়নি। তাছারা জলরং চিত্র, তৈলরং চিত্র এবং আলোক চিত্র প্রভৃতিতে তিনি অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। আজীবন তিনি চিত্রশিল্পের সাধনা করেছেন। এই কারনে দেশী ও বিদেশী চিত্রকরেরা স্থায়ীভাবে দরবাবে নিযুক্ত ছিল। রাজধানীর জনসাধারণকে এই ক্ষেত্রে উৎসাহদানের জন্য তিনি প্রতি বৎসর রাজপ্রাসাদে এক বিরাট চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন।

সঙ্গীত ও চিত্রকলার মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারে মহারাজ বীরচন্দ্র সমপরিমান কীর্তি রেখেছেন। ত্রিপুরায ইংরেজদের আগমন উপলক্ষে রাজকার্যে ইংরাজী ভাষার প্রসারতা লক্ষ করে তিনি বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃ ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে (১৮৭৪ইং) এক আইন প্রনয়ন করেন। প্রয়োজন ব্যতীত বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার প্রয়োগ ব্যাহত করাই ছিল এই আইন প্রনযনের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া তিনি ছিলেন সুকবি ও বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক। গ্রন্থ প্রনয়ন ও তার প্রচার, সাহিত্যিকদের উৎসাহ প্রদানেব জন্য সুগ্রন্থ মুদ্রনের ব্যয়ভার গ্রহন ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতিসাধন করেছেন। সুসাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থটি মহারাজা বীরচন্দ্রের অর্থ সাহায্যে মুদ্রিত করে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর নামে উৎসর্গ করেন বাংলায় অনুদিত ভাগবত গ্রন্থের মুদ্রন, প্রচার ও বিনামূল্যে তা বিতরন মহারাজা বীরচন্দ্রের একটি স্মরনীয় কীর্তি। বৈষ্ণব পণ্ডিত স্বর্গীয় রামনারায়ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক বহরমপুর থেকে এই গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছিল। কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী কর্তৃক সংকলিত হস্তলিখিত 'গীতচন্দ্রোদয়' পদাবলী গ্রন্থটির "অষ্টকাল - রাগানুরাগ" খন্ড পর্যন্ত তাঁর প্রচেষ্টায় মুদ্রিত হয়। পরবর্তী অংশ তিনি ছাপাবার অবকাশ পাননি।

কাব্যরসিক সুকবি মহারাজা বীরচন্দ্র "হোরি-ঝুলন-প্রেম মরিচিকা-অকাল কুসুম সোহাগ- উচ্ছ্বাস" এই ছয়টি কাব্য রচনা করেন। এছাড়া তিনি পদাবলী সাহিত্যের অনুকরণে বহু সংখ্যক সঙ্গীত রচনা করেন, যে গুলি এই গ্রন্থের সঙ্গীত অধ্যায়ে যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি কবিদের আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করতেন বলে দরবারে তাঁদের স্থান ছিল বিশিষ্ট। তিনি যে সাহিত্যের কতবড় জহুরী ছিলেন, তা প্রমানিত হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম প্রদোষে তাঁকে কবিরূপে সম্বর্ধনা দানে। মহারাজা বীরচন্দ্র সুরসিক ছিলেন বলেই স্রষ্টার সমাদর জানতেন এবং এই কারণেই তাঁর দরবার ভারতের বিখ্যাত গুনী-জ্ঞানীদের বিরাট সমাবেশে ভরপুর ছিল।

— ০ —

মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

মহারাজা বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর ত্রিপুরার অধিপতি হলেন তাঁর পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। পিতা মহারাজের মতো তিনিও ছিলেন পরিচ্ছন্ন শিল্পীমনের অধিকারী। দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, ফলে সেই সময়ের কবি-সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকে তাঁর সাহায্য পুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মানসিক উদারতা তাঁকে এই কারনে দিয়েছে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ ও বলেছেন—

> ''রাধাকিশোর মাণিক্যের মত এতবড়
> নীরব দাতা পাওয়া কঠিন।''
> (রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা-পৃষ্ঠা-১৭)
> 'রবি', ২য় বর্ষ,৪র্থ সংখ্যা,১৩৩৫ত্রিং।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব থাকার ফলে তিনি তাঁর মাধ্যমে বাংলার শীর্ষস্থানীয় সুধী ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন এবং অল্পসময়েই তাঁদের অনেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গঁ সূত্রে আবদ্ধ হন।

যুবরাজ থাকাকালীনই তিনি রাজ্যের নানা দায়িত্বশীল কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। বাংলাভাষার প্রতি অপরিসীম অনুরাগবশতঃ ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে বাংলা ভাষা বিস্তারে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে কৈলাস সিংহ মহাশয় তাঁর 'রাজমালা' গ্রন্থে বলেছেন —

> ''ত্রিপুরায় যুবরাজ রাধাকিশোর দেববাহাদুর ১২৮৭ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যবাসী পইতু কুকিদিগকে বঙ্গীয় বর্ণমালা ও ভাষাশিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথম যত্নবান হন'' — (পৃষ্ঠা - ৩৪১)

ত্রিপুরার রাজনৈতিক জীবনে যখন বিরাট দুর্যোগ চলছে — তখন মহারাজা রাধাকিশোর ত্রিপুরার রাজপদে অভিষিক্ত হন। একদিকে রাজনৈতিক সম্পর্ককে



ভিত্তি করে ইংরেজের সঙ্গে চলছে বিরোধ, অন্যদিকে মহারাজার স্বার্থান্বেষী পার্শ্বচরদের নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দুরভিসন্ধি — এই দু'য়ের টানাপোড়নে মহারাজা রাধাকিশোর হলেন বিভ্রান্ত। ফলে রাজ্যের পরিণতি যে কোনদিকে যাবে, সেই সম্পর্কে ছিল এক চরম অনিশ্চয়তা। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ চরম শুভানুধ্যায়ী হিসেবে কঠিন ভাষায় মহারাজকে সতর্ক করেন।

> "আমি দেখিতে পাইতেছি নানাপক্ষের নানা বিরোধ ও সংঘর্ষ মহারাজকে নিয়তই উৎপীড়িত করিতেছে, আশংকা হইতেছে পাছে ক্রমশঃই জাল জটিল হইয়া পড়ে ও মহারাজকে কোনোপ্রকার অসম্মানের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িতে হয়। পরের বন্ধনে একদিন ধরা দেওয়ার চেয়ে নিজের শাসনে নিজেকে সুকঠিনভাবে বন্ধ করা কর্ত্তব্য।"
>
> (রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা - পৃষ্ঠা - ৫৯
> তারিখবিহীন পত্র - ১৩১২ বাং।

রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও নিজ ব্যক্তিত্বে মহারাজা রাধাকিশোর উপরিউক্ত জটিল সমস্যাগুলো থেকে উত্তরিত হন এবং প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়েই প্রথম এলেন ত্রিপুরায় - কুঞ্জবনে, কোনো এক বসন্তোৎসবকে উপলক্ষ করে।

মহারাজা রাধাকিশোরও পিতা মহারাজের মতো গুনীর সমাদরে করতে জানতেন। বাংলার বহু গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিনি সাধ্যমত সাহায্য করেছিলেন। তিনি যে কবি হেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ চন্দ্র বসুকে অর্থসাহায্য করেছিলেন তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণায়ও কবি হেমচন্দ্র যখন শেষবয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অসহায় ও অসচ্ছল হয়ে পড়েছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় ও মাধ্যমে তিনি যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করেছিলেন। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার মাধ্যমে কবি হেমচন্দ্রের দুরবস্থার খবর পেয়ে মহারাজা রাধাকিশোর স্বেচ্ছায় কবি হেমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে ৩০(ত্রিশ) টাকা করে নিয়মিত অর্থসাহায্য পাঠাতেন। নামের প্রত্যাশী হয়ে কিছু করতেন না

বলেই আজ তা অনেকের বিদিত নয়। রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতার বাণী বহন করে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মহারাজার কাছে এলে তিনি বলেন —

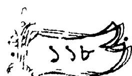
> "আমি বাংলার ক্ষুদ্র রাজা হইলেও বর্ত্তমানে তাঁহাকে যদি কবি মাইকেল মধুসূদনের মত দাতব্য চিকিৎসালয়ে পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয়, তবে দেশের পরম দুর্ভাগ্য।" — (দেশীয় রাজ্য - পৃষ্ঠা - ২১৭ — 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' - পৃষ্ঠা - ৩১)

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ত্রিপুরার কর্ণেল মহিম চন্দ্র দেববর্মাকে লিখেছিলেন —

> হেমবাবুর সাহায্যার্থে মহারাজ যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে এখানে চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়াছে। একথা গোপন রাখা আমার সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে হেমবাবুও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাবোধ করিতেছেন।" ('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' - পৃষ্ঠা - ৩১)

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করাকালীন আচার্য জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে কলেজের গবেষণাগার ব্যবহারে কর্তৃপক্ষের প্রচন্ড আপত্তি ছিল অথচ নূতন গবেষণাগার গড়ার সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। এই সময়ে এই ব্যাপারে হাজার টাকা তোলার দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। এদিকে যুবরাজের জন্য শিক্ষক মনোনয়ন ও নির্বাচনকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে আচার্য জগদীশচন্দ্র মহারাজা রাধাকিশোররে সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। মহারাজা বাধাকিশোর আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণার খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে লিখলেন —

> "এ বেশ আপনার সাজে না, আপনার
> বাঁশী বাজানই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ
> ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব। প্রজাবৃন্দের
> প্রদত্ত অর্থই আমার রাজ ভোগ যোগায়



আমাদের অপেক্ষা জগতে কে আর বড়
ভিক্ষুক আছে? ভিক্ষার ঝুলি আমাকেই
সাজে-- আমাকেই এটা পূর্ণ করতে হবে।''

'চিঠি পত্র' -৬ষ্ঠ খন্ড-পৃষ্ঠা-১১৭-২৮
'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' -পৃষ্ঠা-১৬৬

সেই সময় মহারাজকুমারদের বিবাহের আয়োজন চলছিল। মহারাজা কর্ণেল মহিম ঠাকুরকে বললেন—

''বর্ত্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দু-এক পদ অলংকার না-ই বা হইল, তৎ পরিবর্ত্তে জগদীশবাবু সাগরপার হইতে যে অলংকারে ভারত মাতাকে ভূষিত করিবেন, তাহার তুলনা কোথায়।''

'দেশীয় রাজ্য'—পৃষ্ঠা—২১৯
'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'-পৃষ্ঠা-৪৩

পরবর্ত্তীকালে মহারাজারই অর্থসাহায্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর আরব্ধ কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থসাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়ে মহারাজাকে এক পত্রে লিখলেন—

''জগদীশকে মহারাজ যে পাঁচহাজার টাকা
সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমার
হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে।
মহারাজের উদার মহত্ত্ব বারম্বার অনুভব
করিয়াছি, তাহা চিরকাল মনে রহিবে,
মুখে প্রকাশ করিব কি করিয়া?''

চিঠি-২৪শে শ্রাবন, ১৩০১
'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'-পৃষ্ঠা-৪০৭

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর লিখিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থটি ছাপাবার জন্যে মহারাজা বীরচন্দ্রের কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেয়েছিলেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ তিনি গ্রন্থটি মহারাজার নামে উৎসর্গ করেন। মহারাজা রাধাকিশোরও তাঁকে বাংলার একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী হিসাবে গন্য করে পুরস্কার স্বরূপ ২৫(পঁচিশ) টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর শেষ জীবনে প্রকাশিত "বৃহৎবঙ্গঁ" গ্রন্থটি মহারাজা বীরবিক্রমকিশোরকে উৎসর্গ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সকৃতজ্ঞতাচিত্তে গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে বলেছেন—

> "আমার প্রথম গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং(সম্ভবতঃ) এই শেষ গ্রন্থ 'বৃহৎবঙ্গ' ত্রিপুরেশ্বরদ্বয়ের সঙ্গেঁ সংযোজিত করিতে পারিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমার সাহিত্যিক জীবনের উদয়-অস্ত ত্রিপুর সিংহাসনের উৎসাহ ও আনুকূল্যের রশ্মিপাতে বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষন করিয়াছে।"

তাছাড়া মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের সময় অপ্রকাশিত ও বাংলায় অনূদিত "বৃহন্নারদীয় পুরাণ" পুঁথিটি মহারাজা রাধাকিশোর স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়েই মুদ্রিত করেন।

পিতা মহারাজা বীরচন্দ্রের মতই তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। বৈষ্ণবভক্তের দৃষ্টিতে তিনি কিছু সংখ্যক রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করেন, যে গুলি পরবর্তী সঙ্গীত সংকলন পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহারাজার রাধাকিশোরের অভ্যর্থনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> গুনী রসিক সেবিত উদর তব দ্বারে,
> মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপাচারে,

এই উক্তি তাঁর ক্ষেত্রে সর্বাংশে সত্য। মহারাজা রাধাকিশোরের মানসিক উদারতা ও যথোপযুক্ত বিনয় সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই — থাকতে পারে না।



ত্রিপুরার রাষ্ট্রভাষা

ত্রিপুরার রাজবংশ বহুকাল ধরে ত্রিপুরায় রাজত্ব করেছে ঠিকই, কিন্তু এর আয়তন সবসময় সমান থাকেনি। ত্রিপুরাধিপতিরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও ভারতের অন্যান্য রাজশক্তির সঙ্গে কখনও মৈত্রী ভাবে কখনও বৈরী ভাবে থাকার ফলে এক রাজনৈতিক আবর্তের সৃষ্টি হয়। পঞ্চদশ শতক থেকে পূর্ব ভারতের অন্যান্য স্থানের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ঘটে এবং কালক্রমে তা সুদৃঢ় হতে থাকে। এই সময় থেকেই ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ বাংলাভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী হন এবং তাঁদের আনুকূল্যে ত্রিপুরায় বাংলাভাষার বিশেষ প্রসার ঘটতে থাকে। কর্ণেল মহিম চন্দ্র দেববর্মা তাঁর 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে ত্রিপুরায় বাংলাভাষার প্রসারতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

> ''বঙ্গদেশ মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য। বঙ্গভাষা ত্রিপুরার রাজভাষা, স্মরণাতীত কাল হইতে ইহা শুনা যাইতেছে। ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দের ত্রিপুর রাজ্যের ইতিহাস 'রাজমালা' লিখিত হইয়াছিল বঙ্গ ভাষার পয়ার ছন্দে। স্বনামধন্য ধর্ম্মমাণিক্য এই 'রাজমালা' প্রণয়ন করাইয়াছিলেন।'' — (পৃষ্ঠা - ২২৯)

তারপর ধন্যমাণিক্যের সময়ে দেখা যায়, বাংলাভাষার প্রসারকল্পে মহারাজার আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোনো সময়ে রাজদরবার থেকে 'উৎকলখন্ডের পাঁচালী', 'প্রেতচতুর্দ্দশীর পাঁচালী' এবং জ্যোতিষশাস্ত্র - সংক্রান্ত গ্রন্থ 'যাত্রারত্নাকরনিধি প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থ লেখানো হয়।

শ্রী ধন্যমাণিক্য রাজা কমলার পতি।
উৎকলখন্ড পাঁচালী রচাইল মহামতি।।
জ্যোতিষের যাত্রারত্নাকরনিধি আর।
পাঁচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার।।
('রাজমালা' - ২য় লহর - পৃষ্ঠা - ২৯)



পরবর্তীকালে জনসাধারণের মনে ধর্মচিন্তাকে জাগ্রত করার জন্য মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য ও জগৎমাণিক্যের আদেশে যথাক্রমে "বৃহন্নারদীয়পুরাণ" ও "ক্রিয়াযোগসার" বাংলায় অনুবাদ করা হয়। এইভাবে রাজবংশ পরম্পরায় ত্রিপুরার রাজদরবারে বাংলাভাষা প্রসারের যে একটি সুষ্ঠু প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, বিশেষভাবে রাজানুকূল্য না থাকলে ত্রিপুরায় এই বাংলাভাষার প্রসারতা ঘটতো কিনা সন্দেহ।

ঊনবিংশ শতকে ত্রিপুরার নবজাগরণের পুরোধায় ছিলেন মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য। তিনি ২৭শে ফাল্গুন, ১২৭৯ ত্রিং (৯ই মার্চ, ১৮৭০ইং) রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সেইসময় থেকে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ত্রিপুরার প্রায় সবকিছুই বাংলাভাষার মাধ্যমে লেখা হয়ে থাকে এবং যাবতীয় রাজকার্য তখন বাংলাভাষাতেই চলেছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রসঙ্গে অভিমত হলো —

> "The Bodo-speking people and their rulers everywhere become supporters of the Aryan speech the koches, Tipras and Kacharis adopting Bengalis,and Rabhas, Moches and other adopting Assameese. The Tripura ruling house formally accepted Bengali as their cultural and court language from the 15th century."
> (Dr. Suniti Kumar Chatterjee's article in History and Culture of the Indian people.
> Vol. - V, The Struggle for Empire - page - 362)

ডঃ কার্তিক লাহিড়ীর অভিমতও এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

> "ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তিপ্রা ও রিয়াংদের ভাষা ভোটবর্মী গোষ্ঠীর অন্তর্গত বড়ো পরিবারভুক্ত .... এইসব ভাষাভাষীরা ক্রমে বাংলাভাষা গ্রহণ করার দিকে ঝুঁকেছিলেন, এবং



ত্রিপুরা রাজপরিবার তাদের সংস্কৃতি ও আদালতের ভাষা হিসাবে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছিলেন।" — 'ত্রিপুরার মন্দির' প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৩ পৃষ্ঠা ১৫

ত্রিপুরার রাজভাষা মূলতঃ বাংলাভাষা হওয়ায় ত্রিপুরার প্রাচীন তাম্রপট, মুদ্রা, শিলালিপি, রাজকীয় শীলমোহর প্রভৃতি বাংলাভাষায় লেখা হয়েছে। মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলে দেখা যায়, রেভিনিউ স্ট্যাম্পও বাংলাভাষায় ছাপা হয়েছে। তাছাড়া তিনি আইনের মাধ্যমে বাংলাভাষাকে ব্যবহার ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয় করে তুলেছিলেন। তাছাড়া পার্বত্য জাতিদের মধ্যেও বাংলাভাষা প্রসারের সর্বাঙ্গীন চেষ্টা রাজবংশ পরম্পরায় বহুকাল ধরে চলছিল। প্রশাসনিক কাজে ও আইনের খসড়া তৈরীর ক্ষেত্রে বাংলাভাষা ব্যবহারের ধারাবাহিক নিদর্শনও মহারাজা বীরচন্দ্রের আমল থেকে পাওয়া যায়। তাঁর সময় থেকেই বাংলাভাষা ত্রিপুরার সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই সরকারী ভাষা যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন ও সাবলীল। নীচে মহারাজা বীরচন্দ্রের সময়ের একটি শিক্ষাসংক্রান্ত রোবকারী নমুনা হিসাবে দেওয়া হল

শিক্ষা অধিকার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

B. C. Deb

নং - ৪৩

রোবকারী কাছারী এলাকে স্বাধীন পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রী শ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

ইতি সন ১২৮৭ ত্রিং, তারিখ ১৫ই শ্রাবণ।

প্রকাশ যে ডাইরেক্টরী অফিস ক্রমশই নূতন নূতন সংস্থাপনের সহিত কার্য্যপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে সুতরাং একজনের দ্বারা সমুদয় কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে ওজ্জন্য কয়েকটি বিশেষ নিয়ম করার একান্ত আবশ্যক।



অতএব হুকুম হইল যে —

১। এই স্বাধীন পর্ব্বত ত্রিপুরায় সংস্থাপিত অভিনব ও পূর্ব্ববিদ্যালয় অথবা পাঠশালাসমূহের সংসৃষ্ট কোন'কাগজ ডাইরেক্টারের মন্তব্যসহ অথবা তাহার আফিস হইতে না আসিলে গ্রহণ করা যাইবে না।

২। যে সকল শিক্ষকের ইসিমনবিশী সরকারে না থাকিবে কেবল ডাইরেক্টারের অফিস হইতেই নিযুক্তপত্র দেওয়া যাইবে তাহাদিগকে ডাইরেক্টার উপযুক্ত কারণ থাকিলে কর্ম্ম হইতে স্থগিদ রহিত অথবা স্থানান্তরিত করিতে পারিবে। স্থানীয় সেক্রেটারীর সেইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে নিয়মমতে সবিস্তার রিপোর্ট ডাইরেক্টারী অফিসে করিতে পারিবে। প্রকাশ থাকে যে শ্রীশ্রী মহারাজা বাহাদুরের ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় নামক স্কুলের শিক্ষকগণই কেবল সরকার হইতে ইসিমনবিশী প্রাপ্ত হইবে। ....

সদর ক্যাশের প্রধান কার্য্যকারকের জ্ঞাত ও তামিলার্থে এই মুদ্রিত রোবকারীর এক খন্ড পাঠান যায়। ইতি সম ১২৮৭ ত্রিং, ২১শে আশ্বিন।

শ্রী কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় ·
স্কুল ও পাঠশালার তত্ত্বাবধায়ক

By order,
Radha Raman Ghosh
Director of Public Instruction

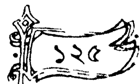
কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা তাঁর 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেদিন বাংলাভাষায় লেখা মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যের মোহর তাঁর কাছে দেখলেন, সেইদিন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খুশীমনে মহারাজা বীরচন্দ্রকে "বঙ্গভাষা সংবর্ধন সভা"র অন্যতম পৃষ্ঠপোষক করেছিলেন।

''ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার সোনার চেনের সহিত একখানা সোনার মোহর দোদুল্যমান দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ''তোর চেইনের ঝলমলানির সঙ্গে যে মোহর চক্‌মক্ করিতেছে, ইহা কোন্ মোহর ?'' আমি বিনম্র বচনে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম(১৮৮৪খ্রীষ্টাব্দের কথা) ইহা আমাদের রাজ্যের মোহর। তিনি হাতে করিয়া পাঠ করিলেন ''শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ পদে শ্রীযুক্ত মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য, শ্রী শ্রীমহারাণী গুণবতী দেব্যা।'' ইহা পাঠ করিয়া তিনি পুলকিত হইয়া উপস্থিত গন্যমান্য ব্যক্তিদিগকে বলিয়া- ছিলেন, 'ইহাতে যে বাংলাভাষা ছাপা। তবে আমার বাংলা রাজভাষা''— পৃষ্ঠা-২২৯

মহারাজা বীরচন্দ্রের পুত্র রাধাকিশোরও ছিলেন বাংলাভাষার একনিষ্ঠ সেবক। বিলাতের বৈজ্ঞানিক সমাজের কাছ থেকে জয়মাল্য নিয়ে দেশে ফেরার পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরের এক অভিভাষনে মহারাজা রাধাকিশোর সম্পর্কে বলেন—

> ''Tha Maharaja was a great scholar in the virnacular, though he was totally unacqßuainted with English language"
>
> ('দেশীয় রাজ্য'-পৃষ্ঠা-২১৯)

মহারাজা রাধাকিশোরের রাজত্বকালে কিছু সংখ্যক ইংরাজী শিক্ষিত রাজকর্মচারী রাজকার্যে ইংরেজী ভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিল। তারা মাঝে মাঝে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে রাজাদেশ প্রচার করতেন। মহারাজা ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। তিনি এই খবরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এক বিশেষ আদেশ জারীর মাধ্যমে



রাজকার্যে বাংলাভাষা ব্যবহারকে অত্যাবশ্যক করে তুলেন এবং তৎকালীন রাজমন্ত্রী (চিফ অফিসার) অন্নদাচরনণ গুপ্তকে এই সম্পর্কে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি নীচে দেওয়া গেল—

শ্রীহরি

অন্নদাবাবু —

এখানকার রাজভাষা বাঙ্গঁলা। বাঙ্গঁলাতেই সরকারী লিখাপড়া হওয়া সঙ্গঁত। ইদানীং কোন কোন স্থলে সরকারী কার্য্যে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার হইতেছে ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি। যাহাতে এরূপ কার্য্য না হয় তাহার প্রতিবিধান করিয়া দিবে। অবশ্য যে কার্য্যে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার অনিবার্য্য তথায় ইংরাজী ভাষা ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। যেমন— Political Dept.। এরূপবস্থা ব্যতীত অনর্থক ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিয়া প্রচলিত ভাষাকে উপেক্ষা করা সঙ্গঁত হইবে না।

২-৯-১৮ মঙ্গঁলাকাঙ্ক্ষী

শ্রী রাধাকিশোর বর্ম্মণ

(''রাজগী ত্রিপুরার সরকাবী বাংলা-ফটো বিভাগ)

পরবর্তীকালে রাজমন্ত্রী রমনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে এক আদেশ পত্রে বলেছিলেন—

> ''এখানে আবহমান রাজকার্য্যে বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানা রূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দুরাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষতঃ আমি বঙ্গভাষাকে প্রানের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিনদিন উন্নত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। ইংরেজী শিক্ষিত কর্ম্মচারীবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরপোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয়, সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।''

- 'গোমতী'-প্রথম বর্ষ-দশম সংকলন ১৩৮১বাং -

'রবি'-২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা - ১৩৩৫ ত্রিং

মহারাজা রাধাকিশোরের পর ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর পর্যন্ত বাংলা ত্রিপুরার রাজভাষারূপে যথোপযুক্ত সন্মান পেয়ে এসেছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই বাংলাভাষা সসম্মানে ব্যবহৃত হয়েছে। মহারাজা ঈশানচন্দ্র থেকে মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর পর্যন্ত অসংখ্য রোবকারী বাংলাভাষায় লেখা হয়েছে। এইসব রোবকারীগুলি পূর্বাপর অনুধাবন করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা গদ্যভঙ্গী সৃষ্টির ক্ষেত্রে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের কতবড় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল। তবে তাঁরা এইক্ষেত্রে কোনোরূপ উন্নাসিকতা বা সংকীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তাঁরা আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী শব্দের বহুল ব্যবহার করেছেন। খানদানী, দরমাহা, রোবকারী, ইপ্তমেজাজ প্রভৃতি ফার্সী শব্দ এবং ট্রেজারী, রিপোর্ট, চিফ অফিসার, বাজেট, কমিটি প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার তাঁদের রচিত বিভিন্ন সরকারী আদেশপত্রে বিশেষভাবে লক্ষনীয়।

ত্রিপুরা তথা আগরতলার ''কিশোর সাহিত্য সমাজ'' এর এক অধিবেশনে ত্রিপুরায় বাংলা ভাষার স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন -

> ''এই রাজপরিবারে ্কাল থেকে বাংলা ভাষার সম্মান চলে আসছে বস্তুতঃ স কল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেব. ম্তৃভাষা নয়, তা াজভাষা, দেশের রাজার যেমন কর্ত্তব্য প্রজা‍েক পালন করা, তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা, ... এই পরিবারে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার োগ নেই অনুরাগসূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।''

— 'রবি' সাহিত্যপত্র - রবীন্দ্র সম্মে ন সংখ্যা - ১ -৩২ বাং - রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা সম্পদকীয় পূবার্ধ।

ত্রিপুরায় ব্যবহৃত বাংলাভাষা ও গদ্যভঙ্গীর নমুনা হিসাবে কয়েকটি রোবকারী নীচে দেওয়া গেল ঃ—

১। রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ইতি সন ১২৭২ ত্রিপুরা, তারিখ ১৬ই শ্রাবণ। এ পক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত রাজত্ব ও জমিদারী শাসন বিষয় কার্য্য সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতেছে না, এবং যে প্রকার ব্যামোহ, ইচ্ছাধীন কোনসময়ে প্রাণবিয়োগ হয় তাহারও নিশ্চয় নাই। এ মতেই ও পক্ষের খানদানের চিররীতি মতে ঐ কার্যনির্ব্বাহ তদর্থক যুবরাজ ও বড়ঠাকুর ও কর্ত্তা নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সেমতে হুকুম হইল যে —

যুবরাজী পদে এ পক্ষের ভ্রাতা শ্রীলশ্রীমান বীরচন্দ্র ঠাকুর ও বড় ঠাকুরী পদে প্রথম পুত্র শ্রীলশ্রীমান ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ঠাকুর ও কর্ত্তাপদে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীলশ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্র ঠাকুরকে নিযুক্ত করা যায় ও এ বিষয়ের এত্তেলা স্বরূপ এই রোবকারীর এক এক কিস্তা নকল জেলা চট্টগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত দায়ের সায়ের কমিসনার সাহেব বাহাদুরান ও জেলাসাহেব ও শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বহাদুরান হুজুরে প্রেরণ করা হয় ইতি। মোকাবিলা - শ্রীগুরুদাস বর্দ্ধন পেস্কার শ্রীশ্রী সহী।

কারো কারো অভিমত এই রোবকারী আসল নয়, জাল। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে জাল হলেও ঐ তারিখেই বা তার দু'চার দিনের মধ্যেই হয়েছে। সুতরাং এই রোবকারী যে আজ থেকে প্রায় পঁচানব্বই (৯৫) বছর আগেকার বাংলাভাষাকে বহন করছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের গুরু এইসময় রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি নাম সই করতেন না, 'শ্রীশ্রী সহী' লিখতেন। তাঁরই স্বাক্ষর ঐ রোবকারীতে শ্রী শ্রী সহী নামে আছে।

২। রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। সন ১২৯৯ ত্রিং, তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।



যেহেতু জানা যায়, এ রাজ্যের পার্ব্বতীয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে **সতীদাহ** অদ্যাপি সম্পূর্নরূপে লয়প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যক।

সেমতে হুকুম হইল যে, —

এতদ্বারা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায়, ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি বা তার উদ্যোগ করা হইলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ দন্ডনীয় হইবে। কার্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়।

৩। 'রোবকারী দববার শ্রীলশ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং, তারিখ ২৮শে অগ্রহায়ণ।

যেহেতু গতকল্য অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর কলিকাতা মোকামে পরলোক গমন করিয়াছেন, আমি খানদানের রীতি এবং এই বংশের চিরপ্রসিদ্ধ কুলাচারমতে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে তৎত্যজ্য জমিদারী চাকলে রোসনাবাদ ও রাজগী ত্রিপুরা এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তিতে মালিক দখলকার হইয়াছি। এখন হইতে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে এ পক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে।

৪। শিক্ষা বিভাগে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের ২২শে চৈত্রের প্রস্তাবানুসারে বোর্ডিং খোলা সাপক্ষে আগামী ১লা বৈশাখ হইতে দ্বিরাদেশ পর্যন্ত ঠাকুর বংশীয় বালকগণকে শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩্ হইতে ৬্ পর্যন্ত ২৫টি বৃত্তির বাবদ মং ১০০্ এ পক্ষের ২৪শে চৈত্রের আদেশ দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে। এই সকল বৃত্তি ছাত্রগণের প্রত্যেক মাসে শিক্ষার উন্নতি, উপস্থিতির সংখ্যা এবং সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করিবে। উপযুক্ততানুসারে বৃত্তি বন্টন ও রহিত করিতে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের অধিকার

থাকিবে। অতএব আদেশ, অবগতি ও আচরণার্থে ইহার এক এক খন্ড প্রতিলিপি, হিসাব বিভাগ জেনারেল ট্রেজারী ও শিক্ষা বিভাগে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩৩৬ত্রিং, তারিখ ২১শে চৈত্র।

৫। এতৎ রাজ্যে জোলাই শ্রেণীর অনেক প্রজা থাকা জানা যায়। তাহাদের সংখ্যা, জাতি, নিবাস কাহার জোলাই এবং তাহাকে কত কর দিয়া থাকে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য হইলে কি কার্য্যের জোলাই, সরকারে কোনরূপ কর দেয় কিনা এবং তাহাদের সমশ্রেণীর অপর প্রজার করের হার কি ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়ার আবশ্যক। অতএব আদেশ হইল যে —

সত্ত্বর উল্লিখিত বিবরণসমূহ সংগ্রহক্রমে রিপোর্ট করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায় ইতি। সন ১৩০৭ ত্রিং, তারিখ ২রা জ্যৈষ্ঠ।

৬। রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধা কিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩১১ ত্রিং, ৫ই ভাদ্র।

যেহেতু সদর জেইলের কয়েদী শ্রীরমনীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রী ছৈনাদ্দি জেইলে আগত হওয়ার অল্পকাল পর উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং এইক্ষণ স্টেইট ফিজিসিয়ানের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে তাহাদের জীবন সন্দিগ্ধ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত কয়েদীদ্বয়কে মুক্তি দেওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত। সেমতে হুকুম হইল যে —

উল্লিখিত রমণীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীছৈনাদ্দি কয়েদীদ্বয়কে মুক্তি দেওয়া যায়। এই আদেশ অগৌণে কার্য্যে পরিণত হয়।

৭। রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩১১ ত্রিং, তারিখ ৫ই ভাদ্র।

যেহেতু রাজপরিবারস্থ কোন ব্যক্তি অথবা শ্রীপাটের কেহ কাহারও নিকট হইতে কর্জ করিলে টাকা উশুলের কার্য্যে নানারূপ অসুবিধার বিষয় ঘটিয়া থাকে, বিশেষতঃ এ পক্ষের বিনানুমতিতে রাজপরিবারের অথবা শ্রীপাটের কেহ টাকা ধার কর্জ লওয়া এ পক্ষের একেবারে অভিপ্রেত নহে, অতএব আদেশ হইল যে —

এ পক্ষের অনুমতি ভিন্ন রাজপরিবারের অথবা শ্রীপাটের কেহই টাকা কর্জ করিতে পারিবেন না এবং কাহারও পক্ষে তাঁহাদিগকে কর্জ ও জিনিষাদি ধার দেওয়াও সঙ্গত হইবে না এবং তদ্রূপ করিলে তাহার নালিশ এ পক্ষের গ্রাহ্যযোগ্য হইবে না। পরিণতির জন্য — এই রোবকারীর প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ উজীর নিকট পাঠানো যায়

৮। এ পক্ষের ১৩১৯ ত্রিং ২৩শে কার্ত্তিকের রোবকারীর অনুসৃতিতে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মণ মন্ত্রীর তন্‌খা ৫০০্ পাঁচশত টাকা মঞ্জুর করা গেল। উক্ত তন্‌খা গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে তিনি পাইবেন। ইতি ১৩১৯ ত্রিং. তারিখ ২৮শে পৌষ।

৯। ঠাকুর লোকের মধ্যে যাহারা কারবার কিংবা অন্যকোন ব্যবসায়ক্ষম এবং যাহারা কারবার করে তাহাদিগকে সংসার অফিস হইতে দরমাহা দেওয়া সঙ্গত নহে, ইহাতে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অতএব আদেশ হইল যে—

ঐ প্রকার লোকের দরমাহা বন্ধ করা যায়. ইতি ১৩২২ত্রিং তারিখ ৭ই বৈশাখ।

১০। রোবকারী দরবার শ্রী শ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মন মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩২৮ ত্রিং ২২শে ফাল্গুণ।

যেহেতু শ্রীল শ্রীমান যুবরাজের শুভ উপনয়নোপলক্ষে নিম্নলিখিত ৫(পাঁচজন) কয়েদিকে মুক্তি দেওয়া এবং অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর যাবজ্জীবন

(২০ বৎসর) কারাদন্ড ভোগের স্থলে অর্দ্ধেক (১০ বৎসর) কমাইয়া দেওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত। অতএব আদেশ হইল যে—

নিম্নলিখিত পাঁচজন কয়েদিকে অদ্য মুক্তি দেওয়া এবং অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর কারাদন্ড ভোগের ২০ বৎসর ভোগের মধ্যে ১০ বৎসর মাপ দেওয়া যায়, অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই রোবকারীর প্রতিলিপি চীফ দেওয়ান সমীপে পাঠান যায়।

১) সোনারাম মালী ২) হরিরায় ত্রিপুরা ৩) আবদুল রহিমকাজি
৪) ব্রতিম আলি ৫) গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১১) বিগত পরশু দিবস দেওয়ান শ্রীযুক্ত অসিতচন্দ্র চৌধুরী কাছারীর সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে মারিয়াছে। অন্য যে কোনো পন্থাবলম্বনে শাস্তি করার প্রয়াসী না হইয়া ব্রাহ্মণকে রাগান্ধ হইয়া এরূপভাবে মারা উর্দ্ধতন কার্যকারকের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত কার্য করা হইয়াছে। অতএব আদেশ হইল যে—
দেওয়ান শ্রীযুক্ত অসিতচন্দ্র চৌধুরীকে উল্লিখিত গর্হিত কার্য্যের দরুণ এক্মাসের জন্য সসপেন্ড করা যায়। কার্য্যে পরিণতির কারণ প্রতিলিপি চিফ দেওয়ান সমীপে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩২৯ ত্রিং তারিখ ৭ই অগ্রহায়ণ।

১২) ত্রিপুরাধিপতি প্রদত্ত ''ভারত ভাস্কর'' মান পত্র নং-২৫২ সিল-পদ্মমোহর স্বাক্ষর-শ্রী বীরবিক্রম মাণিক্য

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে-সি-এস-আই। এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য।

নরপতেরাদেশায়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু পরমস্য বিরাজতে রাজধানী-হস্তিনাপুরী। —ইতি-১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৫শে বৈশাখ।

যেহেতু বাঙ্গাঁলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতি তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত,—

যেহেতু মর্ত্ত্য দেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ- "মর্ত্ত্যোহ মৃতো ভবতি এতবদনুশাসনম্," ঋষিরা কাব্যের ভিতর দিয়া ভগবদ্‌সত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগতকে দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনায় অংকুরোদগত সেই অমর জ্যোতিঃ প্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতামহ গুনীরসিক আকর্ষণ করায়- তিনিই তরুণ রবিকে রাজ অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

যেহেতু এ পক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব-যুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহৃদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া করিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে, কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন —

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃকার্য্যে বৃত হইবার গৌরবলাভ এ পক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্মবার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভস্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা যুগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুরা রাজ্যের কর্ত্তব্য, — "জ্যোৎস্নাভিরাহত মহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্" —

অতএব

এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে 'ভারত ভাস্কর' আখ্যায় ভূষিত করা যায়, — এবং শ্রীভগবান্ তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থ দেহে শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।

— ঃ —

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের কাব্য গ্রন্থ

"হোরি কাব্য"

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরঃ—



ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ উৎসব পালিত হয়ে থাকে, যে উৎসব গুলি নিছক আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার নয়, এই উৎসবগুলি জাতীয় ঐতিহ্যকে আবহমান কাল বহনকরে রাখে। আসামের বিহু উৎসব, রাজপুতানায় 'ফাগ' উৎসব যেমন বিখ্যাত, তেমনি ত্রিপুরার 'হোরি' উৎসব। এই উৎসব বহুকাল ধরে ত্রিপুরার ঐতিহ্য কে বহন এখন পর্যন্ত চলে এসেছে। আজও ত্রিপুরাবাসী পূর্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী এই উৎসব সাড়ম্বরে পালন করে। ত্রিপুরার মহারাজারা বংশ পরম্পরায় এই বিশেষ উৎসবের দিনে সব বিভেদ ভূলে রাজোচিত গাম্ভীর্য ও মর্যাদা যথাসম্ভব দূরে রেখে সকলকে সাদর আহ্বানে আত্মীয় করে নিতেন। সেদিন এই আহ্বানের পেছনে ছিল আমিত্ববোধ ও অহংকারকে সরিয়ে দিয়ে আন্তরিকভাবে মেতে ওঠার আকাঙ্খা। প্রজাবৃন্দেরও সেদিন ছিল এই নির্মল আনন্দে অংশগ্রহন করার অবাধ অধিকার। সেদিনের জন্য রাজদর্শনের একমাত্র ভেট ছিল ভক্তি-মিশ্রিত আত্মনিবেদন সহ সুবাসিত আবির। প্রতিদানে মহারাজার কাছ থেকে তারা পেতো 'প্রসাদী রাঙ্গাঁধুলি কনা'। বাইরের সম্মানিত অতিথিদেরও এই হোলি উৎসবে যোগদানের জন্য আদর আমন্ত্রন জানানো হতো। মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য সুদৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তিতে সেইসময়ে চট্টগ্রামের ইংরেজ গভর্নর হ্যারি ভারলেষ্ট ও তাঁর কয়েকজন উচ্চাপদস্থ সহকর্মী ইংরাজদের রাজপুরীতে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তার উল্লেখ 'কৃষ্ণমালা' কাব্যে আছে, হ্যারি ভারলেষ্টও এই আমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেছিলেন।

বিধিমত দোলযাত্রা করি সমাপন।
পাঠাইল সাহেব নিকটে নিমন্ত্রণ।।
ইংরাজ সকলে পাইয়া নিমন্ত্রণ।
রাজপুরে গেল হুলি খেলার কারণ।।

কৃষ্ণমালার কবি এই হোলি খেলার বিবরণও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

আতর গোলাপ গন্ধে সভা আমোদিত।।
সুগন্ধি আবির চূর্ণ আনি ভারে ভারে।
পুঞ্জ পুঞ্জ করি রাখে সভার মাঝারে।।
পাত্রগণ সহিতে বসিল মহারাজ।
হাড়িবিলাস সাহেব প্রভৃতি ইংরাজ।।
সবে মিলি বসি তথা খেলাইল হুলি।
ফল্গু চূর্ণ পরস্পরে অঙ্গেঁ মারে মেলি।।
সুললিত নানাবাদ্য চতুর্দিকে বাজে।
নর্ত্তকী সকল নাচে মনোহর সাজে।।

হোলি উৎসবের আড়ম্বর কিরূপ ছিল, তা উপরি উক্ত বর্ণনায় কিছুটা প্রমাণিত হয়।

এই হোলি উৎসব পরবর্তীকালে মহারাজা বীরচন্দ্রের সময়ে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠে। মহারাজা বীরচন্দ্র ছিলেন পরম বৈষ্ণব-ভক্তকবি ও সুগায়ক। ফলে হোরি উৎসবে তিনি হতেন মাতোয়ারা। ভাবেও ভক্তিতে বিভোর হয়ে তিনি স্বরচিত হোরির গান গাইতেন। রাসলীলাকে কেন্দ্র করে রাধা-কৃষ্ণ সম্পর্কিত এই হোরি উৎসব গানগুলি তিনি পরবর্তী কালে সংকলিত করে 'হোরি' নামে কাব্যাকারে প্রকাশ করেন। মহারাজা বীরচন্দ্রের এই গানগুলি বিভিন্ন বৈষ্ণব পর্বোপলক্ষে রাজ অন্তঃপুরে মহিলারা গাইতেন। কাব্যটিতে মোট ৩৪টি সঙ্গীত আছে। রাসলীলা বর্ণণের মাধ্যমে ভক্তের আকুতি সঙ্গীতগুলিতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

কাব্য রচনার কোনো সন তারিখ পাওয়া যায় নি। তবে ১৩০২ ত্রিপুরাব্দের(১৮৯২ইং) পূর্বে কোনো একসময়ে কাব্যটি রচিত হয়। কেন না, ১৩০২ ত্রিপুরাব্দে কবির পরবর্তী কাব্য "শ্রী শ্রী ঝুলন গীতি" কাব্যটি প্রকাশিত হয়।

কাব্যের শুরুতে কবি পদাবলী সাহিত্যের রীতি অনুসরণ করে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা জানিয়ে গৌর ভজনা করেছেন।

সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণ চৈতন্য দেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান্ সহগণ-ললিতান্ শ্রীবিশাখান্বি তাংশ্চ।।

বৈষ্ণবং-ভাবাপন্ন কবি গৌরাঙ্গের রাধাভাবকে প্রকাশ করে বলছেন—

পূরব কালের খেলা মনেতে হইল।
হা হা প্রাননাথ বলি কাঁদিতে লাগিল।।

রাধাকৃষ্ণের রাসলীলাকে উপলক্ষ করে ভক্তিপূর্ণ ভাবে সঙ্গীতগুলি রচিত হলেও আলোচনার সুবিধার জন্য এইগুলিকে 'অভিসার', 'মিলন', 'রাসলীলা' এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

কাব্যে 'অভিসার' পর্যায়ের পদ তিনটি। কবি কবিতাগুলির অভিসার নামকরণ করলেও কবিতাগুলিতে রাধার রূপবর্ণনা বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

সমান ষোড়শী সমান রূপসী
নবীন মালা সঙ্গিনী সঙ্গে
অঙ্গের আভরণ কাঁচলী বন্ধন
সমান সমান বেনী ঝুলিছে অঙ্গে।



অন্য একটি পদে—

চরন চালনে দোলিছে দোলনে
হেমপৃষ্ঠে বেণী সঘন ঘন
কর্ণে কুন্ডল মনি ঝলমল
যেমন সৌদামিনী ঝলকে ঘন।

'মিলন পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কবি রাধাকৃষ্ণের মিলনের চিত্র এঁকেছেন। এই মিলনে প্রকৃতিও সক্রিয়। প্রকৃতি-চিত্র অংকনে কবি একজন নিপুন চিত্রকর।

আজু অপরূপ বৃন্দা বিপিনকি মাঝে,
বিহরই ঋতুরাজ মনোহর সাজে।
নবীন পল্লবে কিবা সুশোভিত ডাল,
কত 'সারী, শুক, পিক গাওয়ে রসাল।
নানা জাতি ফুলদলে শোভিত কানন অন্তে,
মৃদু মৃদু বহতহি মারুত বসন্তে।

রাসলীলাকে উপলক্ষ করে কবি রাধাকৃষ্ণের হোরি খেলার সুন্দর চিত্র এঁকেছেন।

রসে ডগমগ ধনী আধ আধ হেরি,
আঁচল সঁঞে ফাগু লেই কুঁয়রী।
হাসি হাসি রসবতী মদন তরঙ্গে,
দেয়ল আবির রসময় অঙ্গেঁ।
সুচতুর নাহ হৃদয়ে ধরু প্যারী,
মুচকি মুচকি হাসি হেরত গোরী।

হোরি খেলার চিত্র ছাড়াও কবি 'রাসলীলা' পর্যায়ের কবিতাগুলিতে রাধাকৃষ্ণের মাধুর্যময় রূপের বর্ণনা করেছেন। কবির চিত্রাঙ্কন প্রতিভা অসাধারণ। তাই অংকিত রাধাকৃষ্ণের চিত্রগুলি অত্যন্ত সজীব ও প্রানবন্ত। একটি কবিতায় কবি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন।

নব নীরদ নিন্দি সুনীল তনু,
তাহে কুন্ডল ঝলকত বিজুরী জনু,...............
কুন্ডল মণিময় গন্ডে বিরাজে,
দামিনী ঝলকত মত ইহ সাজে।
মনিময় নুপূর শ্রীপদে বাওয়ে।

আর একটি পদে—

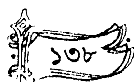
নব নীরদ নীল সুঠাম তনু,
শিখিপুচ্ছ শিরে জিনি ইন্দ্রধনু।
অধরোজ্জ্বল রক্তিম বিম্ব জানি,
গলে শোভিত মোতিম-হার মনি।

রাধার রূপ বর্ণনায়—

শতকোটি চাঁদ জিনিয়া মুখমন্ডল
ভাঙ তিমির ঘন ঘোর,
বিকশিত কিরণ শ্রুতি কুবলয় পরি
ধাবই নয়ন-চকোর।
তরুন অরুণ রুচি রঞ্জিত ও সিন্দুর ভাল সুধাকর কাঁতি
সো ঘন তিমির চিকুর বিচুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি।

আবার যুগল রূপের বর্ণনায় ও কবি বিশেষ দক্ষতা আরোপ করেছেন।

কিবা ইন্দ্রধনু আভা শোভে চূড়া মনোলোভে,
দুলিতেছে মৃদুমন্দ বায়ে,
যুগল অধরে হাসি কত শশী পরু খসি,
কত কত কাম মরুছায়ে।



প্রত্যেক কবিতার শেষে কবি পদাবলী সাহিত্যের রীতি অনুসারে নানা ভাবে ভণিতাযুক্ত করেছেন যেমন—

ক) বীরচন্দ্র দেই ফাগু রহি সখীপাশে।

খ) দাস বীরচন্দ্র কহে ত্রিজগতে কেহ নহে
শ্যামরূপ তিলেকের আধ।

গ) বীরচন্দ্র মূঢ়মতি বর্নিবারে কি শকতি
সে যুগল রূপের মহিমা।

ঘ) বীরচন্দ্র কহুঁ পহুঁ মনলোভা।

কবির সুষ্ঠু উপমা প্রয়োগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। একটি কবিতায় উপমার মাধ্যমে কবি রাধার রূপ বর্ণনায় বলছেন—

কর্ণে কুন্ডল মনি ঝলমল
যেমন সৌদামিনী ঝলকে ঘন।

সহচরী বেষ্টিত রাধার অভিসারে চলাকালীন বর্ণনায়—

চারিদিকে সহচরী চলে রাই ঘেরি,
তারাগণ যায় যেন সুধাকর বেড়ি।

রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ বর্ণনায়—

চন্দ্র বদনী ধনী, কানু চকোর,
নব বারিদে জনু, চাতক ভোর।

ভাব-ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে কাব্যটিতে পদাবালী সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও কবির কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আত্যন্তিক নিষ্টার ফলে কবিতাগুলি হয়েছে সহজ-সরল ও মাধুর্যমন্ডিত। তাছাড়া বর্ণনাভঙ্গিও সাবলীল। অন্তরে বাইরে পরম বৈষ্ণব হওয়ার ফলে কবি ভক্তের দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের রূপাংকন করেছেন।

শ্রী শ্রী ঝুলন গীতি কাব্য

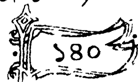
মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর

ত্রিপুরার রাজ পরিবারে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। মহারাজা বীরচন্দ্র অন্তরে-বাহিরে ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তিনি বহু বিচিত্রভাবের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা রচনা করে তাঁর 'হোরি', 'ঝুলন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এই প্রেরণাবশেই তিনি রাজ-অন্তঃপুরে বৈষ্ণব উৎসবের প্রবর্তন করেন। প্রতি বৎসর রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে রাজ-অন্তপুরে সাড়ম্বরে বৈষ্ণব উৎসব উদ্‌যাপিত হতো। এই উৎসবে প্রজাসাধারনেরও অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। মহারাজা বীরচন্দ্র, মহারানী মনোমোহিনী দেবী, পরিজনও কন্যাদের নিয়ে নিজের রচিত ও সুরারোপিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গান করতেন। এই সম্পর্কে ত্রিপুরার লেখক ও সমালোচক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছেন—

> ''আমরা এ পর্যন্ত মহারাজের রচিত ছয়খানা কবিতা পুস্তক পাইয়াছি, তাহার দুইখানা বৈষ্ণব-ধর্মসম্মত গীতাবলী — একখানা 'হোরি' ও অন্য খানা 'ঝুলন'। এই পুস্তিকাদ্বয়ে সন্নিবেশিত সুললিত গানগুলি বৈষ্ণব পর্ব্বোপলক্ষে রাজ-অন্ত পুরে মহিলাগন কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে।'' — (পঞ্চমানিক্য-পৃষ্ঠা- ১১০-১১১)

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন বলেই তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে ভক্ত-বৈষ্ণবজনোচিত অনেক সুললিত গান রচনা করেছেন। বৈষ্ণব ধর্ম তথা পদাবলী সাহিত্যকে তিনি সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রহন করেছিলেন। নিজে গেয়ে তৃপ্ত হতেন না বলে তিনি স্বরচিত গানগুলি সুগায়কদের দিতেন, যা কীর্তনে-মজলিশে সর্বদা গাওয়া হতো। মহারাজা বীরচন্দ্রের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা বলেছেন—

> ''বীরচন্দ্রের দরববারে বৈষ্ণব কবিতা,
> বিশেষ মহাজন পদাবলী সর্বদা মুখরিত হইত।''—
> (দেশীয় রাজ্য-পৃষ্ঠা-১৩৮)



'শ্রী শ্রী ঝুলনগীতি' কাব্য মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক ত্রিপুরাব্দে(১২৭৮ ইং) বিরচিত এবং ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ১৩০২ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯২ইং) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে মোট ৫০টি ঝুলন গীতি সন্নিবেশিত হয়েছে। কাব্যটি কবি-পত্নীর ইচ্ছা অনুসারে যে রচিত হয়, তা কাব্যের 'উপহার' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

ঝুলন মঙ্গল গীত করেছিনু বিরচিত,
তোমার আদেশে প্রিয়ে করিয়ে যতন,

কাব্যটি মহারানী ভানুমতী দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

রাইকানু বিলসন প্রেমলীলা রসায়ন,
তব স্মৃতিময় এই কবিতা আমার,
হৃদি সিক্ত আঁখিনীরে উদ্দেশ্যে তোমার করে,
সঁপিলাম সমাদরে 'গীতি উপহার'।

সূচনাংশে কাব্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবির মনোগত অভিপ্রায়টি ধরা পড়ে। কবি সূচনাংশে বলেছেন—

"...................ইহা আমার প্রথম জীবনের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র এবং শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তিদায়ক বলিয়াই যেভাবে লিখিত হইয়াছিল তাহার কোনও অংশ সংশোধন না করিয়া প্রকাশ করিলাম। উপহার পাঠে 'শোক-সন্তপ্ত হৃদয়' বলিবার কারন উপলব্ধি হইবে।"

কাব্যের উপহার কবি বলছেন—

দেবী। তুমি এ স্বরর্গপুরে
জানিনাকো কত দূরে,

কোন অন্তরালে দেশে
করিতেছ বাস,

....

হেথা আমি আছি পড়ে
হৃদয়ের ভাঙ্গা ঘরে,
গনিতেছি সারাদিন
জীবনের বেলা,

এই হারানোর তীব্র বেদনা ও সেইসঙ্গে মানসিক সান্ত্বনালাভের প্রয়াস ঝুলন গীতি রচনার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করা যায়।

মহারাণীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে এই কাব্যটি রচিত হয়। স্ত্রীবিয়োগ ব্যথা নিয়ে কবি আর বিষয় ও সংসারের মায়াপাশে আবদ্ধ থাকতে চান না। তাই রাধা-শ্যামের কাছে তিনি মুক্তির প্রার্থনা জানাচ্ছেন —

পাঁজরে বিষের জ্বালা হিয়ার অনল হে,
ঝলকি ঝলকি উঠে জ্বলে,
উঠিতে পড়িয়া যাই পায়ে মোর বাঁধা নাথ,
বিষয়ের পাষাণ শিকলে।
কাটি এ করমডোর - বজরের বাঁধ হে,
বীরচন্দ্র দাসে রাখ পায়।

এখন কবির অন্তর্নিহিত কামনা হলো, সংসারের মায়ায় আর আবদ্ধ না থেকে রাধা-শ্যামের যুগল সেবায় আমৃত্যু নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন।

যে কদিন বাঁচি আর   শ্রীবৃন্দাবিপিনে নাথ
থাকি যেন যুগল সেবায়।

ঝুলন গীতিগুলিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। সংস্কৃতের প্রতি কবির অনুরাগ অপরিসীম। নিভৃত নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলা চলছে আর সখীরা তাঁদের ঘিরে নৃত্যগীতের মাধ্যমে আনন্দে মগ্ন। কবি সংস্কৃত ভাষায় এর সূক্ষ্ম বর্ণনা দিচ্ছেন —

নৃত্যতি সব সখী মেলি   গাওত খনে খনে
মধুর মধুর সুতাল বাজায় রে,

লোলাপাঙ্গ সকাম হাস ললিতা নৃত্যন্তি গোপাঙ্গনাঃ।
মধ্যাকম্পতয়া স্খলৎকারিকা বেণী শ্লথং কম্পতে।।
কাঞ্চী স্থূলনিতম্বয়োশচুচুকয়োহরিশ্চ সন্দোলতি।
পাদক্ষেপণ লীলয়ারণ রণং শব্দায়তে নুপূরম্।।   (গীতি - ৩৪ নং)

আর একটি পদে রাধার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন —

দেখরে, যৈছে শ্যাম ঐছে প্রিয় সোহাগিনীরে, দেখ দেখরে,
মৃদুহাস্য সুধাময় চন্দ্রমুখং।
মধুরাধর সুন্দর পদ্মমুখীং।
কি দিয়া তুলিব দোঁহে, তুলনা নাই জগতে, দেখ দেখরে।
(গীতি - ১৭ নং)

এখানে বাংলা, সংস্কৃত ও মৈথিলী অপভ্রংশ ভাষা বা ব্রজবুলি ভাষার ত্রিবেণী সঙ্গমের প্রয়াস লক্ষনীয়। অবশ্য পদাবলী সাহিত্যের পদকর্তাদের পদেও এই রীতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন

ক) ''ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং হাম গচ্ছং মথুরাওয়ে'' — যদুনন্দন (?),
খ) ''দেখ সখি মধুর সুবেশম্''   বীরবাহু (পদামৃতসিন্ধু)
গ) ''ধ্বজব্রজাংকুশপংকজকলিতম্''   গোবিন্দদাস।

কাব্যে কয়েকটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ সংযোজিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় ভাবে ভাবিত কবি সর্বাগ্রে সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে গৌরচন্দ্রের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন।

বিষয় বিষগতানাং ভক্তি পীযুষসিক্তে —
ত্বমসি পূর্নং স্বৈর্গুনৈরাবতীর্ণঃ।
কলিকলুষনিহন্তা ত্বাং বিনা নাস্তি কশ্চি
দধমমকৃত পূন্যং পাহি মাং গৌরচন্দ্র।

প্রশস্তির দিক থেকে এখানে পদাবলী সাহিত্যের রীতিই অনুসৃত হয়েছে।

নদীয়ায় গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবের দৃশ্য যেন কবি মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন, তাই কবির ভক্তিপূর্ণ মনের অভিব্যক্তি —

পুণ্যময় শান্তিপুর, ভকত পর সাধিয়া।
পূণ্যময়, পুণ্যময়, পুণ্যময় নদীয়া।।
গৌরহরি অবতরল, কনক বিধু কাঁতিয়া।
বীরচন্দ্র তছুঁচরণ ভজই দিনরাতিয়া।।

কবিতাটিতে কবি প্রাণের আবেগকে বিশ্লেষিত করেছেন। একটি পদে গৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনা অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে।

দেখরে রঙ্গ, গৌরচন্দ্র ঝোলে অপরূপ ভাতিয়া,
অনুপম রূপ নাহিক স্বরূপ,
প্রভাত অরুণ জিনিয়া।
(গীতি নং - ২)

কাব্যের মৌলভাবটি কাব্যের নামকরনেই সুস্পষ্ট। ঝুলন উৎসবে কবি রাধা-কৃষ্ণের যুগল রূপকে নানাভাবে অনুভব করে কবিতায় চিত্রিত করেছেন। কবি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় বলছেন —

ঐ দেখরে নাগর ঝুলিছে ডালে
চূড়াটি বামেতে হেলে,
নবমেঘে যৈছে ইন্দ্রধনুকের শোভারে। (গীতি নং-২১)

অন্য একটি পদে—

নীলনব জলদ রুচি   রুচি রুচির সুন্দর
পীত বটি কটিতটে সুসাজে।
মুকুট পরি খচিত   শিখী পুচ্ছে নবমল্লিকা
বক্ষে বনমালা বিরাজে ।।

কয়েকটি পদে রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলনের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। যেমন একটি পদে—

সযতনে আগুবাড়ি   প্যারীর হাত ধরি,
আপন উরপর রাখি,
নিজকর পংকজে   পদযুগ মুছই
হেরত অনিমিখ আঁখি।
(গীতি নং -১৪)

একটি কবিতায় কবি রাধা-কৃষ্ণের মিলনকুঞ্জের বর্ণনা নিখুঁতভাবে করেছেন।

নিকুঞ্জ কাননে রতন হিন্দোলা তাহে রতনেতে বাঁধা,
নানা জাতি তরু শোভিয়াছে চারু, নানা ফুলে তাহা ছাঁদা,
শোভে চারিদিকে মনি-মাণিকের আঁটনি গাঁথনি কত,
বেড়িয়া তাহাতে নানাজাতি ফুল শোভিয়াছে নানামত।
(গীতি নং ৪)



ভক্তকবি বীরচন্দ্র ভক্তের দৃষ্টিতে রাধা - কৃষ্ণের যুগল রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই এমন সুন্দর চিত্রগুলি আঁকতে পেরেছেন।

প্রকৃতির রূপ বর্ণনায়ও কবি সিদ্ধহস্ত। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনে প্রকৃতিও যে আত্মহারা হয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে তার বর্ণনায় —

যমুনা বহতছি কলকল নাদে।
নাচত শিখিকুল কতহি সুছাঁদে।
অম্বরে ডমরু চলু নব মেহা।
চমকত দামিনী কাপায়ে দেহা। (গীতি নং - ৪০)

অন্য একটি পদে —

বরিখ চাঁদিনী আধ মলিনিমা
রসবিহারের নিশি আজিরে,
হইয়া কৌতুকী ঠমকি মুচকি
হাসিতেছে যেন বনরাজিরে।
মেঘ সুরসিয়া ঈষৎ বর্ষিয়া
প্রেম বিন্দু বিন্দু যেন ঝরিছে,
ঐছন সময়ে রসবতী লয়ে
রসিক - নাগর ঝুলিছে। (গীতি নং - ২৪)

ঝুলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে কবি প্রকৃতিকে এখানে দাঁড় করিয়েছেন ফলে প্রকৃতিও যেন মাতোয়ারা।

- 'ঝুলন' - এর কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে চিত্রধর্মী বেশ কটি কবিতায় প্রকৃতি চিত্র অত্যন্ত মনোরম।

সঘনে দাদুরী করত কলরব
ময়ূর নাচত রঙ্গমে,

করহি সন্‌সন্‌ বহত সমীরণ
বরিখে ঝরঝর তরল জলধর
গরজে গম্ভীর মাদিয়া।
মন্দ মনসিজ মনহি দহদহ
দহই বিরহীক ছাড়িয়া।
(গীতি নং - ৪১)

শ্রাবণ রাত্রির চিত্র —

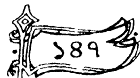
শাঙনী চাঁদিনী রাতি নিরমল উজল, সকল বন,
নানা ফুলরাজি তাহে বিকশিত, গুঞ্জরে ভ্রমরাগণ।
নবতরু ডালে ফুলভরে ভালে, সুগন্ধে পূরল তাই,
নিরখি সে শোভা, মুনি মনোলোভা, মনেতে রহিল রাই।
(গীতি নং - ৪)

উপমা ব্যবহারেও কবির নৈপুণ্য অনস্বীকার্য। সুন্দরও যথাযথ উপমা ব্যবহারে কবিতাগুলি হয়েছে শ্রীমন্ডিত। সুষ্ঠু উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে কবি রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনা করেছেন।

ললাটে সিন্দুর, তম করে দূর, নাসায় বেশর দোলে.
উদয় শিখরে, যেন শশধরে, রবির সহিতে মিলে।
(গীতি নং - ১০)

আর একটি কবিতায় কবি রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের বর্ণনায় উপমার সাহায্য নিয়েছেন —

দুহুঁ রূপে দুহুঁ মন ভোল।
বেড়ল কাঞ্চন নীলরতন কিয়ে,



কুবলয় চম্পকে যোড়ে,
কনক কমলে অলি, মতি রহল যৈছে,
হিম-করে শ্যাম-চকোরে। (গীতি নং - ১৯)

কাব্যের সর্বত্র এইরূপ অজস্র উপমা রয়েছে।

কবির অলঙ্কার প্রয়োগ-নৈপুণ্যকেও অস্বীকার করা যায় না। অনুপ্রাস, লুপ্তোপমা, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগে কবিতাগুলি হয়েছে খুব প্রাণবন্ত।

অনুপ্রাস - ক) বিনোদ হিল্লোলে বিনোদনাগর
বিনোদিনী সহ ঝোলে,
চারিদিকে মিলি বিনোদিনী দল,
নাচয়ে বিনোদ তালে।

এখানে 'বিনোদ' শব্দের বিভিন্ন অর্থে পুনঃপুনঃ ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর।

খ) গজ গঞ্জন - গামিনী ধনী রমনীর শিরোমনি
হেঁটে চলে সুছাঁদে।

লুপ্তোপমা — ক) কবরী মন্ডিত মালতীয় মাল,
নব জলধরে ওড়িত জাল।

খ) ঐ দেখরে নাগর ঝুলিছে ডালে,
চূড়াটি বামেতে হেলে,
নবমেঘে যৈছে ইন্দ্রধনুর শোভারে।

সমাসোক্তি — তিমির ঘুমটা খুলি হেরে চাঁদ মুখ তুলি,
শোভে নিশি তারা - ভূষা পায়।



আবার মাঝে মাঝে সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত পদের ব্যবহারও আছে। যেমন —

নৃত্যতি সব সখীগণ মেলি গাওত খনে খনে
মধুর মধুর সুতাল বাজায়রে।

তাছাড়া প্রতিটি কবিতায় কবি পদাবলীসুলভ ভণিতাযুক্ত পদ ব্যবহার করেছেন।

ক) পরাণ ভরিয়া দাস বীরচন্দ্র
ও রসমাধুরী গায়। (গীতি নং - ২)

খ) সখীর ইঙ্গিতে দাস বীরচন্দ্র
পদসেবা করে সুখে। (গীতি নং - ৪৫)

গ) রসলীলা সার রায়ী অভিসার,
গায় বীরচন্দ্র দাস। (গীতি নং - ১০)

ঝুলনগীতিগুলিতে পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। কাব্যের সূচনাংশে কবিও তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। — "ঝুলন গীতি মহাজন পদাবলীর ছায়া লইয়া লিখিত।" বিশেষ করে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

পদরচনার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাবও গোচরীভূত হয়। যেমন— কবির ৪০ নং কবিতার দুইটি ছত্র—

চৌদিকে দামিনী দহন-বিথার,
হেরইতে উচকই লোচন-তার।

গোবিন্দদাসের 'অভিসার' পর্যায়ের একটি পদে আছে—

দশদিশ দামিনী দহন-বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার।।

আবার কাব্যের ১৯ নং পদে আছে—

বেড়ল কাঞ্চন নীলরতন কিয়ে,
কুবলয় চম্পক যোড়,
কনক কমলে অলি মাতি রইল যৈছে,
হিম করে শ্যাম-চকোরে।

বিদ্যাপতি 'পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ'-এর একটি পদে আছে—

অবনত আনন কত্র হম রহলিহুঁ
বারল লোচনল-চোর।
পিয়া-মুখ-রুচি পিবত্র ধাওল
জানি সে চাঁদ চকোর।।

পদাবলী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কবির প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পত্নী-বিয়োগে শোক-সন্তপ্ত কবি রাধাকৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে সান্ত্বনা পেয়েছেন।'ঝুলন মঙ্গঁলগীত' বিরচন করতে করতে ক্ষণে ক্ষণে পত্নীর স্মৃতি কবিঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছে। তাই রাধাকৃষ্ণের চরণে কবির ব্যথিত মনের অভিযোগ—

রাধাশ্যাম,

বিধাতা ব্যাধেব মত আসি চুপিচুপি হে
সাতনলা বাড়ায়ে বাড়ায়ে,
দারুন-সন্ধান তার শূন্য সব দিক নাথ
এবে একা আঁধারে দাঁড়ায়ে।

এখানে কবির মনোবেদনার সকরুন অভিব্যক্তিই প্রকাশিত।

—ঃ—



"প্রেম মরীচিকা" কাব্য

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর

"প্রেম মরীচিকা" কাব্য কবির প্রথমা পত্নী মহারাণী ভানুমতী দেবীর উদ্দেশ্যে লিখিত। মহারানীর মৃত্যুর পর কবির শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে যে শোকোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়, তারই ফলশ্রুতি হলো এই কাব্য। কাব্যের প্রতিছত্রে প্রিয়া- বিরহের হাহাকারই ধবনিত হয়েছে।

কাব্যটিতে মোট একুশটি ছোট বড় আকারের কবিতা আছে। কাব্য প্রকাশের কাল সঠিকভাবে আমাদের জানার উপায় নেই। তবে মনে হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্ঠাব্দের পূর্বে কোন এক সময়ে রচিত হয়। কেননা, পরবর্তী কালের কাব্য "আকাল কুসুম" প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্ঠাব্দে। কাব্যটিতে কবির বিচিত্র মনোবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। "প্রেম-মরীচিকা" যে প্রিয়তমা পত্নীর উদ্দেশ্যে অর্পিত তা উপহার কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

তোমার সঁপিতে এই, কবিতা কুসুম-হার,

....

কাঁদিয়া গাঁথিনু এই হার,
হৃদে স্থান দিতে একবার, অশ্রুমাখা এই উপহার।

প্রিয়া- বিরহের দুঃসহ জ্বালায় কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন যে সুখ ও আনন্দের মত একদিন তাঁকে এই জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

এই রূপ বর্ষ যাবে সুখ গেছে -হর্ষ যাবে·
গিয়াছে হৃদয়ে,
যাবে হতাশ জীবন। (উপহার)

কবির দৃষ্টিতে প্রেম এখন মরীচিকার মতো—"চিনিনু চিনিনু এবে প্রেম -মরীচিকা।" — অন্যত্র—"প্রেম চপলার খেলা প্রেম-মরীচিকা।" কারন কবি মনে করেন,



সুখের আশায় এই প্রেম-মরীচিকার পেছনে ছুটে আজ তিনি বিভ্রান্ত পথিকের মতো বেদনার ভারে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। তাই কবি মনে প্রশ্ন জাগে, শুধু রূপজ মোহে ভুলেছিলেন বলেই কি তিপি হারানোর ব্যথা পেয়েছেন?

আমার এ ভালবাসা, রূপ-মোহ একি,
ভুলিনু শুধু কি তার রূপ নিরখিয়া, (ছায়া)

কবির ধারনা রূপ দেখে মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন বলেই তিনি এই দুঃখ পেয়েছেন। তবু মন দুঃখে সান্ত্বনা পেতে চায়, জীবন বেঁচে থেকে অর্থ খুঁজতে চায়। কবিও এই ভেবে মনে সান্ত্বনা পেলেন—

সুখের মুখেতে থাকে দুঃখের কালিমা,
দুখের হৃদয়ে জাগে সুখের প্রতিমা। (ছায়া)

কাব্যের প্রথমদিকে কবিমনে নৈরাশ্যের ভাব থাকলেও এখন কবি আশা কারেন, দুঃখের পথ অতিবাহন করে হয়তো আবার সুখের দেখা মিলবে, কিন্তু তবু মন মানেনা। কবি ভালবাসা পেয়েও আজ তা হারিয়েছেন। এই হারানোর বেদনায় মন অত্যন্ত আকুল।

অনেক ভেবে কবি আজ এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, প্রেম চিরস্থায়ী নয়— "চিরস্থায়ী প্রেম বুঝি ইহলোকে নাই।" ফলে মানসিক যন্ত্রনা থেকে অব্যাহতিলাভের আশায় কবি মৃত্যুকে সাদরে আহ্বান করছেন। কারন, মৃত্যু এসে জুড়িয়ে দেবে এবং তিনিও চিরশান্তি লাভ করবেন।

সে সুখের দিন
আসিবেরে কবে,
শোক তাপ সব ধুয়ে, মরণের সুখ
শীতল কোলেতে,
ঘুমাব মাথাটি থুয়ে। (নিরাশের আশা)



প্রিয়া-বিরহে বিনিদ্র রজনী যাপনের পর প্রভাত প্রকৃতির অপরূপ রূপসজ্জা দেখে কবি সাময়িক বেদনা ভুলে বিভোর চিত্তে বলছেন—

আজি বুঝি মোর শুভ পরভাত,
সেই সুখ কেন আইল মনে। (প্রভাতের উপহার)

ফলে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে কবি বলছেন—

বাহির যেমতি, এল ঊষাসতী,
পরিয়ে কিরন-ভূষা,
তেমতি আমার হৃদয় আকাশ
শীতল বিভায় করি পরকাশ
দেখা দিল আসি সুখের ঊষা।

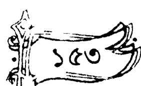
পরিশেষে কবি প্রকৃতিকে অন্তরে উপলব্ধি করে বিশেষ তৃপ্ত হলেন।

'কি দিবে উত্তর' এবং 'প্রেমমোহে' কবিতায় অতীতের সুখস্মৃরিচারণার মধ্য দিয়ে বর্তমানের দুঃখ-বোধ কবিমনে আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। তবু প্রেম যে শাশ্বত তা কবি উপলব্ধি করে বলেছেন—

দুদিনের পদচিহ্ন চিরদিন তরে,
রহিবে অংকিত শত বরষের পরে, (সে দিন ও এদিন)

শূন্য হৃদয়ে কবি আর কোনো সান্ত্বনা পাচ্ছেন না। জীবন-মন-দুইই আজ শূণ্য! শুধু—"আছি ভুলে কি যেন মায়ায়।" মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আছেন বলেই কবিমনে এই আশা জেগেছে যে আবার হয়তো প্রেয়সীকে ফিরে পাবেন।

বুঝেছি-বুঝেছি, আজ বহুদিন পরে,
পাব পুন হারান রতন, (আশা)



কিন্তু পরবর্তী 'স্বপ্ন' কবিতায় দেখা যায় কবির আশা ভঙ্গ হয়েছে।— "ধীরে ধীরে সরে গেল নাহি দিল ধরা।" ফলে আশাভঙ্গে কবির আবার দুঃখের ভারে বিরহের রাত্রি কাটছে বিনিদ্র অবস্থায়।

এবে সকলের বিরাম সুখের,
আরাম ঘুমের ঘোর;
আমিই কেবল রয়েছি জাগিয়া,
নিদারুন দুখে থাকিয়া থাকিয়া,
উঠিছে কাঁদিয়া পরান মোর।

তবু কবির পণ, যারজন্যে হৃদয় আজ শ্মশানে পরিণত সেই হৃদয়-শ্মশানে তিনি সমাধির মন্দির রচনা করে যত দিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন আবার তাকে ফিরে পাওয়ার সাধনা করবেন।

করিলেম পণ তেয়াগি ভবন
এ শ্মশান-বাসী হব,
সেই শতনাম পরানে লিখিয়ে,
বিবেকের রজ মাখিয়ে মাখিয়ে,
সমাধির তলে পড়িয়ে রব।

'প্রেমলোক' কবিতায় কবি প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তির পরিচয় পেয়ে বিশেষ পুলকিত। কারন, মর্ত্যের মানুষ এই পবিত্র প্রেমের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সুখী হয়।

হেথার অমৃত পেয়ে হেথা চিরজীবী জীব
হেথা চিরসুখ শোভাপায়। (প্রেমলোক)

এই কবিতায় কবির বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত। প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি এই প্রেমকে যোগ-সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রেমকে অনেক

উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। ফলে প্রেমকে কবি এখন আর স্বাভাবিকভাবে দেখছেন না।

জানিনু বিবেক এর নাম-যোগের বিদিত;
জানিনু এ প্রেমলোক যোগ পরিনত। (প্রেমলোক)

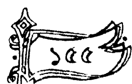
এই প্রেম যে আবার মর্ত্যে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত তা কবি উপলব্ধি করে বলছেন—

এই প্রেমলোক মাঝে আছে বহুবিধ স্থানে,
একে একে দেখাব তোমায়। (প্রেমলোক)

এই পৃথিবীর বুকে ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব প্রেম, ছলনা-বঞ্চনাময় প্রেম, ইন্দ্রিয়-বন্ধনমুক্ত চিন্ময় প্রেম আছে জেনেও — যে প্রেম "কামগন্ধ নাহি তায়" সেই প্রেমকে কবি মানতে চান না। বরং যে প্রেম রূপ-রস-গন্ধে ভরা, যে প্রেমে সুখ-দুঃখ দুইই আছে তাকে তিনি সাদরে বরন করে নিতে আগ্রহী।

চাহিনা মুকতি আমি— চাহি এই ধামে,
অনন্ত নিবাস,
মন যারে চাহে সদা, তারি সহ মনে মনে,
মিশিতে অসীমে অভিলাষ,
চাহিনা সে প্রেম উপাসিতে, যেই নিরাকার
—রূপ উপাসনাময়ী বাসনা আমার।
(প্রেম লোক)

মানসিক ক্লান্তির ভারে অবনত কবি নানা প্রবোধ দিয়ে মনকে শান্ত করতে চান, কিন্তু মন শান্ত হতে চায় না,—"মনরে বুঝাই কত, তবুমন ধৈরয না ধরে।"। বিরহ জর্জরিত মনে আজ অতীতের কত শত বিরহীর কাহিনী এসে ভীড় করে। রামায়ণের রামচন্দ্র যে সীতাকে হারিয়ে বনে কেঁদে কেঁদে ফিরেছিলেন, কবির আজ তা মনে পড়ছে।



ফিরি ফিরি বনে বনে,
কাঁদিল অনুজ সনে,
রাজসুত হারায়ে বনিতা,
সে বিলাপে পরিতাপে বন পরিতাপি,
বিহঙ্গের নাদে যেন কাঁদিল বিলাপি।
(বিনোদন)

প্রিয়া-বিরহে বিরহী যক্ষ যে মেঘকে দূত করে প্রিয়ার কাছে বারতা পাঠিয়েছিল, কবির তাও মনে পড়েছে।

শুনাইল কবি চূড়ামনি—
একাকি শিখরে থাকি,
বিরহী বিনয়ে ডাকি,
অচেতনে সচেতন গনি,
কহে জলধরে নিজদূত রূপে বরি,
যাও প্রিয়তম। মম বারতা আহরি।
(বিনোদন)

মনে পড়ে 'কুমারসম্ভব'কে, যেখানে যোগীবর মহেশ্বর পার্বতীকে পাবার তপস্যা করে তাঁকে লাভ করেছিলেন।

হৃদি মাঝে প্রিয়ারে ধেয়ায়,
তপ সাধনের বলে,
কালে সুধা-ফল ফলে,
হারানিধি প্রিয়া পুনরায়,
কুসুম শরের সহ আসি দেখা দিল,
(বিনোদন)

রামচন্দ্রও একদিন দুঃখ জয় করে সীতাকে পেয়েছিলেন, দীর্ঘ বার বৎসর বিরহ-যন্ত্রনা সহ্য করে বিরহী যক্ষও প্রিয়ার উষ্ণ-সান্নিধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। কবি মনে করেন, বিষয়-বাসনা থেকে মনকে নির্লিপ্ত রেখে প্রেয়সীকে ফিরে পাবার সাধনায় লিপ্ত আছেন সত্ত্বেও তাকে ফিরে পাচ্ছেন না—

আমিও শিখেছি যোগ,
নাহিক বিষয় ভোগ,
আছি সেই রূপের ধেয়ানে,
গেল কতকাল, মম তপ না ফলিল,
সেই নিধি একবার দেখা নাহি দিল।
(বিনোদন)

তাই বেদনার ভারে ক্লান্ত কবি বলছেন—

পাষান মনের ভার
বহিতে পারিনা আর
জীবন পড়েছে ক্লান্ত হয়ে।
(কল্পনা)

প্রেয়সীকে আবার ফিরে পাবেন আশায় বুক বেঁধে এতদিন কবি প্রতীক্ষারত ছিলেন, কিন্তু এখন সেই আশা নিরাশায় পর্যবাসিত। ফলে কবি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পরপারে তাঁরসঙ্গে মিলিত হবার জন্য উন্মুখ এবং কবির বিশ্বাস যে, তিনি মিলিত হতে পারবেন। কারণ, এই ক্ষেত্রে পাথেয় হবে তাঁর প্রেমের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনা, যা তাঁকে লক্ষ্যে উপনীত হতে সর্বাতোভাবে সাহায্য করবে।

আছে মোর প্রেমতারা-প্রেম যোগবল
প্রেমের সাধনা, (ইহলোক-পরলোক)

প্রেয়সী কাছে ছিল বলে এতদিন পৃথিবী কবির কাছে স্বর্গ বলে মনে হয়েছিল। আজ সে আর নেই বলেই কবির কাছে এই পৃথিবী এখন যন্ত্রনাময় রূপে প্রতিভাত।

সে সময়ে নাহি ছিল বাসনা আমার,
স্বরগের তরে,
সে সময়ে পরলোকে, স্বরগ ছিলরে মোর,
চাহি নাহি স্বরগ অপরে,

কবি ভাবছেন, মর্ত্যের প্রেম ছিল ইন্দ্রিয় সর্বস্ব, ফলে প্রেম ছিল এক অর্থে কলুষিত। কিন্তু পরপারে প্রেমিকার সঙ্গে যে মিলন হবে, তাতে কোনো কলুষ না থেকে প্রেম হবে পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও শাশ্বত।

নরলোকে যেই প্রেম ইন্দ্রিয় মিলনে,
ছিল কলুষিত।
বিমল স্বরগধামে পরশি ইন্দ্রিয়মালা,
সে প্রেমে হবে না ত অপবিত। (ইহলোক-পরলোক)

দেখা যায়, কবিতার প্রতি চত্রে নানা রূপে নানাভাবে ব্যক্তিহৃদয়ের হাহাকার প্রতিফলিত হয়েছে। কবিও তা কাব্যে স্বীকার করে পাঠকের উদ্দেশ্যে বলছেন—

"লিপির আকারে মোর চির অশ্রুধার,
কবিতার রূপে মোর চির হাহাকার।"

যদি ব্যক্তিহৃদয়ের গভীর বেদনার উৎসারনই গীতিকাব্যের অন্যতম সুর হয়, তবে এই দৃষ্টি কোণের বিচারে কবি বীরচন্দ্রের "প্রেম বরীচিকা" কাব্যটিকে



নিঃসন্দেহে গীতিকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। কাব্যের সর্বত্র গীতিধার্মিতা লক্ষনীয়। রোমান্টিক কবিচিত্তের ব্যঞ্জনা অভীপ্সা প্রতিটি কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া কবির হৃদয়গত-আত্মগত ভাবনা প্রধান হবার ফলে কাব্যটিতে প্রানের উত্তাপ ও স্পন্দন স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। যাকে ভালবাসি তাকে ভুলে যেতে পারলেই শান্তি, কিন্তু কবি তাকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। ফলে কবিচিত্তের এই জ্বালাময় অভিব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাবে কাব্যের সর্বত্র প্রতিফলিত। কবিমনের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব কাব্যটিকে করেছে ভারাক্রান্ত। কবি যাকে ভালবেসে প্রেম নিবেদন করেছিলেন, তাকে পেয়ে হারানোর বেদনা তোষানলের মতো কবিমনকে নিয়ত দগ্ধ করেছে। প্রেম মানেই "a state of suffering" এই জ্বালার স্পর্স বয়েছে কবিতার প্রতিটি স্তরে। তার কাব্যটিতে কবি-হৃদয়ের কামনা-বাসনা পরিপূর্নভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

কবির উপর সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্মীয় সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে কাব্যের 'বিনোদন' কবিতাটি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। এখানে তিনি অতীত-কাহিনী পর্যালোচনার মাধ্যমে ঘটনাগত দিক থেকে রামায়ণ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত কাব্যের নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। তাছাড়া 'হায়া' কবিতায়—

''সুখের মুখেতে থাকে দুখের কালিমা,
দুখের হৃদয়ে জাগে সুখের প্রতিমা।''

এই পদটি চন্ডীদাসের—

''সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।''

এই পদটি যেন স্মরণ করিয়ে দেয়।

মহারাজা বীরচন্দ্রের উপর বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব যে অপরিসীম তা পূর্ববর্তী দুইটি গীতিকাব্যে (হোরি ও ঝুলন) দেখেছি। তাঁর রচিত 'অকাল কুসুম'



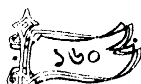
কাব্যেও (যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোকিত হবে) দেখা যায় সূচনাতে তিনি চন্ডীদাসের একটি জনপ্রিয় পদ (যে জন না জানে পিরীতি মরম, সে জন পিরীতি করে) উদ্ধৃত করে কাব্য লেখা শুরু করেছেন। তাছাড়া মহাজন পদাবলীর ছায়ায় রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক বাহু গান তিনি রচনা করেছেন, যা সঙ্গীত পর্যায়ে আলোচিত হবে। অতএব কবির জীবনে ও কাব্যে পদাবলীর প্রভাব নিঃসন্দেহে সুদূর প্রসারী।

পদাবলীকে স্মরণ রেখেই বলা যায়, মহারাজা বীরচন্দ্র হলেন প্রেম বৈচিত্ত্যের কবি। মরমী কবি তাঁর প্রেম সংক্রান্ত মনোভাবটি কাব্যে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সংযত হৃদয়ে ব্যক্ত করেছেন। উচ্ছ্বাস-প্রবনতা অপেক্ষা ভাবের গাঢ়তাই প্রতিটি কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। কবি-কল্পনা কাব্যে ব্যাপক না হলে ও ব্যক্তিগত পিপাসায় রক্তিম ও রঙ্গীন।

কবির মনোজগতে প্রকৃতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। 'প্রভাতের উপহার' কবিতায় দেখা যায়, বিনিদ্র রজনীর শেষে প্রভাত কবির চোখে অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

দেখিতে দেখিতে আবার মহীতে,
চৌদিকে রতন-ভাস,
শিশির রতন, গড়ায়ে গড়ায়ে,
ঘাসের উপর পড়িছে ছড়ায়ে,
কমল-রতনে উজল হাস।

শোভিল অটবি—শোভিল মাধবী,
কুসুম ভূষন পরা,
উঠিল মালতী ছাড়িয়ে শয়ন,
কুয়াশার জলে পাখালি নয়ন,
অলি যেন তায় কাজল ভরা।



আবার কোথাও কবিমন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন।

বাহিরে যেমতি এল উষা সতী
পরিয়ে কিরণ ভূষা,
তেমনি আমার হৃদয়-আকাশ,
শীতল বিভায় করি পরকাশ,
দেখা দিল আসি সুখের উষা।
(প্রভাতের উপহার)

'বর্ষা কবিতায় বর্ষা কবির চোখে নূতন রূপে প্রতিভাত। বর্ষা এখানে কুহাকিনী রূপে কবির কাছে এসে ধরা দিয়েছে।

বরষার কি কুহক রাজি।
নানাকারে মেঘতনু নানারঙ্গে রামধনু,
মম স্মৃতি মায়া দরপন,
আনিয়ে আবার,
দেখাই কতই ছবি তাহে বার বার।

এখানে বর্ষা প্রকৃতির একটি নিখুঁত চিত্রকল্প কবি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এঁকেছেন। প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও প্রেম এই ত্রয়ী কবির কাব্যকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

উনবিংশ শতকের বাংলা কাব্য-সাহিত্যে গীতিকাব্য হলো একটি বিশেষ ধারা। এই ধারা বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমনার, অক্ষয় কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কবিবৃন্দের মাধ্যমে পরিপুষ্টি লাভ করে। গীতি কাব্যের একটি বিশেষ উপাদান হলো নারীপ্রেম। উপরি-উক্ত কবিদের কাব্যে নারীর বহু বিচিত্র রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। নারীকে তাঁরা কখনও প্রেয়সী, কখনও শ্রেয়সী আবার কখনও দেবী রূপে কল্পনা করেছেন।



ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র ও তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গমোহনী দেবী হলেন এই ধারার অনুসারী কবি। যথাক্রমে পত্নী ও স্বামীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তাঁদের কাব্যে ব্যক্তি প্রেমের সঙ্গে হৃদয়ের হাহাকার ও অতৃপ্তি প্রতিফলিত হয়েছে।

অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁর 'প্রদীপ' কাব্যে এবং মহারাজা বীরচন্দ্র তাঁর 'প্রেম-মরিচিকা' কাব্যে নারী প্রেমকে উপজীব্য বিষয় করে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। তবে বড়াল কবির নারীপ্রেম এখানে মর্ত্য-পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। 'প্রদীপ' কাব্যের প্রথমেই নারী সম্পর্কে কবির এক উর্ধায়িত পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়।

একবার নারী তব প্রেম মুখ হেরি,
আরবার প্রকৃতির শ্যামবুক 'হেরি, (কবিত্ব, পৃষ্ঠা-৫)

অন্যত্র আবার বলছেন—

বিধাতার মহাকাব্য তুমি
. ...
দেবতাবা স্বর্গ হতে নামে
লভিতে তোমার ভালবাসা।
('নারীবন্দনা'-পৃষ্ঠা-৯)

এই প্রেম স্পর্শাতীত এবং বাস্তব-বহির্ভূত কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু তুলনায় কবি বীরচন্দ্রের প্রেম ইন্দ্রিয়র্বস্ব এবং মর্ত্য-পৃথিবীর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বরং বড়াল কবির 'এষা' কাব্যটির সঙ্গেই 'প্রেম-মরীচিকা' কাব্যের বেশী মিল রয়েছে। 'এষা' কাব্যটি কবির পত্নী বিয়োগকে উপলক্ষ করে রচিত হয়। এটি একটি শোককাব্য। এই কাব্যে এসে কবি পরিপূর্নভাবে কল্পনাবিলাস ছেড়ে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত হয়েছেন। তখন পত্নীবিয়োগ ব্যথায় আচ্ছন্ন কবির আর্তধ্বনি—

মরণে কি মরে প্রেম? অনলে কি পুড়ে প্রান?

অন্যত্র—

কি ছিলে আমার তুমি,— প্রেয়সী না ক্রীতদাসী?
দুটি হাতে সেবাভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি।
('এষা' — মৃত্যু কবিতা, সাহিত্য সাধক চরিতমালা—
৫ম খন্ড পৃষ্ঠা-৪৬)

কবির জীবনে তিনি এত বেশী মূর্ত ছিলেন, যারফলে, তিনি নেই-একথা বিশ্বাস করতে কবির মন চায় না।

ত্যজিয়াছ মর্তভূমি
তবু আছ -- আছ তুমি
তুমি নাই কোথা নাই হয় না বিশ্বাস।
('এষা' —সান্ত্বনা কবিতা—সাহিত্য সাধক চরিমালা—
৫ম খন্ড— পৃষ্ঠা-৫৩)

এই পত্নীবিয়োগ কবির কল্পনাবিহারী মনকে তীব্রভাবে আঘাত করে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করেছে বলেই 'এষা'য় কবির শোক অনেক শান্ত ও সংযত। উভয় কবিই তাঁদের হারানোর বেদনাকে কাব্যের প্রতিছত্রে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন

---ঃ—

"উচ্ছ্বাস" কাব্য

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর

মহারাজা বীরচন্দ্রের ছয়টি কাব্যের মধ্যে চতুর্থ কাব্যের নাম 'উচ্ছ্বাস'। এই কাব্যটির সন্ধান আজ আব পাওয়া যায় না। অবশ্য নানাকারণে ত্রিপুরা রাজ আমলে সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম বর্তমানে বিশেষ দুষ্প্রাপ্য, তবু এই কাব্য সম্পর্কে যতটুকু তথ্যের সন্ধান মেলে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি আলোচনা করা গেল।

মহারাজা বীরচন্দ্রের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ "অকালকুসুম" ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। "উচ্ছ্বাস" ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোনোসময়ে প্রকাশিত হয়েছে বলে অনুমেয়।

পত্নী বিয়োগে বিদীর্ণ হৃদয়ের যে হাহাকার কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "প্রেম মরীচিকা"য় বিধৃত, এই কাব্যে সেই হাহাকার তত তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়নি, কারণ, মহারাজার শোক-সন্তপ্ত হৃদয় ইতিমধ্যে দ্বিতীয়া মহিষী মনোমোহিনী দেবীব সংস্পর্শে এসে সান্ত্বনালাভ করেছিল, আবার নূতন করে জীবনের অর্থ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। উচ্ছ্বাস সেই নূতন জীবনের স্ফুর্তিব স্বাক্ষর বহন করছে। অবশ্য গ্রন্থের নামকরণেও এই ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়।

গ্রন্থটির আখ্যানপত্রে বিদ্যাপতির "আজি মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ" পদটি উদ্ধৃত হয়েছে। দীর্ঘদিন পর কবির অতৃপ্ত শূণ্য মন নূতন মহিষী মনোমোহিনী দেবীর সংস্পর্শে এসে কিছুটা প্রশান্তিলাভ করেছিল।

কাব্যটি প্রেমের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। এই উচ্ছ্বাস নবাগতা মহিষীর উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়েছে। কাব্যটি অনুধাবন করলে বোঝা যায়, সেইসময় কবিমনে বর্তমান সুখ ও বিগত দুঃখের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, ফলে এক বিচিত্র অনুভূতি কবিমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই কবি নূতন মহিষীকে বলছেন —

উঠিছে পড়িছে আজি কত
দুঃখের সুখের কথা   হৃদয় নিভৃতে মোর
আধ আধ আবছায়া মত।
আধ দুখে আধ সুখ ছিল আবরিয়া,
কি যেন মেঘের কোলে জোছনা রাখিয়া।

উপরি-উক্ত পদটি অনুধাবন করলে এই সত্য উপলব্ধি হয় যে, নূতন মহিষীর আগমনে ও পরিচর্যায় কবি হৃদয়ের ক্ষত কিছুটা প্রলেপযুক্ত হলেও যৌবনের প্রথম প্রেম তখনও মনে জাগরূক আছে ও ক্ষণে ক্ষণে তীব্র জ্বালার সঞ্চার করছে। তাই কবি বলছেন —

সুখে দুখ গিয়াছে ডুবিয়া,
দুঃখের হৃদয়ে আজি,   নেশার আধেক ঘোরে
রহিয়াছে কি সুখ ছাইয়া।
নয়নে ভাসিছে গত সুখের স্বপন,
পাইয়া তোমার সেই সুখ সম্মিলন।

নূতন মহিষীর সাহচর্যে উজ্জীবিত প্রেম কবিমনে আর ততটা উৎসাহের সঞ্চার করে না, কেননা, এই প্রেম প্রতি মুহূর্তে প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে মন বেদনার্ত হয় — নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আর কবি পান না। মিলনের মধ্যেও তখন জেগে উঠে বিচ্ছেদের বেদনা।

সমগ্র কাব্যটি এই ধরণের ভাবব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। মহারাজা বীরচন্দ্র যে কত বড় ভাবুক কবি ছিলেন, তা তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি অনুধাবন করলে সহজে প্রতীয়মান হয়।

— ః —

"অকাল কুসুম" কাব্য

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর

মহারাজা বীরচন্দ্র যে বাংলা ভাষার একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, তাঁর ছয়টি কাব্যগ্রন্থ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি যশের প্রত্যাশী ছিলেন না এবং আত্মপ্রচারে বিমুখ ছিলেন। তাই তিনি জনসমক্ষে কাব্য প্রচারে উৎসাহ বোধ করেননি। নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁর নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রে কাব্যগুলি মুদ্রিত হয় এবং তা শুধু অন্তরঙ্গ ও অনুগৃহীত ব্যক্তিরাই উপহারস্বরূপ পেয়েছিল। সঙ্গীত, চিত্রকলার মতো সাহিত্যকেও তিনি নিভৃত সাধনার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সযত্নে সঙ্গোপণে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। বীরচন্দ্র বিরচিত সঙ্গীত ও কাব্যগ্রন্থগুলি আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে এবং যথেষ্ট দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

১২৯৬ ত্রিপুরাব্দে (১৮৮৬ইং) আগরতলার বীরযন্ত্রে শ্রী ঈশান চন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বারা মহারাজা বীরচন্দ্রের 'অকাল কুসুম' কাব্যটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই কাব্যেও কবি চণ্ডীদাসের একটি পদের অংশবিশেষ আখ্যানপত্রে উদ্ধৃত রয়েছে —

"যেজন না জানে পিরীতি মরম
সে কেন পিরীতি করে,
আপনি না বুঝে পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে।"

কবির রচনায় পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম, তাঁর সঙ্গীতকাব্য দুইটিতে আমরা বৈষ্ণব কবিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করেছি। তাঁর অন্তর যে প্রেম-প্রীতি ও স্মৃতির দ্বারা পূর্ণ আচ্ছাদিত, তার আভাস এখানে পাওয়া যায়।

কাব্যের ভূমিকা অংশে বীরচন্দ্র এ কাব্যে রচয়িতা হিসাবে ললিত মোহন দেববর্মা নামটি ব্যবহার করেছেন। এটি মহারাজার ঘরোয়া ও ছদ্মনাম।



কাব্যটি মোট ছয়টি স্তবক ও একটি শেষোক্তিতে বিভক্ত। মনে হয়, পর্যায়কে কবি এখানে স্তবক বলেছেন। 'অকাল কুসুম' কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের তুলনায় একটু অন্যধরণের। কবি এখানে নায়ক - নায়িকার ভাবকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন —

প্রথম স্তবক, (নায়িকার চিন্তা ও আক্ষেপ)
দ্বিতীয় স্তবক, (নায়িকার ভাববিকাশ ও আক্ষেপ)
তৃতীয় স্তবক, (নায়কের ভাববিকাশ)
চতুর্থ স্তবক, (নায়িকার পূর্বস্মৃতি)
পঞ্চম স্তবক, (নায়কের স্বপ্নের স্মৃতি)
ষষ্ঠ স্তবক, (নায়িকার কলঙ্কের স্মৃতি ও নিবেদন)

তাছাড়া প্রতিটি পর্যায়ের স্তবকগুলির উপরে ১,২,৩,৪ ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এতে মনে হয়, প্রতিটি স্তবক বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবের দ্বারা গঠিত। কিন্তু নিবিড় পাঠে বলা যায় যে, এইগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতার সমাহার নয়, এইগুলিকে দীর্ঘ একটি কবিতার স্তবক বলে ধরা যায়। কারণ, কাব্যটিতে একটি কেন্দ্রীয় ভাব অন্তঃসলিলার মত প্রবাহিত হয়েছে। ফলে এই স্তবকগুলিকে একটি দীর্ঘকবিতার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

কাব্যটি কবির দ্বিতীয়া মহিষী মহারাণী মনোমোহিনী দেবীর উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়েছে।

"পিরীতি কুসুম" — সন ১২৯৬ ত্রিপুরা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী মনোমোহিনী দেবীর কোমল করকমলে উপহার।

প্রেয়সিরে --
গেঁথেছি তোমার লাগি বিজনে বসিয়া আমি,



যে সাধের মালা,
উজল মাণিক নহে - নহে যুঁই বেলি,
রূপে গন্ধে নাহি করে আলা।

কাব্যটি মহারাণীর মনোমত হবে কিনা ভেবে উৎসর্গ করতে গিয়েও কবি সংকোচ বোধ করছেন।

ভালমন্দ নাহি জানি, গাঁথিয়া পেয়েছি সুখ,
রূপে গুনে তোমারি মতন,
তাই এত করেছি যতন,

জীবনের প্রীতিকর ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য কবি যে পত্নীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন, কাব্যের উপহার অংশের দ্বিতীয় স্তবকে তার আভাস মেলে--

কতদিন বলেছিলে জীবন-ঘটনাগুলি,
রাখিতে গাঁথিয়া,
প্রনয়ের সুখ দুখ, মিলন-বিরহ,
কেমনে যে দহিল ও হিয়া,

এখানে কাব্যটির উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রেয়সীর মনোবাসনা পূর্ণকরার জন্য কবি কাব্য রচনার সার্থকতা খুজে পেয়েছেন। ফলে কবি নিজেকে আজ ভালবাসার অর্ঘ্যস্বরূপ উপহার দিতে কৃতসংকল্প।

ভাল যদি বাস প্রিয়ে, কি দিবলো আর তোরে
কি আছে এমন,
কবির হৃদয় আজি দিব উপহার,
—ভাবে ভরা কুসুম কানন,



এখানে কবি বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে নিজের দীনতা স্বীকার করে প্রেয়সীকে কাব্য কুসুম উপহার স্বরূপ প্রদান করে শান্তি পেয়েছেন।

কাব্যটিতে নায়ক-নায়িকার বিচিত্র মানসিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং কবিতাগুলি গভীর প্রেমের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। কাব্যের প্রথমে নায়িকার প্রেম-সম্পর্কিত নানা চিন্তা ও আক্ষেপ কবি বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন।

প্রিয় বিরহের জ্বালায় নায়িকা আকুল হয়ে ভাবছেন যে, চিরকাল কি এই বিরহ জ্বালায় জ্বলতে হবে।

মরমে লাগিছে সদা বিরহ বেদনা,
কত যে সহিবে আর অবলা-পরানে,
চিরকাল এই মত,
দহিবে কি অবিরত,
অনন্ত-আগুন-শিখা বুঝি নিবিবে না—
ফুরাবে না বিরহ-বেদনা।

এতদিন আশা ছিল যে, প্রেমিককে পেয়ে জীবন সার্থক হবে--

হইব তাহার আমি, সে হবে আমার,
আশা ছিল একদিন মিলিব দুজনে,

কিন্তু আশা আজ নিরাশায় পর্যাবসিত হওয়ায় নায়িকা এই হতাশময় জীবনের কোন মূল্য খুঁজে পা পেয়ে মৃত্যুর জন্য কৃতসংকল্প হয়ে পড়েন—

কি দিয়া বাঁধিব এই হতাশ জীবন,
....
জন্ম-শোধ এ পরান দিব বিসর্জন,
যায়, যাক্ হতাশ জীবন।

কিন্তু নায়কতো জানে না যে সে কি দুঃসহ ব্যথা নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাই চলে যাবার আগে নায়ক যাতে তার মনের নিগূঢ় ব্যথাকে উপলব্ধি করে অন্ততঃ সমব্যথী হয়, সেই আশায় নায়িকা কিছু স্বীকারোক্তি যেতে চান। বলছেন-

লিখে দেই তব গায় দুইটি চরণ,
এসো তবে শশধর, নামিয়া ভূতলে,
হেরিলে তোমার পানে,
পড়িবে তোমার মনে,
কে লিখিল, কে কাঁদিল কাহার কারণ,
দেখে তার ঝরিবে নয়ন।

চিত্রপটকে ডেকে বলছেন—

এসো চিত্রপট লিখি তোমার হৃদয়ে,
হেরিবে যখন তোরে,
হয়তো সে জানিবে রে,
মরম- লুকানো ব্যথা-বুঝিবে সেজন,
ও ছবি দেখিবে যখন।

পরমুহূর্তেই ভাবান্তর হয়। নায়ককে ভালবেসে সুতীব্র জ্বালা নিয়েও না[illegible] বাঁচতে চান।

দুখ পাই- পাব দুখ তথাপি ভাবিব,
....
চিরদিন-চিরকাল, সদাই দহিব,
তারই দুখে নয়ন মুদিব।

তিলে তিলে যে প্রেম মুকুলিত হয়েছে, তা বুঝি আজ ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই সার্থকতার পথ খুঁজে না পেয়ে নায়িকার আক্ষেপ—

আদর করিয়া কত মরম ভিতর,
রোপেছিনু প্রনয়ের লতা,
দারুন নিদাঘ লাগি অকালে শুকালো,
না খুলিতে যেন দুটি পাতা।

আশার আলো যখন একেবারে নিভে গেছে তখন আর এই জীবন রেখে কি লাভ। অত এব —

যায় যাক্, ক্ষতি নাই , জীবন আমার,
চাহিনা রাখিতে এই প্রাণ,
হাসি কান্না ভুলে যাই, ভুলি এ জগত,
হয় হ'ক, হৃদয় পাষাণ।

তবু জীবন-মন আর একবার পরিপূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে নায়িকা শেষ চেষ্টা করতে চান, যদি তাকে পাওয়া যায় সেই ভাবনায় বলছেন—

যা বলিবে তাহাই করিব,
মন দিব, প্রান দিব, সাধের যৌবন,
ও চরনতলে বিকাইব।

এই পৃথিবী থেকে চলে যাবার আগে নায়িকা শুধু এইটুকু জেনে যেতে চান, নায়ক তাকে মনে রাখবেন কিনা।

পাব কিহে প্রাননাথ স্থান একটুকু,
ও সরল হৃদয় মাঝারে।

তবু শেষ মিনতি যেন দয়িত তাকে স্মরণে রাখে---
নাহি কোন সাধ আর— অভাগীরে শুধু,
মাঝে মাঝে করিও স্মরণ।

নায়িকার স্থির বিশ্বাস যে তার প্রেম পবিত্র। এই পবিত্র প্রেমের মর্যাদা আজ না পেলে ও একদিন হয়তো পাওয়া যাবে।

থাকে যদি-থাকে নাথ, প্রেম-পুরস্কার,
একদিন পাইব তোমায়।

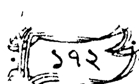
তাই জীবন-দীপ নিভবার আগে নায়িকার শেষ মিনতি—

ধর মোরে, এসো কাছে, ক্ষণমাত্র আর,
এই দেহে রহিবে জীবন,

কাব্যের তৃতীয় স্তবকে নায়কের অব্যক্ত-প্রেম নায়িকাকে উপলক্ষ করে নানা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। নায়ক ভাবছেন, কৈশোরের মন দেওয়া- নেওয়া যৌবনে এসে প্রগাঢ় হয়েছে যদিও, কিন্তু তা মিলনের পথ খুঁজে পাবে কি? নায়কের ধারণা কৈশোরের প্রেম অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী হয় না। ফলে নায়কের মনে এক বিরাট সংশয়ের জ্বালা।

সদাই দহিবে বুক, সদাই ঝরিবে আঁখি,
নিরাশায় ফাটিবে হৃদয়,
যে রূপের স্মৃতি লয়ে চিরদিন হবে গত,
বুঝেছিনু নিরাশ-প্রনয়।

সুতীব্র মনোবেদনা থেকে উত্তরণের জন্য নায়ক অধ্যয়নে রত থেকেও ব্যর্থ হয়েছেন —



পাসরিব ভাবি বলে, হায়রে কখন যদি,
করিতাম গ্রন্থ অধ্যয়ন,
যেখানে প্রেমের তৃষা, সেথায় পেয়েছি ব্যথা,
সেইখানে ঝরেছে নয়ন।

কিন্তু যখন নায়িকার কৈশোরের শিশুর মতো হৃদয় ও তার সুধামাখা হাসিটি মনে পড়ে, তখন বেদনার মধ্যে নায়কের মনে তা প্রশান্তি এনে দেয়।

আজো আছে হাসিটুকু বিষাদ রহিয়া গেছে,
নাহি সেই কিশোর সময়,
কথায় কথায় হাসি, বালিকা যখন ছিলে,
শাদা শাদা শিশুর হৃদয়।

ফলে কিশোরী নায়িকাকে ভোলা যায় না—

কেমনে ভুলিব তোরে কোমল কিশোরী বেলা,
প্রথমে মরমে এসেছিলে,
স্নেহ-ভরা সুধামাখা ও সাধের আঁখি কোণে,
পালটি বারেক চেয়েছিলে।

তাই যে প্রেম এতদিন স্নেহ আবরিত ছিল, সেই স্নেহ-আবরণ-সরিয়ে দিয়ে আজ মিলনোন্মুখ নায়কের হৃদয় নায়িকাকে আহ্বান জানায়—

এতদিনে বুঝিলাম, স্নেহে ঢাকা ছিল প্রেম,
খুলে গেল স্নেহ আবরণ,
এসো প্রিয়ে আর কেন, সহিতে পারিনা আর,
গত কথা হও বিস্মরণ।

নায়িকাও নায়কের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। মিলনের সুখ-স্বপ্নে বিভোর নায়িকার উক্তি—

স্বপন কি জাগরণ—বুঝিতে পারি না,
এই মরমের তলে,
কি সুধা ঢালিয়া দিলে,
মুদিয়া আসিছে আঁখি নিমেষে নিমেষে,
যেন কত ঘুমের আবেশে।

কৈশোরের সুখস্মৃতিকে আজ মিলনের মুহূর্তে নায়িকা ধরে রাখতে চান। তাই নায়ককে বলেন—

শিশুবেলা যেই নামে ডাকিতে আমারে,
ওই আদরের নামে ডেকো সখা তুমি,

মিলনের মধ্যে নায়িকা দুঃখময় অতীত জীবনকে ভুলতে পারেননি।

দুখে দুখে গেছে মোর সারাটী জীবন,
....
মুছাইতে আঁখিজলে কে ছিল এমন,
দুখে দুখে যাইত জীবন।

তবু এই দুঃখের মধ্যেও একমাত্র সান্ত্বনা ছিল তার প্রেম, যা হৃদয়ের নিভৃত কোণে সযত্নে সংগুপ্ত ছিল।

তব নাম -তব কাম,
শুনিলে জুড়াত ব্যথা,
জানিত না এ পরান-তুমি বিনে আর,
সেই হতে হইনু তোমার।

কিন্তু মন বড় বিচিত্র। তাই মিলনের মধ্যেও বেদনার সুর স্পষ্ট হয়ে বেজে ওঠে। নায়িকাও আজ মিলনের মধ্যে অতৃপ্তির সুর শুনতে পাচ্ছেন। যৌবনের ভালবাসার মধ্যে কোথায় যেন একটু জ্বালা নিহিত আছে। অথচ কৈশোরের ভালবাসায় যেন তা ছিল না। ফলে তুল্যমূল্য বিচারে নায়িকার কাছে আজ যৌবন অপেক্ষা কৈশোরের ভালবাসাই সত্য বলে মনে হয়।

তথাপি কেনরে এই যৌবনের সনে,
কৈশোরের ভালবাসা না হয় তুলন,
কি-সে ব্যথা জনমিল,
কি-সে প্রান ভরে গেল,
প্রবেশিল কি অনল কহিব কেমনে,
এই পোড়া যৌবনের সনে।

তাই মিলনেও বিচ্ছেদের সুর ধ্বনিত হয়।

আগে যদি জানিতাম প্রনয় এমন,
আছে তায় শত বাধা সুখের মিলনে,
হৃদয়ে বিরহ পশি,
পোড়াইবে দিবা নিশি,
চাহিতাম তবে কি রে তোমারে কখন,
যদি সদা দহিবে জীবন।

তবু বিবাহ বন্ধনকে তো ছিন্ন করা যায় না। সুখে দুঃখে জীবন অতিবাহিত হবে, এই সান্ত্বনা নিয়ে সকল দ্বিধা দ্বন্দ্বকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নায়িকা নায়ককে সাদর আহ্বান জানায়—

'দূরে গেল যত দুখ এতদিন পরে,
এসো নাথ, বুকে করি বারেক আবার,

স্বরগ আসিয়া আজি মরতে বিচরে,
ডুবে যাই অমিয়া-সাগরে।

পঞ্চম স্তবকে দেখা যায়, নায়ক নায়িকার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, যা হৃদয়ের গভীরে ছিল, যা বলি বলি করেও এতদিন বলা হয়নি, তা আজ নায়ক বলতে আগ্রহী।

মরমের সুখ দুখ, পিরীতির আশা-তৃষা
রাখিনু যা হৃদয়ে লুকায়ে,
স্বপনে খেলিনু যত খেলা,
তোমারে লইয়া,
কহিব সকল আজি পরান খুলিয়া।

কিন্তু স্বপ্নের নায়িকা এখনও নায়কের মনে চিরজাগ্রত।

দেখিতাম যে মুরতি তব,
সে সুখ স্বপনে,
আজিও খেলিছে মোর মনের নয়নে।

স্বপ্নে নায়িকার সঙ্গে যে মিলন সংঘটিত হয়েছিল, বাস্তব মিলন অপেক্ষাও সেই মিলনের সুখস্মৃতিতে নায়কের অন্তর ভরপুর।

জীবনের সেই একদিন,
সুখের স্বপন,
আহা কি মধুর সেই স্বপনের মিলন।

নায়কের স্বপ্ন-উপলব্ধ মান- অভিমানের মুহূর্তগুলি ছিল ভালবাসায়, সোহাগে ও আনন্দে ভরপুর। বাস্তবে সেই স্বপ্নের মূহূর্তগুলি আর ফিরে পাচ্ছেন না বলে অন্তর হতাশায় ও বেদনায় ভরে উঠেছে। তাই নায়ক ভাবছেন — জাগরণে ফিরে এসে যদি দুঃখকে বরন করতে হয়, তবে এই সুখস্বপ্নের কি প্রয়োজন ছিল, তার চেয়ে নিরাশাই ভাল।

স্বপনে বাড়ায়ে প্রেম, জাগিয়া কাঁদিতে হবে,
যদি রে এমন,
নাহি চাহিতাম প্রিয়ে, নীরব নিশীথকালে,
সুখময় প্রেমের স্বপন,
নিরাশাতো ছিল ভাল মোর,
আঁধারে ডুবিয়া,
থাকিতাম চিরকাল সে আশা ভুলিয়া।

এই ভাবে দীর্ঘদিন কল্পনার জগতে বিচরণ করে পরিশেষে নায়ক বাস্তবের কঠিন মন্ডলে নেমে এসেছেন। কল্পনার জগৎ যেহেতু বাস্তব জগতের সঙ্গে মেলে না, তাই তিনি আর কল্পনার জগতে বিচরণ করতে রাজী নন। ফলে বাস্তব মিলনোন্মুখ হৃদয় নায়িকাকে স্বাগত জানায়—

গিয়াছে সেদিন প্রিয়ে, আর দহিবে না হিয়ে,
কল্পনা লইয়া
স্বপনে পাইয়া তোরে, যেমনি বাড়ানু প্রেম,
এসো আজ দুজনে মিলিয়া,
সাধের যৌবন ফুল বনে,
বিহার করিব,

ষষ্ঠ স্তবকে দেখা যায়, নায়িকাও মনের অবরুদ্ধ আবেগ প্রকাশ করতে উন্মুখ—

কুলমান রাখিতে নারিনু,
কি জানি অন্তরে মোর কি যে ব্যথা জনমিল,
প্রেমের সায়রতলে ডুবিয়া পড়িনু,

আজ নায়িকার মনে অভিমান জেগেছে এই জন্য যে, ভালবাসার কারণে তাকে লোকের অপবাদ সইতে হয়েছে জেনেও নায়ক নিস্পৃহ ছিল।

.... কার তরে কলংকিণী এ পোড়া জগত মাঝে,
কার তরে মরিলাম জ্বলিয়া পুড়িয়া,
যে দুখ পাইনু আমি,
শুনে না শুনিলে তুমি,

তবু নায়ককে পাওয়ার জন্য শত অপবাদ মাথায় নিয়ে কলংকিণী হতেও নায়িকা কুন্ঠিতা ছিলেন না।

কলংকে হৃদয় ভাসায়েছি,
কি হইবে অপবাদে কি করিবে লোকে আর,
তোমারি চরনতলে আপনা সঁপেছি,
তোমারে ভাবিয়া আমি,

পরিশেষে সকল মান-অভিমানের পাশা শেষ হয়। বিরহের দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে, বহু প্রতীক্ষার পর আজ দুইটি হৃদয় এক হয়ে মিশে গেছে। পরিতৃপ্ত নায়িকার উক্তি—

মন সাধ সকলি মিটিল,
লোক অপবাদে মোর উঠুক জগত ভরি,
তোমার সোহাগে বঁধু হৃদয় পূরিল।



কবি নায়ক-নায়িকার মাধ্যমে তাদের হৃদয়ের কামনা-বাসনার দুরন্ত আবেগকে এই কাব্যের প্রতিছত্রে প্রতিফলিত করেছেন। ব্যক্তিমনের নিগূঢ় উচ্ছ্বাস এই কাব্যে ধ্বনিত। ফলে কাব্যটিকে গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত করা যায়। গীতিকবিতায় উচ্ছ্বাসের মাত্রাকে উপেক্ষা করা চলে না।

ব্যক্তিমনের উচ্ছ্বাসকে ঘিরে এক অখন্ড ভাবপ্রবাহ কাব্যের সর্বত্র পরিলক্ষিত। কখনও নায়কের আবার কখনও নায়িকার মনোভাবের বিচিত্র অভিব্যক্তি পূর্বাপর সম্বন্ধ রেখে স্তবকগুলি রচিত হয়েছে। ফলে প্রতিটি স্তবক সমসূত্রে গ্রথিত। কাব্যটিতে ভাষার কোনো কারুকার্য নেই। সহজ ভাষায়, সংযতভাবে ও আন্তরিকতায় নিবিড় করে কবি নায়ক-নায়িকার মনের বিচিত্র ভাবকে তুলে ধরেছেন।

—ঃ—

"সোহাগ" কাব্য

মহারাজা বীরচন্দ্রর মাণিক্য বাহাদুর

মহারাজা বীরচন্দ্রের "সোহাগ" কাব্যটি ১২৯৩ ত্রিপুরাব্দে (১৮৮৩ইং) আগরতলার বীরযন্ত্রে শ্রী ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কাব্যটির আখ্যানপত্রে বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের একটি পদের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত রয়েছে।

অংশটি হলো—

"রূপের সায়রে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবন বনের মাঝে মন হারাইল।।"

এই ধরনের উদ্ধৃতি কবির রচিত 'অকাল কুসুম কাব্যেও রয়েছে। সেখানে আছে কবি চন্ডীদাসের একটি অংশবিশেষের উদ্ধৃতি। কবির ব্যক্তিজীবনে ও মনে যে পদাবলী সাহিত্যের নিগূঢ় প্রভাব ছিল, তা এইরূপ উদ্ধৃতিতে প্রমানিত হয়। তাছাড়া আলোচ্য কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনাও উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে রয়েছে।

কাব্যটি কবি তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী মহারাণী মনোমোহিনী দেবীকে উপলক্ষ করে তাঁকেই উপহার স্বরূপ উৎসর্গ করেছেন। কাব্যের উপহার অংশে কবি বলেছেন—

ভাবের চন্দন আদরে মাখিয়া,
কবিতা কুসুমে গাঁথিয়া হার,
প্রেম-উপহার দিলাম তোমায়,
এ দীনের কাছে কি ধন আর।

কাব্যটিতে মোট ২২টি দীর্ঘকবিতা আছে। প্রত্যেকটি কবিতায় আলাদা নামকরণ করা হয়েছে। যেমন— যৌবন বসন্ত, আছে কিরে মনে,



মদনোৎসব, আকিঞ্চণ, বসন্ত পঞ্চমী, আক্ষেপানু-রাগ, উপহার, যুগলবসন্ত, দেখি আরবার, পরাধীনা, ভাবোল্লাস, খেলনা, গত একদিন, প্রেমিকা, পত্র, স্মৃতি, মানান্তে, নববালা, গতকথা, ফুল-দোল, বসন্ত-পূর্নিমা, কলংকী শশাংক ও সেই মুখখানি। আবার প্রত্যেকটি কবিতায় দেখা যায় অনেকগুলি স্তবক আছে এবং স্তবকগুলির উপরে ১,২,৩,৪ করে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া আছে। নিবিড় পাঠে বোঝা যায়, কবিতাগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবধারার সমষ্টি নয়, বরং একটি মূল ভাবই ফল্গুধারার মতো প্রতিটি কবিতায় সঞ্চারিত হয়ে ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

কাব্যটিতে পত্নীপ্রেমকে ঘিরে কবি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কবির প্রত্যয় যে প্রকৃত প্রেম যৌবনকে পরিপূর্নভাবে বিকশিত করে তোলে।

প্রকৃত হৃদয় যার
চির মধু বাঁধা তার,
প্রেমরাজ্যে বসন্তের নাহি মাস ভেদ,
শুভ্র কেশ হেরি অরসিক মনে খেদ.
অন্তর যৌবন যার সেই যুবজন,
চপলা চমক যেন বাহির যৌবন। (যৌবন বসন্ত)

পত্নীপ্রেমকে উপলক্ষ করে কবি অতীত স্মৃতি মন্থন করেছেন—

কতবার হেরিয়াছি থাকি অন্তরালে
·একাকী নির্জনে,
তোমার সহিত প্রিয়ে প্রানের মিলনে.
সমান বয়সী মেলি,
করিতে সলিল কেলি,
তড়িত জড়িত হাসি ভাসিত বদনে.
হেরিতাম তৃষিত নয়নে। (আছে কি রে মনে)

প্রেমে জ্বালা আছে জেনেও প্রেমিক-মন সেদিকে নিয়ত ধাবিত হয়।

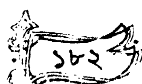
কন্টক আঘাত সহে করিয়া ঝংকার,
তবু অলি করে মধুপান,
যাতনাই পীরিতের প্রিয় অলংকার,—
প্রেম জাগে আহুতি পরান। (মদনোৎসব)

তাই কবির ধারণা— প্রেম আলো-আঁধারের খেলা এবং মহৎ প্রেম এক স্বর্গীয় দ্যোতনার সঞ্চার করে।

নবীন নীরদমালা সুনীল গগনে,
নীতিগাঢ় বিশদ বরণ,
স্তরে স্তরে ভাসাইছে মলয় পবনে,
মাঝে মাঝে বিজলী-কিরণ। (মদনোৎসব)

কবির প্রথম যৌবনে প্রথমা পত্নী ভানুমতী দেবীকে ঘিরে যে প্রেম উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিল, অকালে সেই প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুতে কবি-হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এবং এক নিরবচ্ছিন্ন হাহাকারে মন ভরে ওঠে। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণে বিদীর্ণ হৃদয় কিছুটা শান্ত হয়। দ্বিতীয়া পত্নী মনোমোহিনী দেবীর প্রযত্নে ও ভালবাসায় হৃদয়ের বেদনা কিছুটা প্রশমিত হলেও, নবীন যৌবনের প্রেমকে কবি ভুলতে পারেননি। বারবার ঘুরে ফিরে প্রথম প্রেম কবিমনকে বিক্ষিপ্ত করেছে — নিবিড় ভাবে দোলা দিয়েছে। তাই কবি নবীন প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে প্রত্যয়ের সুরে বলছেন—

(১)
মানবের নব প্রথম পিরীতি,
তরুর নূতণ কুসুমের মত,
চিরকাল মনে রহে জাগরিত,
পরের পিরীতি রহে না তত।



(২)

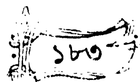
জনমে নবীন যৌবন সনে,
তাই চিরদিন পিরীতি মূরতি,
দেবতার মত জাগয়ে মনে। (উপহার)

ফলে প্রিয়তমা পত্নীর মনেও আজ এক বিরাট সংশয় ও অতৃপ্তি। মিলনের মধ্যে বেজে উঠেছে বেদনার সুর।

কই সখা, প্রাণ - মন
করেছি ত সমর্পণ।
দিয়েছি ত যাহা কিছু আছিল আমার,
তবু শুকালো না কেন অশ্রু - বারিধার।
(আক্ষেপানুরাগ)

কিন্তু সবকিছু বুঝেও কবি মনকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছেন না। কবির ধারণা, প্রেমে যদি একবার মন লিপ্ত হয়, তবে সেই মন আর ফেরানো যায় না। প্রেম যদি হৃদয়কে দগ্ধও করে, তবু প্রেমিক শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরদিন সেই প্রেমকে স্মরণে রাখে।

যার প্রেমে একবার ভুলিয়াছে মন,
তারে কি ভুলিতে আর পারে কোনদিন?
সেই মন তার লাগি,
হয় চির অনুরাগী,
তারে ভালবাসে অনুদিন
নাহি পেলে সেইজনে, বিরহ দহন,
অন্তরে বাহিরে তার পোড়ে অনুক্ষণ।
(ভাবোল্লাস)



কবিপত্নী কবিকে অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেও তাঁর মনের নাগাল পান না। তাই প্রচন্ড আক্ষেপে বলছেন —

ওরে প্রেম। আর কি পেলে না?
হাসাইতে কাঁদাইতে, ভাসাইতে ডুবাইতে,
এ জগত মাঝে প্রেম আর কি পেলে না,
এ অভাগী বিনে বল আর কি মিলে না,
হেন সাধের খেলনা? (খেলনা)

কিন্তু কবির চোখে প্রেয়সীর রূপ অপরূপ। সব কিছু বুঝেও কবি তাকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

কে যেন রেখেছে আনি,
রূপের প্রতিমাখানি,
সমুখে আমার প্রিয়ে, ভাবিয়া তখন —
নিরখি সে রূপরাশি ভুলিনু আপন।
(গত একদিন)

তাই প্রেয়সীর রূপ কবির অন্তরে রয়েছে চির জাগরুক —

জাগ্রতে নিদ্রায় প্রিয়ে হৃদয় - মন্দিরে
ও দেব মূরতিখানি বিরাজে সতত, (পত্র)

'সোহাগ' কাব্যের কবিতাগুলিতে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়া পত্নীকে পেয়ে কবিহৃদয় শান্ত হয়েছে ঠিকই, তবু বিগত দিনের প্রেমের স্মৃতি কবিকে প্রতিনিয়ত করেছে উদভ্রান্ত। কবির স্মৃতিপটে আজও তা অম্লান।

সেই বিদায়ের সেই সজল নয়ন,
উছলিত হৃদিসিন্ধু,
অনন্ত মুকুতাবিন্দু,
প্রতি হৃদে গ্রন্থি - সূত্রে করেছি গ্রন্থন।

"সেইকথা" —
আজিও করিছে প্রিয়ে স্মৃতি উদ্দীপন। (পত্র)

এ কাব্যেও কবি তাঁর দুরন্ত প্রেমাবেগকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবি-হৃদয়ের কামনা-বাসনা প্রতিটি ছত্রে হয়েছে অনুরণিত। তবে গ্রীস্মের সেই দাবদাহ আর নেই, তার পরিবর্তে কবিমনে এসেছে সায়মের প্রশান্তি। 'অকাল কুসুম' কাব্যের মতো এই কাব্যেও ব্যক্তিমনের উচ্ছ্বাসকে ঘিরে এক অখন্ড ভাব প্রবাহিত হয়েছে। এই ভাবোচ্ছ্বাস খুব সহজ ভাষায় অভিব্যক্ত। কবি খুব আন্তরিকভাবে মনের বিচিত্রভাবকে তোলে ধরতে সক্ষম হলেও কাব্যটি যে অতীত স্মৃতির ভারে কিছুটা ভারাক্রান্ত হয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

— ঃ —

"কণিকা" কাব্য

ত্রিপুরার রাজকুমারী অনঙ্গ মোহিনী দেবী



উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে গীতিকবিতার উন্মেষ ঘটে, তার ঢেউ সুদূর পার্বত্য ত্রিপুরায়ও এসে পৌঁছেছিল। ত্রিপুরার মহারাজারা দীর্ঘকাল ধরে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজ-দরবারকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা মহারাজা ধন্যমাণিক্যের আমল (১৩৮৫-১৪৩৭ শক) থেকে শুরু হয় এবং সেই ধারা মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে এসে পরিণতি লাভ করে। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ও তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর সাহিত্যচর্চার কথা আজ ত্রিপুরায় সকলের জানা। শ্রী যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত তাঁর "বঙ্গের মহিলা কবি" গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য নামী মহিলা কবিদের সঙ্গে অনঙ্গমোহিনীর তিনটি কাব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কারছেন। শ্রদ্ধেয় পিতার বিশেষ অনুপ্রেরনায় রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই প্রসঙ্গে শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন—

> "অনঙ্গমোহিনী অতি শৈশবকাল হইতেই
> কবিতার অনুশীলন করিতেন। সে সময়ে
> কবিতা লিখিয়া ইনি পিতা মহারাজের
> সাক্ষাতে দিতেন এবং গুণগ্রাহী মহারাজা কন্যাকে
> কবিতা রচনায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন।

এই ভাবে পিতার উৎসাহ লাভে অনঙ্গমোহিনীর
কবিত্বশক্তি দিন দিন বিকাশিত হইতে থাকে।"
(বঙ্গের মহিলা কবি-পৃষ্ঠা-২৯৫)

অনঙ্গমোহিনীর এই কাব্যানুশীলন পরবর্তীকালে তাঁর কনিষ্ঠা ভাগিনী মৃনালিনী দেবী ও রাজ-পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রেরনার সঞ্চার করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে কবি অনঙ্গমোহিনীর আবির্ভাব। তাঁর তিনটি কাব্য যথাক্রমে—

"কনিকা", "শোকগাথা" ও "প্রীতি"। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ মহিলা কবিদের কবিতার মুখ্য বিষয় ছিল— পরিবারিক জীবন, স্বামীভক্তি, বৈধব্য-যন্ত্রনা, ব্যক্তিগত মন-সমীক্ষা ইত্যাদি। সচরাচর এই গন্ডীর মধ্যেই তাঁদের চিন্তাধারা পরিক্রমা করেছে। কবি অনঙ্গমোহিনীর কাব্যও এই ভাবধারার ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে তাঁর শেষ দুইটি কাব্যে এই ভাবধারাই অনুসৃত হয়েছে। স্বর্গত স্বামীর উদ্দেশ্যে রুদ্ধ-হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস কাব্য দুইটিতে বারবার অনুরণিত হয়েছে।

কবি অনঙ্গমোহিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কনিকা' প্রকাশিত হয়— ১৭ই পৌষ, ১৩১১ বাং—ইংরাজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। কাব্যটি তাঁর স্নেহময় পিতার উদ্দেশ্যে অর্পিত এবং কবিতাগুলি স্বামীর জীবিতকালে লেখা। কাব্যের উপহার অংশে কবি সবিনয়ে বলেছেন—

এ নহে কবির গাথা কবিতা কুসুমমালা,
সুবাসিত চির-মধুময়,
এ কেবল শুষ্ক ফুল,— বিহীন সুবাস মধু,
মলিন বিশীর্ন-দলচয়।

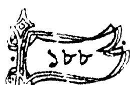
কাব্যের প্রথমে কবি এই বিনয় প্রকাশ করলেও কাব্যটিতে কবির কবিত্ব প্রতিভার কিছুটা উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। 'কনিকা' কাব্যের 'অবতরনিকা' অংশ লিখেছেন মহারাজা বীরচন্দ্রের সভাকবি মদনমোহন মিত্র। তিনি কাব্য বিচারে এই অংশে বলেছেন—

> "কনিকা" আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার কয়েকটি
> কবিতা বড়ই হৃদয়গ্রাহিনী হইয়াছে, কোমল
> ভাষায় প্রানের আবেগ ফুটিয়াছে।"

শুধু এই কাব্য সম্পর্কে তিনি উপরি-উক্ত মন্তব্য করলেও দেখা যায়, কবির তিনটি কাব্যের ক্ষেত্রেই তা নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য। একটি নিরাবরণ সৌন্দর্য তাঁর কবিতাগুলিকে বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করেছে।

"কনিকা"র কবিতাগুলি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা। এই কাব্যের মূল সুর বিরহ-বেদনা নয়— প্রকৃতি প্রেম। প্রকৃতিকে আন্তরিক উচ্ছ্বাসে কবি-হৃদয়ে আহ্বান করার ফলে এই ধরণের কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে বিশেষ প্রানবন্ত। কাব্যে সন্নিবেশিত ১২টি কবিতার মধ্যে পাঁচটি কবিতা (ঊষা, মধ্যাহ্ন, নিশীথ সঙ্গীত, বর্ষা, বসন্ত ঊষায়) প্রকৃতি বিষয়ক। "মহাশ্বেতা" একটু স্বতন্ত্র ধরনের কবিতা। তিনটি কবিতায় (অভিজ্ঞান, স্মৃতি, অন্তিমবাসনা) কবি-মনের উচ্ছ্বাস ও বিষন্নতার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর শেষের তিনটি কবিতা (বিরহ, মিলন, মুগলরূপ) বৈষ্ণবীয় ভাবে ভাবিত। এই কাব্যের কবিতা রচনায় ত্রিপুরার রাজকবি মদনমোহন মিত্রের উৎসাহ ও প্রেরনা বিশেষভাবে কাজ করেছে। তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধে শেষের তিনটি কবিতা রচিত হয়। কাব্যের ভূমিকায় এর উল্লেখ রয়েছে।

> "ত্রিপুরার রাজ-পরিবার বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত।
> গোপীভাব অবলম্বনে আরো দুই-চারটি
> কবিতা লেখার জন্য অনুরোধ করি, আমার
> উৎসাহেই শেষের কবিতা কয়টি লিখিত হইয়াছে।"



কবির প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় সুন্দর চিত্রকল্পের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষনীয়। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবি মধ্যাহ্নের ক্লান্ত অবস্থাব চিত্র এঁকেছেন—

অশ্বত্থ তরুর মূলে শীতের ছায়ায়,
ঘুমায়ে পড়েছে পান্থ, শ্রান্ত-ক্লান্ত-কায়,
পীতবর্ণ-শস্যক্ষেত্র শস্যভারে নত,
প্রভাকর তপ্ত কর বরিষণে রত,
শরতের ভরা নদী স্রোত খরতর,
তীরে শোভে কৃষকের ছোট ছোট ঘর,
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র অঙ্গিনায়,
নাচিয়ে খঞ্জন দ্রুত চারিদিকে চায়।

এখানে ভাষার কোনো কারুকার্য নেই— নেই কোনো উপমা-অলঙ্কারের প্রাচুর্য, শুধু আন্তরিকতার গুণে চিত্রটি হয়ে উঠেছে সজীব ও প্রানবন্ত।

'বর্ষা' কবিতায়ও এমনি ধরণের চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে।

সবুজ শ্যামল ক্ষেতে ভিজিয়ে কৃষাণ,
নিড়াইছে ক্ষেত্রচয় গেয়ে গ্রাম্য গান,
অদূরেতে কৃষকের কুঁড়ে ঘরগুলি,
বাখিয়াছে নিরন্তর স্নেহ পাখা খুলি,

মনে হয়যেন চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে আছে। বাংলা কাব্যে বর্ষাকে নিয়ে অনেক কবি কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু কবি অনঙ্গ মোহিনী তাদের পথ অনুসরণ না করে বর্ষার বর্ণনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেছেন। বর্ষার বর্ণনা করতে গিয়ে সংসারের তুচ্ছ-ক্ষুদ্র বস্তুগুলিও দেখা যায় তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

ক্ষুদ্র কুটিরের ক্ষুদ্র জানালার কাছে,
মধুগন্ধা করবীটি দাঁড়াইয়া আছে,

....

খেলিতেছে বাতায়নে ভাই-বোনে মিলি,
দুলি দুলি নাচে খুকু দিয়ে করতালি,

....

আর্দ্র প্রাঙ্গনের ধারে বাঁশের মাচায়,
ফুটিয়াছে ঝিঙ্গাফুল পাতায় পাতায়,

নির্জন নিশীথের নিস্তব্ধতা কবির "নিশীথে সঙ্গীত" কবিতায় অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে অভিব্যক্ত।

গভীর হেমন্ত নিশি জোছনা প্লাবিত দিশি,
প্রকৃতিকর নিদ্রায় নিমগন,
চাঁদের অমিয়মাখা, নীহারের জালে ঢাকা,
তরুলতা বন-উপবন।
মাঝে মাঝে হুহু করি, কুসুম সুবাস হরি,
বহিতেছে উত্তরে বাতাস,
স্নিগ্ধ শীত নিশীথিনী, বসন্তের বিরহিনী,
যেন ফেলিতেছে দীর্ঘশ্বাস।

"বসন্ত উষায়" কবিতাটিতে কবি বসন্তের কোনো এক উষাকে উপলক্ষ করে অতীত স্মৃতি মন্থনে বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। ফলে সমগ্র কবিতায় একটি বিষাদের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি ও কবির চোখে বিষন্নতাব প্রতিরূপে প্রতিভাত।

পশ্চিম সাগর তীরে আঁধারে আঁধারে ধীরে,
তারাগুলি ডুবে ডুবে যায়,



বিষাদ ব্যথিত প্রানে   ধরনী আকুল মনে,
অনিমিখ আঁখি তুলি চায়।
এমনি উষায় সখি,   বায়ুবহে থাকি থাকি
সে বিষাদ বিদায়ের দিনে,
ছলছল নয়নেতে   বাঁধা ছিল হাতে হাতে,
ব্যথা ভরা দুজনার প্রাণে।

প্রকৃতি প্রেমের কবিতায় কবির আন্তরিকতা ও সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষমতা অনস্বীকার্য।

সংস্কৃত 'কাদম্বরী' গ্রন্থের উপনায়িকা মহশ্বেতাকে নিয়ে "মহাশ্বেতা" কবিতাটি রচিত। কবি কবিতার প্রথমেই একটি ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশ রচনা করেছেন।

মনোহর চন্দ্রপ্রভা গিরিবর মূলে,
মহেশ মন্দির,—
লতায়-পাতায় ঘেরা   দাঁড়াইয়ে অনিমিখ,
স-বিষাদ নীরব গম্ভীর,
অবিরাম নিরঝরে ঝরে   কবি ঝরঝর,
যেন রে বালার দুখে কাঁদে গিরিবর।

শান্ত-সুন্দর পরিবেশ রচনায় কবি যে সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ এই কবিতায় পাওয়া যায়। শেষের দিকে তপস্যারত মহাশ্বেতার রূপটিও সুন্দরভাবে চিত্রিত।

পড়িয়াছে জটাভার   সুনিবিড়তর,
পৃষ্ঠে এলাইয়া,
গলার রুদ্রাক্ষমালা,   যৌবনে যোগিনীবালা,
চারু অঙ্গে বিভূতি মাখিয়ে,



আধ ফোটা কুসুমের দলে মাখিয়া চন্দন,
রাখিয়াছে যেন কেহ করিয়ে যতন।
পুন্ডরিক মুখ শুধু ভাবিতেছে মনে,
কিবা নিশিদিন,
তরুন তাপসীবালা বিষন্ন বিরহ দুখে,
বিমলিন বদন নলিন,
কেশজালে রহিয়াছে ঢাকা, আধ' মুখ-শশী,
মেঘ কোলে যেন চাঁদ আছে আধ পশি।

'অভিজ্ঞান', 'স্মৃতি' ও 'অন্তিম বাসনা' কবিতাগুলি ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাসে ভরপুর। 'অভিজ্ঞান' কবিতায় কবির প্রেমিক কবিকে ভালবাসার চিহ্ন হিসাবে যে অভিজ্ঞান দিয়েছিলেন, কবি তা চিরন্তন করে রাখার শপথ নিয়ে বলছেন—

এ দেহ পিঞ্জর-বাসে যতদিন রব,
যতনে রাখিব হৃদে অভিজ্ঞান তব।

কিন্তু অভিজ্ঞান অপেক্ষা প্রেমিক যে কবি হৃদয়ে নিয়ত বিরাজমান তা কবিতায় মুক্তকণ্ঠে দ্বিধাহীন ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

হৃদয়েশ তুমি মম প্রিয় প্রাণ হ'তে,
রহিয়াছ প্রতিক্ষণ-অন্তর-বাহিরে।

মৃত প্রিয়জনের স্মৃতি কবিমনকে ভারাক্রান্ত করেছে। তাই কবিমনের বিরহ-বেদনার অভিব্যক্তিই 'স্মৃতি' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। কবি বেদনা-মথিত কণ্ঠে বলছেন—

সে গেছে গো চিরতরে,
রেখে গেছে শুধু তার চির স্নেহ-স্মৃতি।

"অন্তিম বাসনা" কবিতায় কবির অন্তিম বাসনা হলো—

চিরঘুমে যবে প্রাণ হয়ে আসে অচেতন,
মুদিয়ে আসিবে যবে ক্লান্ত মোর দু'নয়ন।
সে সময় প্রান প্রিয় বরষি অমিয় ধার,
অধীনীর কাছে আসি চেয়ো শুধু একবার।
তা' হলেই এ জনম বিফলে নাহিক যাবে,
সারা জীবনের মোর বাসনা সফল হবে।

গোপীভাব সম্বলিত তিনটি কবিতার মধ্যে "বিরহ" কবিতাটি বিরহিনী শ্রীরাধার মর্ম্মবাণী। গোকুলে রাধা-কৃষ্ণ বিরহে আকুল হয়ে তাঁর আসার পথ চেয়ে শেষে নিরাশায় মৃত্যু কামনা করছেন।

শোন ডাকিছে যমুনা,
কুলু কুলু করি,—
আয় রাই, মম কোলে,
তব এ দারুন জ্বালা,
জুড়াবে গো সখি,
আমার শীতল জলে
তবে যাইগো সজনি,
আকুল হৃদয়ে,
জুড়াইতে চিরতরে,
আজি সজনি লো. মম
পিয়াসিত প্রাণ,
মিশাব যমুনা নীরে।

রাধার এই মর্মদেনা কবি খুব সহজ ও সাবলীলভাবে ব্যক্ত করেছেন। "মিলন" কবিতায় কবি রাধা-কৃষ্ণের মিলন বর্ণনা করেছেন, আর "যুগল রূপ"—এ কবি রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপের বর্ণনা দিয়েছেন। শেষের কবিতাটিতে সুন্দর উপমা

সহযোগে কবি যুগল রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। কৃষ্ণের বুকে রাধাকে দেখে কবির মনে হয়েছে—

যেন যমুনার
সুনীলিম নীরে
রাধা হেম-সরোজিনী,
নব নীরদের
বুকের মাঝারে,
শোভে যেন সৌদামিনী।

তাছাড়া রাধার রূপ বর্ণনায় কবির দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অন্তর দিয়ে অনুভব না করলে এরূপ বর্ণনা আশা করা যায় না।

কুসুমের সম
সুকোমল দেহ,
যেনরে মাধবীলতা,
চম্পকের দাম
জিনিয়ে বরণ,
অতুল রূপের ছটা।

এখানেও উপমার প্রাচুর্য লক্ষনীয়। পরিশেষে আকুল সুরে ভক্তি পূর্ন অন্তরে কবির প্রার্থনা—

আর কি বলিব
ওহে রাধা-শ্যাম,
অধমএ চিরদাসী,
নিজ দয়াগুণে
হৃদয় মন্দিরে
রহ দোঁহে দিবা-নিশি।

"কনিকা" কবির অপরিনত বয়সের লেখা। ফলে কাব্যোচিত গুণের চরম বিকাশ এই কাব্যে বেশী দেখা যায় না। নিছক কাব্য-সৌন্দর্যই প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই কাব্যে কবির বর্ণনাভঙ্গীর বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। এই বর্ণনাভঙ্গী এত কোমল, সহজ ও সাবলীল যে, কবিতাগুলি পড়তে গিয়ে স্বতঃই মনে পড়ে যেন, এই কলানৈপুন্য কবির স্বভাবজাত। তাছাড়া সর্বত্র যেন আন্তরিকতার সুর স্পষ্ট। এই 'কনিকা' কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য হলো—

> "..................... আপনার এই কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটা স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য বড় সরল এবং সুকোমল অথচ কলানৈপুন্য ও আপনার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ।"

(চিঠি—১৭ই শ্রাবন, ১৩১৮ বাং-
'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'—পৃষ্ঠা—৪৬৬—
প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন—১৩৬৮বাং)

—ঃ—

"শোকগাথা" কাব্য

অনঙ্গমোহিনী দেবী।

'কনিকা' কাব্য রচিত হওয়ার পাঁচ বৎসর পরে ১৩১৩ বাং (১৯০৩ইং) কবির "শোকগাথা" কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে মোট ২৩টি বিভিন্ন ধরনের কবিতা সন্নিবেশিত। কাব্যটি রচিত হওয়ার এক বৎসর পূর্বে কবির জীবনে এক নিদারুন বিপর্যয় ঘটে। ১৩১২ বাংলার আশ্বিন মাসে কবি অনঙ্গমোহিনীর স্বামী গোপীকৃষ্ণ দেববর্মন মারা যান। এই মর্মান্তিক ঘটনায় কবির চিত্ত বিদীন হয়। এই বিদীর্ন হৃদয়ের হাহাকার "শোকগাথা"র প্রতি ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে। এই কাব্যের



কবিতাগুলি তাই কবির নিভৃত মনের বেদনার বিশেষ অভিব্যক্তি। এদিক থেকে বিচার করলে এই কাব্যটি কবি মানকুমারী বসুর "প্রিয় প্রসঙ্গ" (১৮৮৪) কে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাব্যের নিবেদনে কবি এই কাব্য সম্পর্কে নিজেই বলেছেন—

"নিয়তির দিনারুন নিয়মাধীনে যে মহাপ্রলয়
আমার জীবনে ঘটিয়াছে, তাহাই করুণ
উচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে কবিতার আকারে
প্রকাশ পাইয়াছে।.................. 'শোকগাথা'
আমার জীবনের বিষাদময়ী ঘটনার ও দীর্ণ
হৃদয়ের নিদর্শন মাত্র।"

কাব্যটি পূর্বাপর অনুধাবন করলে এই বক্তব্য সর্বাংশে সত্য বলে মনে হয়।

ঊনবিংশ শতকের মহিলা কবিদের সমসাময়িক কবি হলেন রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী। 'শোকগাথা'র বিষয়বস্তু হলো স্বামীভক্তি ও বৈধব্যযন্ত্রনা। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্যেও স্বামীভক্তি ও বৈধব্যযন্ত্রনার পরিচয় বিধৃত। তাঁর লেখা 'অশ্রুকনা'(১৮৮৭) 'আভাষ'(১৮৯০), 'অর্ঘ্য' (১৯০২) প্রভৃতি কাব্যে বৈধব্যজীবন ও পরলোকগত স্বামীর উল্লেখ আছে। কবি মানকুমারী বসুর কাব্যেও একই যন্ত্রনার অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের কাব্যস্রোত তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ব্যথায় উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছিল। অক্ষয়কুমার বড়াল এবং বিহারীলালের কবিতায়ও আমরা দেখি মৃতা পত্নীর উদ্দেশ্যে বেদনার অঞ্জলি অর্পিত হয়েছে। মহারাজা বীরচন্দ্র তাঁর "প্রেম মরীচিকা" কাব্যে পত্নী বিরহে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মরণ' এ মাত্র দুইটি ছত্রে মনের সবকথা বলে দিয়েছেন।

"আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।।"



এদিক থেকে তাঁদের সঙ্গে কবি অনঙ্গমোহিনীর সাদৃশ্য বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়।

কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের প্রথমদিকে পতি বিয়োগের বেদনা তীব্রতর ছিল। কারণ এর পেছনে ছিল কামনা-বাসনালিপ্ত পিপাসা, ফলে এক প্রচন্ড নিরাশা তখন কবিমনকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এ শোকাশ্রু! নিরাশায় যাতনা — গরল — ঢাকা।
এ শোকাশ্রু! বাসনার অনন্ত — পিপাসা — মাখা।
('অশ্রুকণা' — 'উপহার' কবিতা।
সাহিত্য সাধক চরিতমালা — ৫ম খন্ড
— পৃষ্ঠা — ১৯)

কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই বেদনার তীব্রতা কমে গিয়ে কিছুটা প্রশান্তির স্তরে নেমে এসেছে। কারণ তিনি স্মৃতির মন্দিরে নিত্য বিরাজমান।

তুমি কি গিয়াছ চলে তাত নয়, নয়।
স্মৃতির মন্দিরে মম, প্রতিষ্ঠিত দেবসম
চির বিরাজিত তুমি অমর প্রানেশ।
('অশ্রুকনা'-'মৃত্যু' কবিতা,
সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৫ম খন্ড-পৃষ্ঠা-২২)

তুলনায় কবি অনঙ্গমোহিনীর বিরহ-বেদনা শুধু স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত। ফলে কবির জীবনে এখন অশ্রুই একমাত্র সম্বল।

গিয়াছে সকলি মম কিছু নাহি আর,
রয়েছে কেবল স্মৃতি আর অশ্রুধার।
('শোকগাথা'—'চিরস্মৃতি' কবিতা)

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও মানকুমারী বসু তাঁদের বৈধব্যযন্ত্রনাকে কবিতায় এক নিরাভরণ-বৈরাগ্যের রূপ দিয়েছেন, আর কবি অনঙ্গমোহিনীর বৈধব্যযন্ত্রনা এক নিরবচ্ছিন্ন হাহাকারে পর্যবসিত হয়েছে।

এই কাব্যের মূলসুর তাই প্রিয়বিরহের সুর। কাব্যের সর্বত্র বারবার ফিরে ফিরে শুধু স্বর্গতি স্বামীর উদ্দেশ্যে হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস অনুরণিত হয়েছে। অনঙ্গমোহিনী দেবীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে কর্ণেল মহিম চন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন—

"তিনি এইক্ষণে স্বর্গে, তাঁহার গোপনীয় কোন কথা ব্যক্ত করার বাধা নাই, স্বামী উজির গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর মৃত্যুশয্যায় কয়েকদিন কাটাইয়া ছিলেন বাক্শক্তিহীন অবস্থায়। নীরবে নয়ন কোনে মাত্র সহধার্মিনীকে দেখিতেন আর অশ্রু ত্যাগ করিতেন। .... তখন অনঙ্গমোহিনী একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "যদি সহমরণ প্রথা রহিত না হইত তাহা হইলে আমি অগ্নি স্নান করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতাম।" তিনি কাব্যজগতে অনুমরণ রাগিনীতে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার স্মৃতিরূপে বঙ্গভাষায় চিরকাল থাকিবে।"
(দেশীয় রাজ্য—পৃষ্ঠা—২৩৮)

'শোকাগাথা'য় কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। কাব্যটি স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশ্য অর্পিত।

লহ নাম একবার,
দীন হৃদি বেদনার
অশ্রুজল বিন্দুমাখা প্রেম—উপহার।

এই কাব্যের প্রতিটি কবিতায় প্রিয়-বিরহের সুর ধ্বনিত। প্রিয়জনকে চিরদিনের মতো হারিয়ে কবির জীবন আজ নিরবচ্ছিন্ন হাহাকারে পর্যবসিত। অশ্রুজলে অভিষিক্ত কবি জীবন-সায়াহ্নে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলতে পারবেন ভেবে আশায় বুক বেঁধে বলছেন—



ফুরায়ে এসেছে ক্রমে রৌদ্র-তপ্ত মোর
জীবনের বেলা।
অল্প আর আছে বাকি,
তবে কেন মন তোর
ব্যাকুলতা? কর তাহে হেলা।
দিবস রজনী কত আর
ভাবিব রে মন?
ক্ষনেক ভুলিতে দাও হৃদয় বেদন? (সান্ত্বনা)

কবির এখন একমাত্র সম্বল শুধু স্মৃতি আর অশ্রু— ''স্মৃরি মোরে দিবানিশি হাসায় কাঁদায়।''— (চিরস্মৃতি) —অন্যদিকে, অতৃপ্ত আশার দুঃসহ জ্বালা নিয়ে আরও কতকাল বেঁচে থাকতে হবে ভেবে কবি ব্যর্থতার শূন্যতা উপলব্ধি করেছেন—

এখনো জীবনকুঞ্জে
প্রেমের কুসুমপুঞ্জে,
উথলি সুরভি ভাসে
আশার সমীরে।
জীবন মধ্যাহ্ন কাল
শুভ্র আলোকের জাল,
প্রেমপুষ্প পরিমল
বহিছে সুধীরে— (বিরহে)

অসহনীয় বিরহের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কাবি এখন কিছু একটা আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চান। তাই কল্পনাকে আশ্রয় করে বলেছেন—

এসো গো কল্পণে এস গো সজনী
ভাবের কুসুম ফোটায়ে শত,
....



আঁচল ভরিয়া তুলিব দুজনে
ভাবময় ফুল কবিতা-মালা,
গাঁথিব দুজনে মিলি সযতনে
ভুলিব প্রানের বেদনা জ্বালা। (কল্পনা)

পরক্ষনেই কবির মনে হয়েছে এই জীবন পরীক্ষাময় ও প্রতারণাপূর্ণ—

প্রতারনাময় এ সংসার.
হেথা শুধু জীবনের পরীক্ষার স্থান, (মৃত্যু)

কবি এই পরীক্ষায় হেরে গেছেন বলে ব্যর্থতার জ্বালা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আজ মৃত্যুকে সাদরে বরণ করতেও আগ্রহী।

এস মৃত্যু চির সুপ্তি বেশে,
যদিও করাল তুমি তবু মম প্রিয়.
পরশি মোহিয়ে মোরে সাথে কবি নিয়ো। (মৃত্যু)

আবার ভাবছেন — মরনেই কি জীবনের শেষ, জীবনের কিছুই কি সত্য নয়। কবি মানতে চান না বলেই প্রশ্ন জেগেছে—

মৃত্যুই কি জীবনের ঘোর পরিনাম?. ....
জীবন কি শুধু ভ্রান্তিময়?
তবে কেন এত আশা,
এত প্রেম ভালবাসা,
চিরতরে হবে যদি লয়।
স্নেহ-ভক্তি প্রীতিপূর্ন-মানব-জীবন,
হবে কি মৃত্যুর গর্ভে চির নিমজ্জন? (মৃত্যু)



তারপব কবি নিজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছেন যে এই সুন্দব পৃথিবী ও তাব বহু বিচিত্র প্রাকৃতিক সম্পদ জীবনের প্রেম-প্রীতি-স্নেহ সবই সত্য— এ কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

যদি শুধু ক্ষনিক জীবন,
তবে কেন নীলাকাশে,
রবি-শশী তারা ভাসে,
শোভা দীপ্তি করে বিকীরণ?
কেন নিশা সুখ-সুপ্তি দেয় আসিনিতি?
পাখী কেন ঢালে কানে মধু-কল-গীতি? (মৃত্যু)

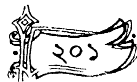
অবশেযে কবি বলেছেন—

তাই ভাবি মানব জীবন,
নহে বালকের খেলা,
ক্ষনিক মায়ার মেলা,
এ নহে গো নিশার স্বপন। (মৃত্যু)

কবি-মনেব আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব এই কবিতার একটি লক্ষনীয বৈশিষ্ট্য। তবু মৃত্যুর মধ্যেই আছে চির প্রশান্তি। মৃত্যু জীবনের সম অনুভূতিকে চিবদিনের মতো আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই এর মধ্যে অনন্ত জ্বালার পরিসমাপ্তি আছে ভেবে কবি মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। কবি সাদরে মৃত্যুকে বরণ করতে চান এই ভেবে যে, এরপরই তো প্রিয়জনের সঙ্গে হবে পরপারে শুভমিলন। তাই কবি চিরঘুমবে আহ্বান করছেন—

এস চিবঘুম প্রান আবরিয়া,
রাখ চির-মোহ দিয়া।

....



ভুলিয়া যাইব জীবনের মোর
বিরহ-মিলন স্মৃতি,
ভাঙ্গিবে না কভু এই ঘুমঘোর,
সহিতে যাতনা নিতি। (চিরঘুম)

এ বড় করুন পদক্ষেপ।

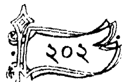
কবি অনঙ্গমোহিনীর কাব্যে প্রকৃতির যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা আমরা 'কনিকা' কাব্যে দেখেছি। এই কাব্যে ও দেখা যায়, প্রকৃতির সঙ্গে কবিমনের এক নিবিড় একাত্মতা। কয়েকটি কবিতায় দেখা যায় , বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ কবিমনকে বিভিন্নভাবে আলোড়িত করেছে। বিরহ ও প্রকৃতি সমভাবে তাঁর কাব্যের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।

''বর্ষা নিশায়'' কবি বর্ষার রাত্রিকে তাঁর মনের মানসিকতায় দেখেছেন—

আজিকে যামিনী,   মলিন চাঁদিনী
নীরব নিশুতি ধরনী,
ভাঙ্গা মেঘ ভাসে চাঁদ আবরিয়া,
ঢালে রিমি ঝিমি রহিয়া রহিয়া,
আকুল সমীর বহিছে শ্বসিয়া
প্রকৃতি সজল নয়নী,
আজি নিশি যেন,   বিরহিনী হেন
বিষাদ মলিন বরনী।

একই মানসিকতা 'বর্ষায়' কবিতাতেও লক্ষনীয়—

আজি বিষাদিনী হেন,
দিগ্ বধূ যেন
শুধু কেঁদে হয় সারা।



প্রকৃতির অশান্ত বর্ষন ও ঝটিকার উন্মত্ততায় কবির মনোবেদনা বিশেষভাবের প্রকাশিত হয়েছে " নিশীথ ঝটিকা" কবিতায়। এটি বিশেষ উন্নত মানের কবিতা। বাইরের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার মনের অন্ধকারের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

দোলায়ে ঘন গহন বন
বাতাস বহে শ্বসিয়া,
কাঁপায়ে মন গরজে ঘন
বিজলি উঠে হাসিয়া।

....

আজিকে মন হৃদয় সম
যামিনী মাসি বরণা,
আমারি যেন নয়ন হেন
ঝরিছে ঝর-ঝরণা।

'কণিকা'র চাইতে 'শোকগাথা'র কবিতা গুলি অনেক বেশী পরিনত মনের পরিচয় বহন করে। প্রিয় বিরহের মর্মান্তিক যাত্না এই কবিতা-গুলির প্রতি ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে। প্রানের উত্তাপ ও স্পন্দন এই কবিতাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরল প্রকাশ ভঙ্গি কাব্যটিকে সুষমামন্ডিত করেছে। কাব্যটি কবির জীবন ও মনকে ঘিরে বারবার আবর্তিত। কোনো উত্তরণের চেষ্টা হয়তো এতে নেই, কিন্তু ভাবের গাঢ়তা ও আন্তরিকতা এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে এই কাব্যে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া ভাষার পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যও কবিতা গুলিকে এক বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করেছে। হৃদয়ের দুরন্ত বেগ যা কোনো বাধাকে মানিতে চায় না, তাকে আমরা বলি Passion। এই Passion ছড়িয়ে আছে কাব্যের সর্বত্র।

রবীন্দ্রনাথ কবি অনঙ্গমোহিনীর স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। 'কনিকা' ও 'শোকগাথা' উপহার হিসেবে পেয়ে তিনি ১৩১৮সালের ১৭ই শ্রাবণ কাব্য দুটির প্রশংসা করে একটি চিঠি লিখেছেন। এই চিঠির বক্তব্যের মাধ্যমেই কবির কাব্যের মূল্যবোধ স্থিরীকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

শান্তি নিকেতন
বোলপুর

মাননীয়াসু

আপনার রচিত 'শোকগাথা' ও 'কনিকা'

উপহার হিসাবে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনার এই কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য বড় সরল এবং সুকুমার অথচ কলানৈপুন্য ও আপনার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ এই নৈপুন্য আপনার শেষ কাব্যগ্রন্থটিতে পরিস্ফুট হইয়াছে।

আপনি নিশ্চয় জানেন আপনার পিতা আমাকে স্নেহ করিতেন এবং আপনার ভ্রাতা স্বর্গীয় মহারাজাও আমাকে বন্ধু বলিয়া গন্য করিয়া ছিলেন, আপনাদের পরিবারের সহিত আমার এই আন্তরিক প্রীতি সম্বন্ধ আছে বলিয়া আপনার কবিত্ব পরিচয়ে আমি বিশেষভাবে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আপনার এই কবিত্বশক্তির পূর্নবিকাশের মধ্যে আপনার জীবনের সমস্ত দুঃখ-বেদনা সার্থকতা লাভ করুক এই আমার কামনা। ইতি ১৭ই শ্রাবন, ১৩১৮বাং।

শুভাকাঙ্ক্ষী,
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা-পৃষ্ঠা ৪৬৬-৪৬৭)

—ঃ—

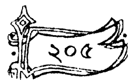
"প্রীতি" কাব্য

অনঙ্গমোহিনী দেবী

কবি অনঙ্গমোহিনীর পরবর্তী ও শেষ কাব্য "প্রীতি" ১৩১৭ সালে (১৯০৭ইং) প্রকাশিত হয়। তিনটি কাব্যের মধ্যে এই কাব্যটি নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। এই কাব্যে মোট ৩১টি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কবিতা রয়েছে। বিরহ-বেদনার যে হাহাকার 'শোকগাথা'র প্রতি ছত্রে ধ্বনিত, তা এই কাব্যে এসে অনেকটা শান্ত ও সংহত রূপলাভ করেছে। বহির্মুখী মন এখানে অনেকটা অন্তর্মুখী, ফলে এই কাব্যটি কবির পরিনত প্রতিভার পূর্ণতম প্রকাশ হিসাবে ধরা যায়। 'শোকগাথা'র বিষয়বস্তুর একমুখীনতা এই কাব্যে নেই। এই কাব্যর একদিকে সংক্ষিপ্ত ও অন্যদিকে সংযত ও সুসংবদ্ধ। খুব সংক্ষেপে মাত্র চারটি ছত্রে স্বর্গত স্বামীর উদ্দেশ্যে কাব্যটি অর্পিত।

তোমার কণ্ঠের সুরে বাঁধিয়া লইয়া বীনা
তারে দিয়েছি ঝংকার,
গাহে সে অন্য গান তব প্রিয় নাম বিনা,
গীতি-প্রীতি সকলেই তোমার। (উৎসর্গ)

'শোকগাথা'র যে কবি নিরাশার ভারে ভারাক্রান্ত ছিল, 'প্রীতি'তে সেই কবি আবার আশাবাদে উজ্জীবিত হয়েছেন। 'শোকগাথা'র কবিতাগুলি ছিল অনুভূতির স্তরে আর 'প্রীতি'র কবিতাগুলি সেই অনুভূতির স্তর অতিক্রম করে উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়েছে। প্রথমে কবি জীবনকে ব্যর্থ মনে করে সহমরণের কামনা করেছিলেন, পরে পৃথিবীর স্নেহ ও মায়া কবিকে আবার নূতন করে সঞ্জীবিত করেছে। ফলে জীবনের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ থেকে জীবনের প্রীতি ও ভালবাসা কবির কাছে চরম সত্য বলে মনে হয়েছে।



যে প্রীতির স্রোত নিরবধি
শুষ্ক চিত্ত রসে সিক্ত করে,—
সেই প্রীতি অমরার নদী—
প্রবাহিত কর এ অন্তরে।। (নিবেদন)

য কবি একদিন দুঃখকে জীবনে চিরন্তন ভেবে বলে ছিলেন— "বেঁচে থাকুক ঃখ আমার ওকে দিয়েই ঘর করি।"—সেই দুঃখকে কবি এখন জয় করে সতেজ কণ্ঠে বলেছেন—

বুঝাব প্রীতির লক্ষ্য বিকাশ, বক্ষে জগৎ ধরা,
নারীর মোক্ষ নহেক কেবল দুঃখে দহিয়া মরা। (সাধনা)

সংসারের চাওয়া পাওয়া ক্ষুদ্র গন্ডীকে অতিক্রম করে কবি এখন বিশ্বমুখী। এখন নিজের ভাবের মধ্যে দয়িতকে নিয়ত প্রত্যক্ষ করে কাছে না পাওয়ার বেদনাকে কবি ভুলতে পেরেছেন। মনের মণিকোঠায় চিরদিনের জন্য তাঁর আসন পাতা হয়ে গেছে। এরই প্রেরনায় কবি এখন মুক্তকণ্ঠে বলতে পারছেন—

তোমারে আমি রেখেছি বুকে
সুখের তরে নয়,
তোমারে আমি পেয়েছি দুখে
দুখেরে করি জয়। (পেয়েছি)

জীবন কবির কাছে এখন আর নিছক স্বপ্ন নয়। জীবনের সত্যকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে জীবনের প্রতি নিবিড় মমতায় কবি বলেছেন—

সবে কহে এই জীবন স্বপন,
তাই হোক, মজি স্বপনে। (বাসনা)



অন্যত্র—

নিঠুর দূরতা আজি নাহি আর,
কঠোর বিরহ মরেছে আমার,
বিফল নহেরে আশার বাঁধন
অলীক নহেরে সাধনা।
সুখ তরঙ্গে ধুয়েছি অঙ্গ
মুছিয়া ফেলেছি যতনা।
(অশরীরী জাগরন)

কবির প্রেম আজ কোন ব্যক্তি বিশেষ বা বস্তুকে অবলম্বন না করে সবকিছুর মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে। তাই কবিতাগুলিতে ভাবের গভীরতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। কবি এখন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দয়িতের স্পর্শ অনুভব করছেন।

চলে গেছে সুখ। স্বার্থের বোধনে
ফিরাইতে তায় সাধিব না।
আসিয়াছ সুখ? ব্যর্থ এ বোধনে
বুকে টেনে তায় বাঁধিব না।
নারীর ধর্ম নহেক শুদ্ধ
মর্ম বেদনে ভরা,
প্রীতির ধর্ম নহেক ক্ষুদ্র
কারাগারে গড়া ধবা। (সাধনা)

তাই নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন কবি বলছেন—

পূন্যের নামে যেই অভাগিনী,
পুষি দুখ, প্রাণ মাঝে তার
গৃহকোণে বসি কাঁদে অনাথিনী

উড়ে যাব আমি কাছে তাব।
বুঝাব প্রীতির লক্ষ্য বিকাশ, বক্ষে জগৎ ধবা,
নারীব মোক্ষ নহেক কেবল দুঃখে দহিয়া মরা। (সাধনা)

দুঃখের পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে মরমী কবি বিশ্বনিয়ন্তাকে খুঁজে পেয়েছেন। সবকিছুর মধ্যেই কবি এখন তাঁর কল্যাণহস্ত প্রসারিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর সস্নেহ স্পর্শে কবির অন্তর আজ পরিপূর্ণ। ফলে কবির মিনতি—

চাহিনাগো ক্ষণিকের বৃথা স্নেহ-বৃথা ভালবাসা,
পারি যেন সঁপিবারে ওই পদে স্নেহ-প্রেম-আশা। (নিশীথে)

বিরহের যন্ত্রনা উপশমিত হয়েছে। মৃত্যু এখন কবিব কাছে 'শ্যামসমান'। এই ভাবাদর্শ রবীন্দ্রনুসারী। 'শোকগাথা'য় দেখা যায়, কবি বিরহের তপ্ত জ্বালাকে সহ্য করতে না পেরে অগত্যা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরশান্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানে কবি মৃত্যুকে সাদরে বরণ করতে চান এই ভেবে যে মৃত্যুব পরেই তো চিরসুন্দরের সঙ্গে দেখা হবে। ফলে—

এস ওগো এস·আমার মরণ,
এস হে সুন্দর সৌম্য, সুনীলবরণ। (মরণ)

কবির শয়নে-জাগবণে এখন শুধু তাবই বিচিত্র অনুভূতি।

প্রভাতে আকাশে, কুসুমের বাসে,
সমীরণ পরশনে,
তব অনুভূতি প্রান-ভরে আছে
স্বপনে কি জাগরণে। (হৃদয় দেবতা)

জীবন সায়াহ্নে এসে কবি চিরসুন্দরকে শুধু একবার দেখার জন্য ব্যাকুল। তাই নিদ্রাহীন চোখে তাঁর আকুল আবেদন—

নিদহীন এই বিরহ-শয়ন,
শিয়রে দাঁড়াও হেসে,
প্রানভরে হেরি, মুদিব নয়ন—
দীঘল রজনী শেষে (হৃদয় দেবতা)

এখানে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের চিন্তাধারার সাযুজ্য বিশেষভাবে লক্ষনীয়। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে কবি যতীন্দ্রনাথও আকুল হয়ে বলেছেন—

''দেখা দাও দেখা দাও
আলো নিবিবার আগে একবার
হে সুন্দর, মোরে দেখা দাও।''

''প্রীতি'' কাব্যেও কয়েকটি গোপীভাব সম্বলিত কবিতা রয়েছে। ''শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ'', ''বর্ষায়'' ও বাঁশী''— কবিতাগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। ''শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ'' কবিতাটি কীর্ত্তনের ঢঙে লেখা। রাধার মনে পূর্বরাগের মাধ্যমে প্রেম-সঞ্চারের বর্ণনা কবি নিপূন ভাবে এই কবিতায় দিয়েছেন।

(ওগো) দেখি নাই যারে সে কিনা আমারে
পাগল করিয়া দিল।
(ঐ) উছলিয়া যায় পীরিতি কোথায়
মোরে ভাসাইয়া স্রোতে গো?

পরিশেষে শ্রীরাধার আক্ষেপ —

এতখানি সুখ লিখিয়াছে বিধি
রাধার কপালে কিগো?

'বর্ষায়' কবিতাটি পদাবলীর 'মাথুর' পর্যায়ে পড়ে। কবিতাটি ব্রজবুলি ভাষায় লেখা। ভাব ও ভাষার বিচারে এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে মহাজন-পদাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। বর্ষার ঘন বরিষণে, মেঘের গুরুগর্জনে প্রিয়-বিরহে ব্যাকুল রাধার মানসিকতার চিত্র কবি ভক্তের দৃষ্টিতে সুন্দর সংযত ভাষায় এঁকেছেন।

নীল গগনতল,
নীল যমুনাজল,
বরখই নীল নব মেহ,
সখিলো, কঠিন অতি
নিদয় মাধব মতি
বিসরল এ মঝু লেহ।

'বাঁশী' কবিতাটিও মাথুর পর্যায়ের। কৃষ্ণ বিরহিনী রাধার কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুলতা—এই কবিতার মূলভাব। রাধার বুকভাঙ্গা মর্মবাণীকে কবি সমদুঃখিনীর ভাব নিয়ে যেন প্রত্যেক্ষ করেছেন।

গাঁথি বিরহিনীবালা মালা, ফুল কলিতে,
আপখিয়া পথ-পানে চাহে গো।
কাঁদে রাধা, ওগো বঁধূ, শুধু কেন ছলিতে
মধু বনে তব বাঁশী গাহে গো?

'প্রীতি'র সর্বশেষ কবিতা "আমার কবিতায়" কবি নিজ কাব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে বলছেন— "আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা।" একথা খুব সত্য যে প্রথমে ব্যক্তিগত জীবনের শোকোচ্ছ্বাসকে ঘিরেই কবি অনঙ্গমোহিনীর কাব্য বিশেষভাবে আবর্তিত হয়েছে। যে ভালবাসার অর্ঘ্য প্রথমে নিবেদিত হয়েছিল দয়িতের পাদমূলে, পরিশেষে সেই অর্ঘই ফিরে নিবেদিত হয়েছে চিরসুন্দরের উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় অনেকটা যেন—"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে

দেবতা'' (বৈষ্ণব কবিতা)। তাছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের— ''প্রীতি সর্বব্যাপিনী— ঈশ্বরই প্রীতি'' (বিবিধ প্রবন্ধ)— এই ধারনাকেই যেন কবি অনঙ্গমোহিনী তাঁর 'প্রীতি' কাব্যের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা দিলেন। যে প্রীতি ও ভালবাসা একদিন দয়িতকে ঘিরে মুকুলিত হয়েছিল, তা আজ ভক্তিভরে অর্পিত হয়েছে দেবতার চরনমূলে। ফলে প্রিয় ও দেবতা কবির চোখে শেষ পর্যায়ে একই আসনে প্রতিষ্ঠিত। কাব্যের শেষদিকে কবি অনেকটা সাধকের পর্যায়ে উন্নীত। এখানেই কবি অনঙ্গমোহিনীর কবিতার চরম সার্থকতা।

এ কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে সুদূর পার্বত্য ত্রিপুরার এক রাজকুমারী রাজ অন্তঃপুরের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে থেকে কি করে উনিশ শতকের বাংলা মহিলা কবিদের চিন্তাধারার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে সম প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন? অবশ্য একথা ঠিক যে, এর পেছনে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মানসিকতা ও সংযম। তাছাড়া, বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যও এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করেছে। শ্রদ্ধেয় পিতা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের উৎসাহ ও প্রেরণা কবির কাব্য-প্রতিভার উন্মেষে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ও উৎসাহ যে তাঁর প্রতিভার উন্মেষে ফল্গুধারার মতো কাজ করেছিল, তা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই।

ব্যক্তিমনের নিগূঢ়তম অনুভূতি যদি গীতিকবিতার প্রান বলে স্বীকৃত হয়, তবে রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনীর কাব্যগুলিও নিঃসন্দেহে গীতিকবিতার পর্যায়ে পড়ে. গভীর ব্যক্তিক অনুভূতি কাব্যগুলিকে এক বিশেষ মূল্যবোধে উন্নীত করেছে। একটি অন্তরঙ্গ গীতিকবিতার সুর তাঁর কাব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনঙ্গ মোহিনীর কবিতায় শব্দের ঝংকার নেই — নেই কোনো ধ্বনির মাধুর্য, কিন্তু তাঁর অনুভূতির গভীরতা কবিতা-গুলিকে এত স্নিগ্ধ করেছে যে, অতি সহজেই তা আমাদের মনকে স্পর্শ করে।

পরিশেষে বলা যায়, ভাব-ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর বিচারে রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীকে নিঃসন্দেহে ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ কবি বলে চিহ্নিত করা যায়।

—ঃ—

"আভা" কাব্য

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের ঢেউ ত্রিপুরার বুকেও যে এসে পৌঁছেছিল, তার প্রমাণ মেলে ত্রিপুরায় রচিত সাহিত্যে। এর প্রভাব ত্রিপুরার কিছুসংখ্যক মহিলাকবির উপর পড়েছিল। এই সব প্রতিভাসম্পন্ন মহিলাকবিদের মধ্যে শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সভাকবি মদনমোহন মিত্রের কন্যা। কবি কুমুদিনী ত্রিপুরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি অনঙ্গমোহিনী দেবীর সমসাময়িক। কবির প্রকাশিত 'লহরী' ও 'আভা' এই কাব্য দুইটি নিঃসন্দেহে কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লহরী' প্রকাশিত হবার পর সেইসময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবি উচ্চ প্রশংসিত হন। এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে ১৮৮৭ সালের ১২ই মে "The Statement" যে মন্তব্য করেছিল, তা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

"Most of the pieces (twenty in number) were written when the authóress was a mere girl, and both in conception and in the mode of treating the subjects, the book is a capital specimen of its kind and speaks much in favour of the literary attainments of the young authoress."

১২৯৩ সালের ৩রা মাঘ "সঞ্জীবনী" পত্রিকার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য হলো—

> " .... বালিকা কুমুদিনী যেমন গভীর ভাবপূর্ণ দার্শনিক কবিতা লিখিতে পারেন, এমন কবিতা বুঝি আর কোন স্ত্রীলোকের হাত হইতে বাহির হয় নাই। স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনা করিতেছি কেন, দুইজন কবির কবিতা ভিন্ন আর কোথাও তেমন উচ্চ অঙ্গের কবিতা পাঠ করি নাই।"



১২৯৪ সালের ২০শে ভাদ্র 'ঢাকা গেজেটে' এই কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

> "আমরা 'লহরী' আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি এবং অধিকাংশ স্থলেই ভাবের উচ্চতা দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। এরূপ উচ্চঅঙ্গের কবিতা পুস্তক বঙ্গভাষায় বিরল। বাঙ্গালী আজ নভেল নাটকে মত্ত, পাঠকের রুচি অনুসারে গ্রন্থও তাদৃশই প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু লহরী রচয়িত্রী যে ভাব-লইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা অতি গভীর"।

আবার ১২৯৫ সালের ১৬ই মাঘ 'বিবেক' পত্রিকার মন্তব্য হলো—

> "যেসকল গুণ থাকিলে কবিতাকে প্রকৃত কবিতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, লেখিকা পুস্তকের মধ্যে তাহার অধিকাংশ গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অনেক পুরুষ অপেক্ষা এই নারী কবি উচ্চাসনে স্থান পাইবার উপযুক্ত।"

উপরি-উক্ত মন্তব্যগুলি অনুধাবন করলে কবির কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে কোনো দ্বিমত পোষন করা যায় না। কবির 'লহরী' কাব্যটির কোনো সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না বলে কোনো বিস্তৃত আলোচনা এর প্রসঙ্গে করা সম্ভব হলো না।

কবির পরবর্তী কাব্য 'আভা' ১৩১১ বঙ্গাব্দে (১৮৯৮ ইং) কুমিল্লার চাক্‌লা রাধাকিশোর যন্ত্রে শ্রী নীলাম্বর দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। একই সনে কবি অনঙ্গমোহিনীর প্রথম কাব্য 'কণিকা' ও প্রকাশিত হয়েছিল। 'আভা' কাব্যের ভূমিকা লিখেছেন ত্রিপুরার কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অর্থসাহায্যে এই কাব্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে বলে কবি কাব্যটি মহারাজাকে উৎসর্গ করেন এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ উৎসর্গপত্রে বলেছেন—

> "আপনার অনুগ্রহে, ততোধিক আপনার স্নেহে 'আভা' জনসমাজে প্রকাশিত হইল। .... আজ 'আভা'কে মহারাজার শ্রীপাদপদ্মে অর্পন করিয়া কৃতার্থ ও নিশ্চিন্ত হইলাম।"



'আভা কাব্যটি বিষয়-বৈচিত্র্যে ও ভাবগভীরতায় সমৃদ্ধ। মোট ৬৮টি কবিতা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই কাব্যের কয়েকটি কবিতায় কবির নিসর্গ প্রীতি প্রতিফলিত হয়েছে। কাব্যের প্রথম কবিতা 'উষাময়ী'-তে উষাকে কবি একটি প্রানময়ী তপস্বিনী বালিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্রতি দিন আসে উষা বিনোদিনী,
এলান কুন্তল-রাশি,
প্রতিদিন বালা সাজি ফুলসাজে
হাসে গো মধুর হাসি,
প্রতিদিন এসে ঢালেরে রূপসী
রূপের তরঙ্গ কত,
আজিকার মত হৃদয় আমার
হয় নাই উনমত।

পরিশেষে উষার দিগন্তব্যাপী সৌন্দর্যকে কবি উপভোগ করতে চেয়ে বলেছেন—

থাক্ হেতা তুই, থাক উষাময়ি,
অমর হইয়ে দেবী,
অসীম তোমার সৌন্দর্য্য-সাগরে
ডুবিয়ে রহিবে কবি।

পরবর্তী কবিতায় 'উষা'য় কবি উষাকে আবার কল্যাণের প্রতিমূর্তিরূপে চিন্তা করেছেন। দুঃখের রাত্রি অবসানের দ্যোতকরূপে উষা মানবজীবনে যে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়, তা কবি মনে করেন।

আনন্দরূপিনী বালা,
করুনার পুণ্যলীলা,



বারেক নামিয়া আয়, পবিত্র মূরতি দেবী.
উদার ললাট পরে,
রক্তিম জলদাঘরে,
'দুখ-নিশা অবসান' লিখিয়াছে মহাকবি।

'গোধূলি' কবিতায় কবি ধরার বুকে ধীরে ধীরে গোধূলির আগমনের চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন।

শত দীপাবলি উঠিছে উজলি,
মাণিক গোধূলি কোলে,
তড়িৎ জড়িত জলদ কুন্তলে
কনকের আভা খেলিছে চঞ্চলে,
শোভিল গোধূলি ধরনীতলে।

ঘোর অমানিশায় খদ্যোৎ যেমন পথভ্রান্ত পথিককে আলো দেখায়, কবি এই দিশারী খদ্যোৎকে সম্বল করে "খদ্যোৎ" কবিতায় এক উত্তুঙ্গ চিন্তাধারায় উপনীত হয়েছেন। খাদ্যোৎ-এর মতো জগতের সাধুসন্তরাও যে সংসার-বিভ্রান্ত মানুষের মুক্তির প্রশ্নে দিশারীর কাজ করেন— তা নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

পড়িলে অকূলে হেরি তোমাদের মত,
জগতের সাধুবৃন্দে, বিতরে করুণা,
বিধির আশীষ ধরি, আশারূপে অবতরি,
স্বকীয় প্রভায় তারা উজ্জ্বল নিয়ত,
মহান্ সে জ্যোতিষ্কের ক্ষুদ্র জ্যোতিকনা।।

কাব্যের বেশীরভাগ কবিতায় কবির অধ্যাত্মচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি কবিতায় এই সুর বিশেষভাবে স্পষ্ট। বিশ্বনিয়ন্তার মহিমায় যে এই বিশ্বসংসারে জীবন-মৃত্যুর খেলা চলছে, তা কবি উপলব্ধি করেছেন,

তিমিরের স্রোত-পরি সে জ্যোতি আশ্রয় করি,
লভিছে জীবন সবে মৃত্যুর সমাধি'পরে,
শত প্রতিকূল বাতে সে রশ্মি রেখাটি হেরি,
চলিয়াছি অবিশ্রান্ত সংসারের পারাবারে। (আলো ও অন্ধকার)

আবার জাগতিক বিষয়-আশয়ে বিভ্রান্ত মানুষের যে তিনিই বন্ধু, ধ্রুবতারার মতো তিনিই যে মানুষকে মুক্তিপথ দেখান, এই সত্যও কবি উপলব্ধি করেছেন।

'বিষয়ের অন্ধকারে দূরতম লক্ষ্য পথে,
যেন দীপ-শিখা
দিকভ্রান্ত পথিকের সমুজ্জ্বল ধ্রুবতারা,
অকূলের সখা,
আকাঙ্ক্ষাবিহীন এই জীবন উদ্যান হ'তে
তুলি পুষ্পচয়,
যতদিন থাকি ভবে ও পদে অঞ্জলি দিব
নিত্য সুখময়।
(পূজার উপহার)

বিশ্বনিয়ন্তা আজ কঠিন আঘাতের মাধ্যমে কবিকে সংসারের সকল মোহ-বন্ধন থেকে বিমুক্ত করেছেন—

প্রভু মোর যত ছিল বিভব গৌরব,
নিজ হাতে লইল কাড়িয়া,
কঠিন আঘাতে যত মোহের বন্ধনী,
একে একে দিল যে ছিঁড়িয়া।
(অমৃত ধামের যাত্রী)

কবিও এরমধ্যে বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছার সংকেত উপলব্ধি করে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পন করে বলছেন —

"এই আছে প্রাণ মোর লইতে তো পার,
যেথা ইচ্ছা রাখ এ সংসারে,
চলিব আদেশে তব তোমার বলেতে,
এ জগত কি করিতে পারে।
(অমৃতধামের যাত্রি)

কবি সকল জীবের মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তাকে দেখতে পাচ্ছেন—

এই তো তাহার গৃহ মানব আত্মায়,
কেন দূরে-দূরে আর কর বিচরণ,
এইখানে সুখে বসি নেহারিবে তায়,
দেহ হ'তে সন্নিকটে তার নিকেতন।
(ব্রহ্মমন্দির)

কবি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, বিশ্বনিয়ন্তা যেন এই মর্তের প্রতিটি মানুষের হৃদয়-দুয়ারে ভিখারীর বেশে প্রেমপ্রার্থীরূপে বিরাজিত।

মহান্ সে জ্যোতির্ময় রাজ-অধিরাজ যিনি,
মলিন মানব দ্বারে কাঙালের বেশে তিনি,
একি তার প্রেমলীলা   মরতে অপূর্ব্ব খেলা,
(ভিখারী প্রভু)

কবি দেখছেন, এই পৃথিবীতে মূঢ় মানুষ সুখের প্রত্যাশায় ঘর বাঁধে, অথচ এক অদৃশ্য শক্তির সংকেতে এই গড়া ঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

জীবন-উদ্যান মাঝে কভু বাঁধে ঘর,
শোনে কত মধুময় সুখের ঝংকার,
একটি অদৃশ্য হস্ত সবারি উপর,
পলকে ভাঙ্গিয়া সব হয় চুরমার।

(সুখ দুখ)

অথচ এই অদৃশ্য শক্তিই যে সবকিছুর মূলাধার, তা মানুষ ভুলে যায়। এই শক্তির কাছে আত্মসমর্পণেই যে অনন্ত সুখ, মানুষ তা বুঝতে পারে না।

সংসারে সুখের সেতু শুধু সে চরণ,
অর্পিলে আকাঙ্খা সব সে অভয় পদে,
অনন্ত ব্রহ্মান্ড হয় সুখ-প্রস্রবণ,
লভে সে অপার সুখ সম্পদে বিপদে।

(সুখ দুখ)

একান্তভাবে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পন করেও কবি-মনে আবার সংশয় জেগেছে — "তুমি কি আমার?" তবু এই সংশয়কে দূরে রেখে কবি বলছেন—

সমর্পিয়া প্রান মন প্রভুর চরনতলে,
প্রেমমূর্তি নিরখিব তার,
এস তবে একসুরে পাইব অক্ষয় গীত
সত্য সত্য তুমি কি আমার?

(তুমি কি আমার?)

কতকগুলি কবিতায় কবির দার্শনিক মন বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। এই বিশ্ব সংসারে কবি জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এক নিগূঢ় সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন।

একাকার ইহ পরকালে,
সদা মিশামিশি,
জীব পরমের কোলে,
একত্র মিশিয়া খেলে,
অভেদে প্রভেদ যথা
গঙ্গা যমুনার জলরাশি।
(মানবজীবন)

অন্যত্র— সসীমের মাঝে অসীমের শোভা,
সসীম অসীমে লয়,
যুগল মিলনে আহা কি মাধুরী,
ব্রহ্মান্ড ব্যাপিয়ে রয়, (সসীমে অসীম)

কবি এখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অভেদ কল্পনা করে পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয় করে বলেন—

জীব পরমের ভেদ করহ সাধন,
সৎচিৎ আনন্দময় অমৃত পাথার,
অনন্ত মঙ্গলময় ব্রহ্মান্ড কারণ,
কে লিখিবে পরমের স্বরূপ ভান্ডার।
(জীবাত্মা)

বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার লীলা চলছে, সে বিষয়ে কবির কোনো সংশয় নেই।

যবে কাঁদি পড়ি জীব বিষয় গহ্বরে,
চারিদিকে অন্ধকার অতি ঘোরতর,
আপনি হে দীপ ল'য়ে ধর তার করে,
জীব সহ একি লীলা ব্রহ্মান্ড ঈশ্বর।
(জীবাত্মা)



কতগুলি কবিতায় কবি ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যোদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। এখানে তাঁর ধর্মীয় মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। "ভগিনী ডোরা", "সম্রাট আকবর সাহার প্রতি শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর উক্তি", "কুমারী নাইটিংগেলের প্রতি আহত সৈনিকের উক্তি", "মৃত্যুকালে সম্রাট ঔরাংজীবের উক্তি", "হরিদাসের গুনে মুগ্ধ হইয়া শ্রী চৈতন্যদেবের উক্তি" প্রভৃতি কবিতা—গুলি এই শ্রেনীর পর্য্যায়ভুক্ত।

জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগের বিস্তৃত বিবরণ "ভগিনী ডোরা" কবিতায় বিধৃত হয়েছে। ভগিনী ডোরার কর্ম্মময় জীবনকে উপলব্ধি করায় কবির অভিমত হলো—

কর্ম্ম বটে ধরমের প্রাণ,
হারাইলে শুধু রহে শব,
কিসে করে কর্ম্মহীন যোগী
পরম শান্তির অনুভব।

সনাতন গোস্বামী অপূর্ব সাধনাবলে ও গভীর জ্ঞান-ভক্তির মাধ্যমে চৈতন্য মহাপ্রভুর অশেষ কৃপালাভ করেছিলেন। সম্রাট আকবর যে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে উপদেশ গ্রহন করেছিলেন, তা ঐতিহাসিক সত্য। সম্রাট আকবর প্রভু সনাতনকে কিছু দিতে চাইলে তিনি যে উক্তি করেছিলেন, কবি তা সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন।

হে ভূপাল, তব পাশে এইত কামনা,
চাহি একে অভেদ মননে,
আত্মবৎ ভাবি পরজনে,
প্রীতি করি জীবে, তাঁর কর আরাধনা।

(সম্রাট আকবর সাহার প্রতি)

কুমারী নাইটিংগেল নাম আজ বিশ্ব-বিদিত। ক্রিমিয়ান্ সমরক্ষেত্রে যখন অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়, সেই সময় কুমারী নাইটিংগেল তাঁর কয়েকজন সহচরীদের নিয়ে আহতসৈনিকদের শুশ্রূষার্থে সেই সমরক্ষেত্রে যান। তাঁর করুণাঘন মূর্তি কবি শ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। কুমারী নাইটিংগেলকে উপলক্ষ্য করে কবি বলেছেন—

জগৎ প্রীতির ছবি হৃদয়ে যাহার জাগে,
সবাই সোদর সম পরকাশে সেই রাগে,
মরতে অমর সেই,
বিশ্বের চরনে যেই,
আপন রুধির হ'তে বিন্দু বিন্দু করে দান,
মহান্ সে সেবাব্রত সাঁপিয়া আপন প্রাণ,
রক্ত মাংস মিশায় শ্মশানে,
বিশ্ব-প্রেম অক্ষয় ভুবনে,
আপনার তনু বটে কিন্তু রে পরের তরে,
সংসার কল্যাণ হেতু শোনিত ধমনী পরে।

(কুমারী নাইটিংগেলের প্রতি)

পরিশেষে কবির বক্তব্য হলো—

পরসেবা সমব্রত কিবা আছে এ সংসারে,
ঘোষ দেবি, এই মন্ত্র জগতের দ্বারে দ্বারে,
এমন নিষ্কাম কর্ম্ম
সম কি আছে রে ধর্ম্ম,
হেন ব্রত ছাড়ি কিবা জীবনের লক্ষ্য আর,
কোথা আছে রে ভবে এ হেন স্বরগ দ্বার?

(কুমারী-নাইটিংগেলের প্রতি)



গোঁড়া ধার্মিক ঔরঙ্গজেব নিজ স্বার্থে ভ্রাতৃহত্যা ও পিতৃ নির্যাতন করেছেন যা আজ ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে বিবেচিত। আজ কৃতকর্মের জন্য যে অনুশোচনা ঔরঙ্গজেব শেষ জীবনে করেছেন তা কবি কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ঔরঙ্গজেবের অনুতপ্ত কণ্ঠের উক্তি —

বিষকুম্ভ পয়োমুখ বিষয় লালসা,
শুধু সে যে যাতনার হেতু,
সুখ বলি দুখেরই সেতু,
আমি হীন প্রাণ,
সে সুখ সেতুতে পদ করেছি প্রদান।
(মৃত্যুকালে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের উক্তি)

মঙ্গলময় ভগবানের কাছে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই। চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রেও যে তা ছিল না, কবি চৈতন্যদেবের উক্তিতে তা বলেছেন —

লইয়া ভবের ঘাটে চরণ তরণী,
প্রভু সে করুণাসিন্ধু কান্ডারী সদাই,
উচ্চ নীচ ধনী দীন পুরুষ রমনী,
সকল সমান সেথা, জাতি ভেদ নাই।
(হরিদাসের গুণে মুগ্ধ হইয়া)

"মাতৃপূজা", "স্বদেশভক্ত প্রবাসী", "জন্মভূমি" প্রভৃতি কবিতায় কবির স্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় মহোৎসব উপলক্ষে কবি স্বদেশবাসীকে মাতৃপূজার জন্য আহ্বান করছেন।

বাঁধি সবে একতার সুদৃঢ় নিগড়ে
আজেকে সহস্র হৃদি একই বন্ধনে
দাঁড়াইয়া করপুটে মাতৃপূজা আশে,
সুগভীর প্রেমোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হিয়া।   (মাতৃপূজা)



'স্বদেশভক্ত প্রবাসী'র মাধ্যমে কবি আজ মাতৃভূমির জয়গান গাইছেন –

রক্ষিল ভৌতিক দেহ
যে দেশের রবি শশি,
বহে বায়ু বিশ্বপ্রাণ
নিশ্বাসে নিশ্বাসে মিশি।
সে দেশের পদতলে
প্রনমি সহস্ত্রবার,
ধন্য সে জনমভূমি
আমি মার মা আমার।
(স্বদেশভক্ত প্রবাসী)

কবি মনে করেন, স্বদেশবাসী নানাকারণে একতাবদ্ধ না থাকার ফলে জন্মভূমি রত্নপ্রসবিনী হয়েও আজ দীনতার প্রতিমূর্তি। তাই কবিব ব্যথিত মনের অভিযোগ —

জননী রতন প্রসবিনী,
দীনতার তবু হাহা - ধ্বনি,
নাহিক একতা,
নাহি জাগে কোটি স্বর
একটি গভীর তানে,
প্রীতির বন্ধন দিয়া,
কে বাঁধে অযুত প্রাণে।

'আভা' কাব্যে বিভিন্ন ভাবের কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে যদিও, তবুও আধ্যাত্মিক চেতনাই এই কাব্যের মূল সুর। কবি এই বিশ্বসংসারের সর্বত্র মঙ্গলময় ঈশ্বরের সম্প্রসারিত কল্যাণ হস্তকে প্রত্যক্ষ করেছেন, ফলে ভগবৎ ভক্তি সমগ্র কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া মানবপ্রীতি ও ঈশ্বরভক্তি কবি মনের কেন্দ্রীয়



বিষয় বলে কাব্যটি আন্তরিক হয়ে উঠেছে। কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে গীতিকবিতার পর্যয়ভুক্ত। ঊনবিংশ শতকের মহিলাকবিদের কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, স্বপ্নসাধ, প্রেম, নিসর্গপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম ও ঈশ্বর। কবি কুমুদিনী বসুর কাব্যের বিসয়বস্তুও তাই। কিন্তু এইসব বিষয় বস্তুকে ছাপিয়ে কবির 'নিত্য তুমি'র সঙ্গে নিভৃত আলাপই কাব্যে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই 'শৈশব স্বপ্ন' কবিতায় কবি বলেন —

নয়ন ভরিয়া দেখি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি,
সপ্ত স্বরগের শোভা অবনী উপর,
পুণ্য প্রেম পবিত্রতা আনন্দে বিরাজে হেথা,
হেরিব জগত - যন্ত্র - যন্ত্রী মনোহর।

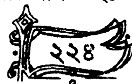
পরমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাকুলতা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভাব ও বিষয়গত বৈচিত্র্যই শুধু নয়, ছন্দোগত বৈচিত্র্যও এই কাব্যের একটি লক্ষনীয় বিষয়। পয়ার, ত্রিপদী, মুক্তক ছন্দের মাধ্যমে কবিতাগুলি হয়েছে বিশেষ প্রাণবন্ত।

'আভা' কাব্যের ভূমিকাংশে এই কাব্য সম্বন্ধে কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মার মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

> "আভা লেখিকার পরিচয় আমি আর কি দিব, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কবিতাতেই প্রতিফলিত হইয়াছে। 'আভা'র প্রায় সমস্ত কবিতাই গভীর ভাবাত্মক অথচ সুখপাঠ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের কবিতার বিষয়গুলি কঠিন হইলেও, লেখিকার গুণে তাহাদের ভিতর অপূর্ব্ব মধুরতার সঞ্চার হইয়াছে। তবে, একথা সাহসপূর্বক বলিতে পারি যে, পাঠক যদি রবির উজ্জ্বল কিরণ, চন্দ্রমার স্নিগ্ধতা এবং খদ্যোতের ক্ষীণ অথচ মধুর ঝিকিমিকি 'আভা'র একত্র সমাবেশ দেখিতে চান, 'আভা'য় সত্য সত্যই তাহা পাইবেন।"

কাব্য বিচারে কবি কুমুদিনী বসু নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রথম সারির মহিলা কবিদের সমকক্ষা বলে পরিগণিত হতে পারেন।



কবিতা সংকলন

শ্রীমতী গিরীন্দ্রবালা দেবী

শ্রীমতী গিরীন্দ্রবালা দেবী ত্রিপুরার একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের কন্যা। পিতা মহারাজ ও ভগিনী অনঙ্গমোহিনীর কবিত্বশক্তির প্রভাব তাঁর উপর পড়ায় তিনি পরবর্ত্তীকালে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। বর্ত্তমানে তাঁর লেখা কিছুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা ত্রিপুরার কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মার বাড়ী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কোনো কোনো কবিতার শেষে সন - তারিখ থাকায় কবিতাগুলির রচনাকালে ১৩২৮ - ১৩৩১ ত্রিপুরাব্দে (১৯১৮ - ১৯২১ ইং) বলে ধরা যায়।

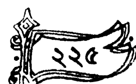
কবি দেবতার চরণে এই বলে প্রার্থনা জানিয়েছেন —

আমি, পবন তাড়িত তৃষিত প্রদীপ
স্তিমিত তৈল বিহনে,
রাখি, কক্ষে তোমার করহে উজল
ভিক্ষা মাগিহে চরণে।
(প্রার্থনা)

ব্যক্তিগত জীবনে কবি যে অপরিসীম দুঃখভারে আনত তা একটি কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

সুখ-শান্তি ভালবাসা
যা কিছু সঁপিয়া তায়,
দুঃখের বোঝাটি নিয়ে
আছি নদী কিনারায়। (দান)

কিন্তু এই দুঃখের বোঝা কবি আর বইতে পারছেন না। তাই শেষ পর্যন্ত দেবতার



চরনে নিজেকে সমর্পন করে বলছেন —

শুধু তোমারি তরে
রবনা রবনা আমি এ ক্ষুদ্র ঘরে।
অসার সংসার পানে আর না চাব,
অসীমে অসীম আমি মিশায়ে যাব,
ডুবিব জন্মের মত ভাব সাগরে
শুধু তোমারই তরে। (তোমারই তরে)

বিশ্বের সর্বত্র মঙ্গলময় বিরাজ করেন, কবি তা জানেন বলে তাঁরই ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতে চান—

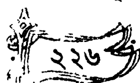
যেমন বিশ্বের আলো বাতাস যেমন,
তেমনিই গো রূপ তার
তেমনই উদার তার প্রশান্ত তেমন,
তাই ভালবাসি তায় থাকিতে মগন। (প্রেমের কামনা)

পরিপূর্ন আত্মসমর্পণের মধ্যে কবি সমগ্র অন্তর দিয়ে মঙ্গলময়কে খুঁজছেন।

কোথা তুমি জীবন নির্ভর,
আছ তুমি কোথা যেন,
শুধু মনেলয় হেন,
কাননে বিজনে খুঁজে দেখি একবার,
অবোধ প্রশান্ত মন বলে বারবার। (নিশীথে)

তাপিত-তৃষিত প্রাণে-শান্তি পাবার আশায় কবি আজ মঙ্গলময়ের দ্বারে উপনীত হয়ে বলছেন—

হে বিভু করুণাময়।
এ অনলে দিবানিশি জ্বলিছে পরাণ,



সকলি ত আছ জ্ঞান।
দুঃখিনীর প্রতি কর কৃপাদৃষ্টি দান,
হৃদি পুড়ে হ'ল ক্ষার,
সহিতে পারিনা আর,
কৃপা করি এ অনল কর হে নির্ব্বান,
তাপিত হৃদয়ে পিতঃ। কর শান্তি দান।
(হতাশের আক্ষেপ)

কবি নিজের দুর্বহ জীবনের জন্য মঙ্গলময়কেই দায়ী করছেন। তাই কবির ব্যথিত মনের অভিযোগ —

আমার বাসনা বিভু কবে তুমি পুরায়েছ,
আশার আবর্তে ফেলি কবে নাহি পুড়ায়েছ।

অতএব— লহ ফিরে লহ আশা, লহ ভক্তি ভালবাসা,
লহ দুঃখ দুর্ব্বিষহ এই দুর্ব্বহ জীবন। (লহ)

কবি তাঁর সব দুঃখের মূলে যদিও মঙ্গলময়কেই দায়ী করছেন, তবু তিনি তাঁর কাছেই নিজেকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান—

নীরব তাহারে অরচনা করি,
নীরবে তাহারি করিব ধ্যান,
নীরবে প্রেমাশ্রু পড়িবেক ঝরি,
নীরবে সে পদে মিশাব প্রাণ। (নীরব)

অন্যত্র—

অনু হ'তে অনু আমি
তুমিও যে মহান স্বামী,



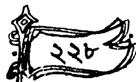
আমিও পেয়েছি ও পূত পদমূল,
একি শুধু ভুল?
না, না অনন্ত জীবনে তুমি
আমারি আরাধ্যাস্বামী,
সাধনায় হব আমি ওই পদধূল,
এত নহে ভুল। (একি শুধু ভুল?)

শেষ পর্যন্ত পরমের দেখা পেয়ে কবির পরিপূর্ণ অন্তর বলে—

তোমারে বেসেছি ভাল, তাই মনে হয়,
আজি বিশ্ব মোর কাছে এত শোভাময়।
....
যে দিকে আঁখি নব অনুরাগে,
যাহা দেখি সবি আজ বড় ভাল লাগে।
আজি পুরাতন বিশ্ব অপূর্ব্ব আলোকে,
নবরূপে উঠিয়াছে ফুটি মোর চোখে। (প্রেমালোক)

কবি গিরীন্দ্রবালা দেবীর কবিতাগুলিতে বিষয়-বৈচিত্র্যের সমারোহ নেই— তা ঠিক, তবু ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখবোধ থেকে এক আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হবার ফলে কবিতাগুলি একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়েছে। দুঃখ-ভারাক্রান্ত কবিহৃদয় শেষপর্যন্ত জীবনের সবক্ষেত্রে মঙ্গলময়ের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করে বলে কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে শান্তরসাশ্রিত। তাছাড়া একটি নিভৃত মনের সহজ অভিব্যক্তিও কবিতাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতাগুলি পাঠ করলে কবির আন্তরিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। চিরাচরিত পয়ারছন্দে কবিতাগুলি লেখা হয়েছে। রাজ-অন্দরের নিভৃতে থেকে ত্রিপুরী মহিলাদের বাংলা ভাষার প্রতি তীব্র অনুরাগের ভিত্তিতে এই কাব্যচর্চা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

— ঃ —



কবি মৃণালিনী দেবীর কাব্যগ্রন্থ

"স্মৃতি"



মহারাজা বীরচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী মৃণালিনী দেবীও বিশেষ কবিত্বশক্তির অধিকারিনী ছিলেন। পিতা ও রাজপরিবারের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রভাব ও প্রেরণা তাঁর কবিত্বশক্তির উন্মেষে সহায়ক হয়েছিল। জ্যেষ্ঠা ভগিনী কবি অনঙ্গমোহিনীর মতো তিনিও পিতার কাছ থেকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা পান। অবশ্য অনঙ্গমোহিনীর মতো কবিত্বশক্তির অধিকারিনী তিনি নন। তবু তাঁর কবিতার মাধুর্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অনঙ্গ মোহিনীর মতো তাঁর কবিতাগুলি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি, পান্ডুলিপি অনূদিত থেকে যায়। মৃণালিনী দেবীব "স্মৃতি" নামে একটি কাব্যগ্রন্থের পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে। কাব্যটিতে কোনো সন - তাবিখ নেই, তবে কোনো কোনো কবিতাব নীচে যে সন - তারিখ পাওয়া গেছে, তাতে বোঝা যায়, এই কাব্যেব কবিতাগুলি ১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৮ সালেব মধ্যে বচিত হযেছিল।

এই 'স্মৃতি' নামক পাড়ুলিপিতে কবিব বচিত "উপহাব", "বর্ষায", "বাঁশী", "জীবন", "পূর্ব্বস্মৃতি", "দূবে", "প্রতীক্ষা" প্রভৃতি কবিতা বযেছে। প্রকাশরীতি ও বোম্যান্টিক ব্যাকুলতার দিক থেকে এইসব কবিতাগুলিব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' ও 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের মিল লক্ষ্য কবা যায।

'উপহাব' কবিতায কবিব ব্যথা-বিধুর অতৃপ্ত প্রাণের আবেগ স্পন্দিত হয়েছে—

ছিন্ন তার ভগ্ন বীণা মাঝে,
ব্যথাভরা যে রাগিনী বাজে,

তুমি কিগো বুঝিবে সে কথা,
হে আমার পাষাণ দেবতা।

আবার 'মানসী' কাব্যের 'উপহার' কবিতায়ও কবিপ্রাণের করুণ আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে —

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র-গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা।

পরিশেষে কবি একান্ত দীনহীনভাবে পাষাণ দেবতার চরণে কুণ্ঠিতভাবে কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন —

আগ্রহ - কম্পিত হৃদি মাঝে,
লুকাইয়ে সসংকোচ লাজে,
এনেছি যা, হোক আকিঞ্চন,
তুমি কি তা করিবে গ্রহণ।
আদরে কি নিবে হাতে তুলি,
এ আমার তুচ্ছ বালি-ধুলি।

'বর্ষায়' কবিতায় বর্ষা কবির চোখে বিরহিনীরূপে প্রতিভাত।

চমকে দামিনী ঘন আঁধার আকাশে,
এ বিরহ তপ্ত হৃদি অন্বেষিছে কার।
ঝরিতেছে বারিধারা অবিরল ধারে,
শুধু মনে পড়ে আজ অশ্রুজল তার।

অবশ্য বর্ষার এই রূপ দেখে কবিমনও আজ উতলা হয়। এই ভরা বর্ষায় কবিমন আজ যেন অন্য কাউকে খুঁজে ফিরছে —

আকাশে ভাসিছে ঐ নীল মেঘরাশি,
আমার পরাণ ভরি উঠিছে হুতাশ।

কিন্তু যাকে খোঁজা হচ্ছে, তিনি কাছে নেই — শুধু আছে তার স্মৃতি, তাই স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত কবিমনের উক্তি —

ঝিল্লি মুখরিত এই বর্ষা রজনী,
এসেছে কি তারি স্মৃতি মূর্তি ধরি আজ।
কত অশ্রু, কত ব্যথা, কত অভিমান,
দেখাতে লুকান ছিল সে হৃদয় মাঝ।

কবির 'বর্ষায়' কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 'বর্ষার দিনে' কবিতার ভাবগত মিল বিশেষভাবে লক্ষনীয়। রবীন্দ্রনাথও দেখা যায়, বর্ষাকে উপলক্ষ করে প্রিয়বিরহে ব্যাকুল হয়েছেন —

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

অন্যত্র —

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
('বর্ষার দিনে' - 'মানসী কাব্য')

'বাঁশী' কবিতায় দেখা যায়, কবি প্রতিদিন বাঁশীর করুণ সুরের মূর্ছনা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন, যেহেতু এই করুণসুরে হৃদয় মথিত করা বিচ্ছেদের হাহাকার ধ্বনিত হয়।

নিতি নিতি সখি   কে বাজায় বাঁশী
বিষাদ করুণ সুরে,
তার মরমের   দুখরাশি যেন
কারে ঘুরি ঘুরি কাঁদিয়া মরে।

কবি ভাবছেন, হয়তো সে মন দিয়ে মন পায়নি, তাই হৃদয়ের গভীর বেদনা উৎসারিত হয়ে বাঁশীর সুরের মাধ্যমে ঝরে পড়ছে।

ভাঙা হৃদিলয়ে   গভীর নিশীথে
তাই বুঝি কেঁদে গায়।
তার ও করুণ   হৃদয় বেদন
শুধু কি বাতাসে মিলাবে হায়।

অবশ্য একই বিচ্ছেদ বেদনার সুর রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'বিরহ' কবিতায়ও লক্ষ্য করা যায় —

ওই   বাঁশিস্বর তার আসে বারবার,
সেই শুধু কেন আসে না।
এই   হৃদয়-আসন শূণ্য যে থাকে,
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।

আবার একই ভাবধারা 'মানসী' কাব্যের 'একাল ও সেকাল' কবিতায়ও প্রতিফলিত।



এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে

এখনো প্রেমের খেলা
সারা নিশি সারা বেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে।

কবি একটি মেয়ের জীবনকে ঘিরে মানবজীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও অন্তিম এই চারটি স্তরকে প্রত্যক্ষ করে বাস্তব জীবনদর্শণকে 'জীবন' কবিতায় প্রতিফলিত করেছেন। কিন্তু কবির চোখে জীবন কঠোর নয় — কোমল। একদা একটি শিশুর কচি মুখটি দেখে কবির মনে হয়েছে — "ক্ষুদ্র বন যূথিকার মত।" এই শিশুকে আবার কিশোরী অবস্থায় দেখে কবির মনে হলো —

আধফোটা ওই মালতী যেমন,
মধুর বাতাসে উঠিছে শিহরি,
তেমনি লাজেতে চকিত নয়ন।

আবার তাকে দেখলেন যৌবন-মধ্যাহ্নে। তখন কবির মনে হয়েছে —

সরসীর নীরে যথা শতদল।
পরিপূর্ণতর সৌন্দর্য বিভবে,
প্রশান্ত প্রভায় স্থির সমুজ্জ্বল।

শেষবার তাকে জীবন-সায়াহ্নে অন্তিম শয্যায় দেখে কবি ভাবেন —

সেই শেষদিন — অন্তিম শয্যায়,
নিষ্কলঙ্ক শুভ্র, পরিমল-ময়,
শারদ প্রভাতে শেফালী প্রায়।



'পূর্ব্বস্মৃতি', 'দূরে', 'প্রতীক্ষা' এই তিনটি কবিতায় প্রিয়বিরহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। 'পূর্ব্বস্মৃতি' কবিতায় কবি অতীত-স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়েছেন —

অতীতের কত স্মৃতি,
সেই বিদায়ের গীতি,
বারবার শুধু মনে পড়ে।

অতীত মিলন-স্মৃতি প্রসঙ্গে কবির মনে পড়ছে, এমনি এক বসন্তবেলায় কবি এই প্রকৃতির ক্রোড়ে দয়িতের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন —

মৃদুল মধুর বায়,
ধীরে ধীরে বয়ে যায়,
দাঁড়াইয়াছিনু দুইজনে।

অথচ আজ সবকিছু ঠিক তেমনই আছে — শুধু তিনি নেই। আজ দয়িতের সঙ্গে কবির দুস্তর ব্যবধান।

সেই বকুলের মূলে,
সেই সরসীর কূলে,
আজো সেই কুসুম-কানন।
সকলি তেমনি আছে,
কেবল মোদের মাঝে,
ব্যবধান সহস্র যোজন।

তাই এই নির্জন একাকীত্ব আজ কবিমনকে ব্যথিত করে তোলে।

বীণার করুণ রাগিনী শুনে কবিমনের বেদনার্ত অবস্থা 'দূরে' কবিতায় প্রকট হয়ে উঠেছে। অতীতের সুখময় দিনগুলি এখনও কবির চোখে স্বপ্নময়রূপে প্রতিভাত। তাই অতীতের সুখস্মৃতি কবিমনকে আন্দোলিত করে।



অতীতের স্মৃতি মাঝে স্বপ্ন আবরণে ঢাকা,
সে সুরও এমনি বুঝি মিনতি বেদনামাখা।

কবি আজও বেদনার্ত মন নিয়ে তার প্রতীক্ষায় রত। কবে যে এই প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে, তা তিনি জানেন না বলে এক অজানা ব্যথায় মন ভরে ওঠে।

আলোতে ছায়াতে মেলা,
ঝিকিমিকি করে বেলা,
অলস দীরঘ দিন
যেন না ফুরায়।
....
হৃদয় ভরিয়া ওঠে
অজানা ব্যথায়।

ত্রিপুর রাজ পরিবারের অনেকের বিশেষ করে রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী ও রাজকুমার নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মার সাহিত্যকর্মে আমরা রবীন্দ্রপ্রভাব ইতিঃপূর্বে লক্ষ্য করেছি। কবি মৃণালিনী দেবীর কবিতাগুলিতেও রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতার প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষনীয়। তাছাড়া প্রকাশভঙ্গী ও ভাষারীতির দিক থেকেও একই মিল রয়েছে বলে অনুমেয়।

কাব্যটিতে বিভিন্ন ভাবের কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। অধিকাংশ কবিতায় বেদনার সুরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি অনঙ্গমোহিনীর 'শোকগাথা' কাব্যে হারানোর বেদনার যে তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়, কবি মৃণালিনী দেবীর কবিতায় সে তীব্রতা নেই বরং হৃদয়ের বেদনা এখানে অত্যন্ত সংযত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাগুলির কোথাও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য নেই — নেই কোনো উপমা-অলংকারের প্রাচুর্য, অথচ কবির শান্ত ও সংযত মনোভাব কবিতাগুলিকে করেছে স্নিগ্ধ ও মাধুর্যমন্ডিত। মানবপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রেম কবির কাব্যে এক স্বতন্ত্ররূপ নিয়ে প্রতিভাত। হয়তো কবির লেখা আরও কবিতা আছে, যা আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। তবে যে কয়টি কবিতা আলোচিত হয়েছে, সেগুলির মূল্য বড় কম নয়।

— ঃ —

রাজকুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মার

কবিতা ও সঙ্গীত সংকলন

ত্রিপুর রাজবংশের কবিতা ও সঙ্গীত রচনার সুষ্ঠু প্রয়াস মহারাজা বীরচন্দ্রের আমল থেকে শুরু হয়। এর প্রভাব পরবর্ত্তী রাজাদের-রাজকুমার ও রাজকুমারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। মহারাজা রাধাকিশোরের পুত্র ও একদা প্রখ্যাত ত্রিপুরার 'রবি' সাহিত্য পত্রের সম্পাদক রাজকুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা কিছু সংখ্যক বিভিন্ন ভাবের কবিতা ও সঙ্গীত রচমা করেন, যেগুলি পরবর্ত্তীকালে ত্রিপুরায় 'রবি' পত্রিকা ও 'ফাল্গুনী' (প্রকাশকাল-১৩২৬ ত্রিং) নামে সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাছাড়া রাজকুমার নরেন্দ্রকিশোরের একটি সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থও রাজকুমার বিক্রমেন্দ্র কিশোর দেব্বর্মা কর্তৃক ১লা শ্রাবন, ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দে (১৯৪৭ ইং) প্রকাশিত হয়।

ত্রিপুর রাজারা নিঃসন্দেহে বৈষ্ণবীয় ভাবে অনুপ্রানিত। বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর, বীরেন্দ্র কিশোর প্রমূখ মহারাজারা বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় প্রচুর রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীতে রচনা করেন। রাজকুমার নরেন্দ্রকিশোরও এই ভাবধারায় কিছু সংখ্যক কবিতা রচনা করেছেন।

একটি সঙ্গীতে কবি সুন্দর উপমা সহযোগে রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন।

সুনীল অম্বর, শ্যামসুন্দর, তরুণ-অরুণ-রাই।
দিবস যামিনী, শ্যামবিনোদিনী, দেখি বলিহারী যাই।।
নীল সাগর, অতল অপার, রাই বিমনা জাহ্নবী।
মুদিলে নয়ন, কালবরণ, মেলিলে উজলা মাধবী।।

আবার রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপে যে চৈতন্যদেব ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই রূপ সুন্দরভাবে কবিতার শেষদিকে অভিব্যক্ত।



ঐ দক্ষিণ বাম, মোর রাধাশ্যাম, কান্ত-কামিনী সোই
অপরূপ একি, বিপরীত দেখি, মিলন বিরহ দুই।।
উভয়স্বরূপে, দ্বন্দ্বাতীত রূপে, উদিলা চৈতন্যপ্রভু।
অধম পামর, অভাগা কিশোর, দেখিতে পেলনা কভু।।

আর একটি কবিতায় কবি কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনায় বলছেন—

হরি অনুরাগী রাধা।
মধুরিপু মোহিনী রমণী শিরোমণি
মাধব মুরলী সাধা।।
কুমুদিনী চুম্বই অলি অনুধাবই
রেনু কষায়িত দেহা।
পুলক প্রমোদিনী চললি সুহাসিনী
বিছুরিলা নিজ গেহা।।
পিত কৌমুদীসনে মিলাইলা আপনে
শ্যাম তনময়ী রাধা।
আজুক অভিসারে ভনতহি কিশোরে,
কছুন রহল বাধা।।

কবিতাটির গঠন কৌশলে পদাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট।

'রবিমঙ্গল' কবিতায় কবির সূর্যের অপার মহিমা বর্ণনা এক কথায় অপরূপ।

উদয় তোমার উজলিতে ধরা,
রহিবে চির উজ্জ্বল।
— উদয়াচলের নাইরে সীমানা,
কোথা তবে অস্তাচল?



'একটি কমল' কবিতায় কবি কমলের সৌন্দর্য ও গুণ ব্যাখ্যায় বলেন —

তুমি বিকশিত শত শতদল মাঝে একটি কমলগো,
সৌরভ সৌন্দর্য্যে ভরা।
তুমি প্রমত্তা!
মোর করায়ত্তা!
তবু আছ জলে চির কুতূহলে,
অনাঘ্রাতা-মনোহরা!
যুগে যুগে তুমি শির-অধিষ্ঠিতা,
জয় জয় গঙ্গা জগত বন্দিতা!
তুমি রজকিনী,
প্রেম-স্বরূপিনী,
তোমারি বিকাশে, তব কলহাসে
অমল-ধবল-ধরা।

রাজকুমার নরেন্দ্রকিশোর ছিলেন ভক্তকবি। তাঁর কবিতাগুলি অনুধাবন করলে স্পষ্টতঃ মনে হয়, তিনি যেন সবকিছুর মধ্যে মঙ্গলময়কে প্রত্যক্ষ করেছেন।

শরদিন্দু কুন্দ দ্যোতি
যেমন ধরায় সাজে,
তোমার রূপ ফুটে শুধু
সকল রূপের মাঝে।
তোমার স্নিগ্ধ শান্ত ছায়া
আপন করা গভীর মায়া
যায় দিয়ে যায় প্রাণের পরে
অসীম সার্থকতা।



অন্য একটি কবিতায় —

রূপেতে তোমার ফুটিল সূর্য্য
তুমি সকল রূপের মূল,
রসেতে তোমার ক্ষরিল পীযূষ
অকূল পাইল কূল।
গন্ধে তোমার ভরিল বিশ্বে
দূরিত সকল বাধা।

কয়েকটি গানে আবার কবির বিবাগী মনের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির বাউল মন গাইছে —

আমায় নিবি কেগো, রাখবি ধরে —
আমি থাকি সবার ঘরে ঘরে, দোরে দোরে।
না জানার ঐ আড়াল ঘিরে,
সে থাকে যমুনার তীরে,
মন উদাসী শুনে বাঁশী
তারে দেহমন সঁপলে পরে।

কবির কাছে ব্রজের প্রেমই একমাত্র কাম্য - -

যদি ঘর করতে ইচ্ছা কর
আগে গিয়ে মানুষ ধর।
কাম থাকিতে প্রেম হবে না,
ব্রজ গোপীর ভাব বিনে।-

কবি নরেন্দ্রকিশোরের কবিতা ও সঙ্গীতগুলিতে ভাবের গভীরতা বিশেষভাবে লক্ষনীয়। তিনি সহজভাষায় প্রাণের আবেগকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলি একটি আত্মবিস্মৃত মনের পরিচয় বহন করে।

— ঃ —

“গীত চন্দ্রেদয়”

কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী

আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ লাইব্রেরীতে নরহরি চক্রবর্ত্তীর নামে হস্তলিখিত ‘‘গীত চন্দ্রোদয়’’ — ১ম ও ২য় (পুঁথি সংখ্যা - ৬৫ ও ৬৬) দুইটি খন্ড পাওয়া গেছে। খন্ড দুইটি কোনো মূল পুঁথির নকল। পুঁথিতে লিপিকরের নাম এবং সন-তারিখের কোনো উল্লেখ নেই। তবে ভনিতায় নরহরি চক্রবর্ত্তীর নাম রয়েছে। যেমন —

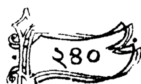
ক) নরহরি অভিলাস করয়ে সদাই,
গৌরকৃষ্ণ রাইরূপ যতনে ধেয়াই।

খ) কিবা মউর চন্দ্রিকা মাথে।
কহে নরহরি হেরি কুলবতি,
দাঁড়াল কলংক পথে।

প্রথম খন্ডে ‘‘গৌরচন্দ্রিকা’’ ও শ্রীরাধার ‘‘পূর্বরাগ’’ এবং দ্বিতীয় খন্ডে শ্রীরাধার ‘পূর্বরাগ’ সহ ‘‘সম্ভোগ’’ বর্ণিত হয়েছে। পদগুলি গান্ধার, সিন্ধুরা, বেলাবলী, মল্লার প্রভৃতি রাগ সম্বলিত। অধিকাংশ পদ ত্রিপদী পয়ার ছন্দে লিখিত।

পদকর্তা নরহরি চক্রবর্ত্তী ত্রিপুর রাজ দরবারে এসেছিলেন কিনা, বর্তমানে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে এই নকল করা পুঁথি তাঁর দ্বারা লিখিত বলে স্থিরনিশ্চয় হবার উপায় নেই। ত্রিপুরার মহারাজারা ছিলেন বৈষ্ণব। ঊনিশ শতকে বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাবে ত্রিপুরায় রাজ দরবারে রাজাদের প্রচেষ্টায় বহু বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতিলিপি করা হয়। মনে হয়, ‘গীত চন্দ্রোদয়’ — ১ম ও ২য় খন্ডের নকল এই প্রেরণায়ই করা হয়েছে।

— ঃ —



উনকোটি তীর্থ প্রসঙ্গে বিভিন্ন রচনা

ত্রিপুরার সুপ্রাচীন তীর্থগুলির মধ্যে উনকোটি অন্যতম। এটি ত্রিপুরার একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। এই তীর্থটি ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাংশে অবস্থিত ও কৈলাসহর উপবিভাগের অন্তর্গত।

উনকোটি তীর্থ সম্বন্ধে ত্রিপুরায় অনেকে লিখেছেন। একদা আমেরিকান জেনেটিক এসোসিয়েসন, ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল সোসাইটিও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য প্যারীমোহন দেবর্ব্বমা এই উনকোটি তীর্থ পরিদর্শন করে ''উনকোটি তীর্থ'' (১৯২১ইং) নামে একটি গ্রন্থে নিজ অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিঃপূর্বে ত্রিপুরার ভূতপূর্ব মন্ত্রী ধনঞ্জয়চন্দ্র দেববর্মা ঠাকুরের লেখা ''উনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য'' নামে একটি পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে এই পুস্তিকাব কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়া চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লেখা ''শ্রী শ্রীযুতের কৈলাসহর পরিভ্রমন'', কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত লিখিত ''রাজমালা-দ্বিতীয়লহর'' এবং রাজকুমার সমরেন্দ্র দেবর্ব্বমার ''ত্রিপুরার স্মৃতি'' গ্রন্থে উনকোটি তীর্থ সম্বন্ধে বিস্তাবিত আলোচনা করা হয়েছে। ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার থেকেও ১৯৭১ সালে উনকোটি তীর্থ সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এইসব গ্রন্থে উনকোটি তীর্থেব প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিক ভিত্তি, মূর্তিগুলির প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য এবং তীর্থের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাতের চেষ্টা কবা হয়েছে।

উনকোটি তীর্থেব নামকরণ প্রসঙ্গে দুইটি কিংবদন্তী বহুকাল ধরে ত্রিপুরার জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিংবদন্তী দুইটি হলো—

> ১) ''একদা দেবগন কৈলাস হইতে কাশীধাম গমন মানসে সদলবলে যাত্রা করিলে দিবা অবসানে পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এখানে আসিয়া বিশ্রাম করেন। সূর্য্যেদয়ের পূর্ব্বেই তাঁহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন বলিয়া স্থির ছিল। কিন্তু সে রজনীতে একমাত্র



দেবাদিদেব বিশ্বনাথ মহাদেব ব্যতিত অন্যসকল দেবতারাই পথশ্রম জনিত ক্লান্তি হেতু নিদ্রায় অতিরিক্তরূপে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া এবং পরদিবস প্রত্যুষে কাক ও যথারীতি প্রভাত সূচক ধ্বনি করিয়া নিদ্রাভঙ্গে সহায়তা করে নাই বলিয়া নিদ্রিত অপর দেবতাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া মহাদেব একাকী প্রত্যুষে কাশীধামে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। শাস্তিস্বরূপ কাক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। কাক সহ দেবতারা সকলেই প্রস্তরীভূত হইলেন। কোটি দেবতারা মধ্যে একমাত্র মহাদেবের অভাবে স্থানটি প্রকৃত কাশীতে পরিনত হইতে পারে নাই— তাই ইহার নাম হইয়াছে ঊনকোটি তীর্থ''।

২) অন্য কিংবদন্তীটি হলো— ''জনৈক মহাত্মা এ স্থানে দ্বিতীয় কাশীধাম স্থাপন মানসে কোটি দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে একটির নির্ম্মাণকার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাওয়ায় তিনি পূর্ণ-মনষ্কাম হইতে পারেন নাই। এই হেতু নাকি ইহার নাম হইয়াছে 'ঊনকোটি তীর্থ''। —
(ঊনকোটী-তীর্থ — প্যারীমোহন দেববর্মা — পৃষ্ঠা-১২-১৩)।

ঊনকোটি নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। তবে এর সঠিক প্রাচীনত্ব নির্নয় করা আজ সত্যই দুরূহ। ইতিহাসও এই প্রসঙ্গে নীরব। এই তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা কে বা কারা — এই সম্পর্কেও কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, তবে প্যারীমোহন দেবর্বমার বক্তব্য হলো--

''স্থানটির অবস্থান ও দুর্গমতা, মূর্ত্তী নির্মানোপযোগী উপাদানের অভাব, মূর্তিগুলির সংখ্যা ও কোন কোনটির বিরাটত্ব, পার্শ্বস্থ অপর একটি শৃঙ্গে এরূপ আরও বহু মূর্ত্তির সমাবেশ প্রভৃতি বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এরূপ বিরাট ব্যাপার প্রাচীনকালে বিশেষ উন্নত ও ধর্ম্মপ্রাণ এবং প্রবল

প্রতাপান্বিত প্রভূত ধনবান ও জনবল সম্পন্ন কোন রাজ্যেশ্বর ব্যতীত অন্য সাধারণ লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত ও সংসাধিত হইতে পারে নাই।"— (ঊনকোটি তীর্থ— পৃষ্ঠা—১৫-১৬)

ঊনকোটি তীর্থের নানা জায়গায় পাথরের গায়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে। এছাড়া পর্বতের গায়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নানারকমের পাথরের দেবমূর্তি দৃষ্টিপথে উদিত হয়। এইসব দেবদেবীমূর্তির মধ্যে ঊনকোটীশ্বর শিব, হর-গৌরী, বিষ্ণুপদ, কালভৈরব, বাসুদেব, রাক্ষস-রাক্ষসীমূর্তি, হনুমান, পঞ্চ-মুখ শিব, গণপতি, চতুর্মুখবিশিষ্ট মূর্তি, লক্ষ্মী, রাবণ, রাম-লক্ষণ, শিবলিঙ্গ এবং চন্দ্র ও সূর্যমূর্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নানা রকমের অসংখ্য মূর্তি ভগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্তমানে এইসব মূর্তিগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অযত্নের ফলে ধ্বংসের দিকে ধাবিত।

তবে মূর্তিগুলি একসময়ে একব্যক্তির দ্বারা নির্মিত হয়নি। কারণ মূর্তিগুলি একই ধরনের নয়। কোনটির শিল্পচাতুর্য বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না, আবার কোন মূর্তির শিল্পচাতুর্য এক কথায় অপূর্ব। মূর্তিগুলি বিশেষভাবে অনুধাবণ করলে মহাদেবের মূর্তিটিকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে হয়। ফলে এরূপ ধারণা হয় যে, শৈবধর্মের প্রাধান্যে প্রথমে এই তীর্থ গড়ে ওঠে এবং পরবর্ত্তীসময়ে অন্যান্য ধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে সেইসব ধর্মের প্রভাবস্বরূপ বিভিন্ন মূর্তি এখানে সংস্থাপিত হয়। এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত 'ঊনকোটী' পুস্তিকায় বলা হয়েছে—

"এই শৈবক্ষেত্রের প্রকৃত উদ্ভবকাল আজও নির্নীত হয়নি, তবে এইটুকু বলা যায় যে, বৌদ্ধযুগের পূর্বেই বোধহয় এই ধর্মক্ষেত্রটি স্থাপিত হয় এবং এই শৈবক্ষেত্র পরবর্তীকালে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। শিবমূর্তি ছড়াও বৈষ্ণব, গাণপত্য সৌর, বৌদ্ধতান্ত্রিক আর্যেতর আদিবাসী এবং কৌলধর্ম সঞ্জাত নাথপন্থী প্রভাবিত বিভিন্ন মূর্তির অস্তিত্ব থেকে একথাই প্রমানির্ত হয় যে,

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ শৈবদের অনুসরণে এই শৈলতীর্থে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধ্যানসম্মত মূর্তি স্থাপনে সচেষ্ট হন।''—(পৃষ্ঠা—৬)

ঊনকোটি তীর্থের ইতিহাস আজও আবৃত। শুধু চোখে দেখে কোনো মতামত ব্যক্ত করা সত্যই দুরূহ। এই তীর্থের মূর্ত্তিগুলির ইতিহাস আজ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে, তা যথাযথ বলে ধরে নেওয়া যায় না, কারণ প্রত্যেকেই যার যার নিজস্ব চিন্তা-বুদ্ধিগত অনুমানকে প্রামান্য বলে জনসমক্ষে তোলে ধরেছেন।

আজ ঊনকোটি তীর্থকে কেন্দ্র করে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন। যে পাথরের এইসবমূর্ত্তিগুলি খোদিত বা তৈরী হয়েছে, তার বয়স নির্ধারণ এবং শিল্প-বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে মূর্তিগুলির উদ্ভাবকাল সম্পর্কে আলোকপাত করা মনে হয় বিশেষজ্ঞদের পক্ষে খুব দুরূহ ব্যাপার নয়।

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার মিলনক্ষেত্র রূপে এই অবহেলিত ঊনকোটি তীর্থ চিরদিন জনমানসে শ্রদ্ধা ও ভক্তির মাধ্যমে স্মরনীয় হয়ে থাকবে।

— ঃ —

পঞ্চমাণিক্য

কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ

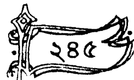
ত্রিপুরার মহারাজাদের জীবনচরিত গ্রন্থ 'রাজমালা'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ ত্রিপুরার একজন প্রসিদ্ধ লেখক। বিভিন্ন বিষয়ে লেখনী ধারণ করে তিনি ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে 'রাজমালা' সম্পাদনা তাঁর একটি বড় সাহিত্যকীর্তি বলে পরিগনিত হয়।

কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের 'পঞ্চমাণিক্য' গ্রন্থটি ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে (১৯৪১ইং) প্রকাশিত হয়। প্রথমে ''বার্ষিক ত্রিপুরা'' নামে একটি বার্ষিক পত্রিকার প্রয়োজনে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের পাঁচজন স্মরনীয় মহারাজার জীবনী অবলম্বনে ''পঞ্চমাণিক্য'' নাম দিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করেন। কিন্তু কোনো কারনে তা প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীকালে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আদেশে ও আনুকূল্যে এই গ্রন্থটি ছাপা হয়।

লেখক ক্রমানুসারে মহারাজা ধর্মমাণিক্য ধন্যমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, কৃষ্ণমাণিক্য ও বীরচন্দ্র মানিক্য এই পাঁচজন বিদ্যোৎসাহী গুনবান মহারাজার জীবনী ও কীর্তি-কাহিনী এই গ্রন্থে বিধৃত করেছেন।

ধন্যমাণিক্যঃ—

লেখক প্রথমে মহারাজা ধর্মমাণিক্য কিভাবে বিভিন্ন দুর্যোগময় অবস্থাকে অতিক্রম করে ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহন করেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। অল্পবয়স থেকে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকার ফলে তিনি রাজর্ষির ন্যায় নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁর সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ধর্ম তাঁর জীবনের ব্রত ছিল বলে রাজ্যে দেবালয় স্থাপন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, ভূমিদান ইত্যাদি বহু ধর্মমূলক কাজ তিনি করেছিলেন। ১৩৮০শকে (১৪৫৮ খ্রীঃ) তিনি কুমিল্লা নগরীতে নিজ



নামানুসারে ''ধর্মসাগর'' দীঘির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই উপলক্ষে কৌতুক নামে এক কনৌজী ব্রাম্মণ ও শুক্রেশ্বর-বানেশ্বর নামে শ্রীহট্ট-নীবাসী ব্রাম্মণদের তিনি তাম্রশাসনের মাধ্যমে ভূমিদান করেন। বানেশ্বর পরবর্তীসময়ে রাজপুরোহিত ও রাজসভাপন্ডিত ছিলেন। অনুজ শুক্রেশ্বরের সহযোগিতায় তিনি পরবর্তীকালে ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস 'রাজমালা' সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। এই ধর্মসাগর দীঘি প্রতিষ্ঠা এবং 'রাজমালা' গ্রন্থরচনা মহারাজা ধর্মমাণিক্যের এক অতুলনীয় কীর্তি-যে কীর্তির মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরার ইতিহাসে চিরস্মরনীয় হয়ে রয়েছেন। ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

ধন্যমাণিক্য ঃ—

মহারাজা ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধন্যমাণিক্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিপর্যস্ত হবার পর অবশেষে ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন।

মহারাজা ধন্যমাণিক্যের সেনাপতি রায় কাচাক ত্রিপুরার ইতিহাসে একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বলে পরিচিত। মহারাজা ধন্যমাণিক্য এই রায় কাচাকের সহায়তায় বঙ্গদেশ ও চট্রগ্রাম জয় করেন এবং খন্ডল দেশকে বশীভূত করেন। তাছাড়া মহারাজা নিজেও অত্যন্ত শৌর্যবীর্যশালী এবং ধার্মিক ছিলেন। ভূমিদান, জলাশয় স্থাপন, দেবালয় নির্মাণ ও দেবতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বহু সৎকাজের মাধ্যমে তিনি স্মরনীয় হয়ে রয়েছেন। একমন সোনায় শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি নির্মাণ তাঁর একটি স্মরনীয় কীর্তি। বর্তমানে অবশ্য এই মূর্তির কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ মূসলমান বা মগ্ আক্রমণ কারীদের দ্বারা মূর্তিটি লুন্ঠিত হয়। পীঠদেবী শ্রী শ্রী ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা মহারাজা ধন্যমাণিক্যের আর একটি উজ্জ্বল কীর্তি। মন্দির গাত্রের শিলালিপি থেকে জানা যায় —এই মন্দির ১৪২৩শকে (১৫০১খ্রীঃ) নির্মিত হয়। তিনি চট্রগ্রাম থেকে দেবীকে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। উদয়পুরের মহাদেববাড়ী, চতুর্দশদেবতার মন্দির ও শ্রী শ্রী স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা ধন্যমাণিক্যের অন্যতম কীর্তি।

উদয়পুরের সুবিশাল 'ধন্যসাগর' মহারাজা ধন্যমাণিক্যের আর একটি স্মরনীয় কীর্তি। ধন্যমাণিক্যের মহিষী কমলাদেবী নিজ নামে কসবার সুবিখ্যাত কমলাসাগর দীঘি খনন করান। তাছাড়া উদয়পুরের কয়েকটি দেবমন্দির ও তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়।

মহারাজা ধন্যমাণিক্য বাংলাভাষার বিশেষ পৃষ্টপোষক ছিলেন। তাঁর সময় থেকেই রাজদরবারে ও জনসাধারনের মধ্যে বাংলা ভাষা বিশেষ প্রসারলাভ করে। মাহারাজার আদেশে রাজদরবারে 'প্রেতচতুর্দশীর গীত', 'রামায়ণ', উৎকলখন্ডের পাঁচালী', 'যাত্রারত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমানে এইসব গ্রন্থের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। মহারাজা ধন্যমাণিক্যের সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তিনি ত্রিহুত রাজ্য থেকে সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্যশিল্পীদের এনে নিজ রাজ্য সঙ্গীত ও নৃত্যশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৪৩৭ শকে (১৫১৫খ্রীঃ) বসন্ত রোগে মহারাজা ধন্যমানিক্য পরলোক গমন করেন।

বিজয়মাণিক্যঃ—

মহারাজা ধন্যমাণিক্যের প্রপুত্র বিজয়মাণিক্য বিভিন্ন রাজনৈতিক গোলযোগ অতিক্রম করে ১৪৫০শকে (১৫২৮খ্রীঃ) সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যা লক্ষ্মীবালা দেবীকে বিবাহ করেন। প্রথমবস্থায় তিনি নামে রাজা ছিলেন। রাজ্যের সর্ববিধ ক্ষমতা ছিল দৈত্যনারায়ণের হাতে। দৈত্যনারায়ণ ও তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্লভনারায়ণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত মহারাজা বিজয়মাণিক্য কৌশলে তাদের হত্যা করে সম ক্ষমতা আবার নিজহাতে ফিরিয়ে আনলেন।

তিনি খাসিয়া রাজ্যের কিছু অংশ ও শ্রীহট্ট প্রদেশ জয় করেন। তাছাড়া জয়ন্তিয়ারাজকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। তারপর চট্রগ্রাম বিজয়ের জন্য দুই হাজার সৈন্য প্রেরণ করলেন, কিন্তু পাঠান সৈন্যরা পথে বিরোধিতা করায় তিনি তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন।

সেই সময় বাংলার সুলতান ছিলেন সুলেমান কররানী। তিনি পাঠানদের দুর্গতির সংবাদ পেয়ে নিজ শ্যালক ও সেনাপতি মমারক খাঁকে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও দশ হাজার পদাতিক সৈন্য বিজয়-মাণিক্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়মাণিক্যই জয়ী হলেন। তাছাড়া গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহও তিনি অধিকার করেন।

মহারাজা বিজয়মাণিক্য অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি একাধারে বীর, যোদ্ধা ও ধার্মিক ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্টিত হীরা গোপীনাথ বিগ্রহ ও এই বিগ্রহের গগনস্পর্শী পাথরের মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি এখন বিধ্বস্ত। মন্দিরের পাথরের ফলকটি এখনও অরন্যের মধ্যে পড়ে আছে। এই ফলকে মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ আছে। লিপিপাঠে জানা যায়, মন্দিরটি ১৪৭০ শকে (১৫৪৮ খ্রীঃ) নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া তিনি ভূমিদান, তুলা-পুরুষদান ও কল্পতরুদান প্রভৃতি সৎকাজ করেন। মহারাজা বিজয়মাণিক্যের মহিষী লক্ষ্মী দেবীও হোমনাবাদে বহু ভূমিদান ও তিষ্ণা পরগনায় জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রানীর নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয় লক্ষ্মীপুর, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে উদয় মাণিক্যের মহিষী হীরাদেবী এই নাম পাল্টে নিজ নামানুসারে নামকরণ করেন হীরাপুর। শিল্পের উন্নতির জন্য মহারাজা বিজয়মাণিক্য বঙ্গদেশ থেকে নানা শ্রেণীর শিল্পীদের এনে রাজ্যে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করেছিলেন। পরিশেষে ১৪৯২ শকে (১৫৭০ খ্রীঃ) বসন্ত রোগে মহারাজা মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণমাণিক্যঃ—

মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের জীবনকাহিনী পূর্বে 'কৃষ্ণমালা' নামে জীবনচরিত কাব্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই বাহুল্যবোধে তাঁর প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা হলো না।

বীরচন্দ্র মাণিক্যঃ—

মহারাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা যুবরাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য নির্বিবাদে সিংহাসনে আরোহন করতে পারেন নি। সিংহাসনের অন্যান্য দাবীদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ব্রিটিশ হাইকোর্টের ডিগ্রী অনুযায়ী ১২৭৯ ত্রিপুরাব্দের ২৭শে ফাল্গুন (১৮৭০খ্রীঃ ৯ই মার্চ) তারিখে তিনি রাজ্যভিষিক্ত হন।

মহারাজা বীরচন্দ্র ১৮৩৯ খ্রীঃ ২৫শে মার্চ কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রাচ্যনীতির বিশেষ পক্ষপাতি। কারও হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ফলে ব্রিটিশ গভর্মেন্টের সঙ্গে বিবাদ শুরু হলো। রাজত্বের সূত্রপাতেই coronation শব্দটি নিয়ে দুই গভর্মেন্টের মধ্যে বিরোধ বাধে। ব্রিটিশ গভর্মেন্টের প্রতিনিধির বক্তব্য হলো যে crown শব্দ থেকে coronation আসায় British crown এর নিম্নতম ব্যক্তি এই শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না। মহারাজা এর যোগ্য উত্তর যা দিয়েছিলেন, তা মহারাজার কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মার লেখা গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

> "আমি Crown রূপী তাজ মাথায় দেই না, কিন্তু মুকুট ধারণ করি প্রজার জন্য। .... 'সিংহাসন' দেখিলেই মনে হইবে, সিংহমূর্ত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যে আসন প্রস্তুত হয়, তাহাই সিংহাসন। ইহা দেবতার আসন, দেবাসন ব্যতীত অন্য কোন আসনে হিন্দুরাজা বসেন না।"
>
> (দেশীয় রাজ্য - ২য় খন্ড - পৃষ্ঠা - ১৮৪)

মহারাজা বীরচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণের পর যে উল্লেখযোগ্য কাজটি করেন, তাহলো, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি। অবশ্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চাপেই তিনি তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারের উপর তিনি প্রথমে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ১২৯৯ ত্রিপুরাব্দের (১৯৯৮ ইং) ৮ই জ্যৈষ্ঠ একটি ক্ষুদ্র রোবকারীর মাধ্যমে তা সম্পাদন করেন।

তারপর বাংলার লেফটেনান্ট গর্ভনর ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগতির ও দুর্দান্ত লুসাই জাতির দমনের নিমিত্ত ভারত গভর্মেন্টের অনুমোদনক্রমে এ. ডব্লিউ. বি. পাওয়ার সাহেবকে ১৮৭১ খ্রীঃ ৩রা জুলাই পলিটিক্যাল এজেন্টরূপে নিযুক্ত করা হলো। ইতিমধ্যে রাজকার্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ শুরু হওয়ায় মহারাজা বীরচন্দ্র স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করে কম্পবল সাহেবকে জমিদারী বিভাগের ম্যানেজার পদে পরিবর্তিত করে, নাজীর দীনবন্ধু ঠাকুরকে মন্ত্রীপদে উন্নীত করেন।

মহারাজা বীরচন্দ্রের পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে আইন-আদালত ছিল না। শাসনকর্তরা নিজ নিজ বিবেকবুদ্ধির মাধ্যমে বিচারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতেন। এই সময়ে পলিটিক্যাল এজেন্ট পাওয়ার সাহেবের পরামর্শ অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে আদালত প্রতিষ্ঠিত হলো এবং সেইসঙ্গে দেওয়ানী ওফৌজদারী বিষয়ক আইন প্রচারিত হলো, যা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম লিখিত আইন হিসাবে পরিগণিত হয়।

কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই মহারাজারা স্বয়ং দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত শেষ আপীল গ্রহণ ও বিচার করছিলেন। এই আপীল শোনার জন্য মহারাজা ১২৮২ ত্রিপুরাব্দে (১৮৭২ ইং) আষাঢ় মাসে "খাস আপীল আদালত" নামে এক স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদালত অনেকটা প্রিভি - কাউন্সিলের অনুকরণে গঠিত হয়েছিল। দুইজন বিচারক একযোগে আপীল শুনে, তাঁদের রায় মহারাজ সমীপে পাঠাতেন এবং মহারাজের অনুমোদনক্রমে এই রায় কার্যে পরিণত করা হতো।

ইতিমধ্যে রাজকার্যে আবার বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। দিনদিন রাজ্যের ঋণ বাড়তে লাগলো। ফলে বিশেষ যোগ্য কর্মচারীর প্রয়োজন বিধায় মহারাজা নীলমণি দাস নামে এক অভিজ্ঞ কর্মচারীকে গভর্মেন্ট তরফ থেকে ধার করে এনে পূর্ণ ক্ষমতা দানের মাধ্যমে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করলেন। মন্ত্রী দীনবন্ধু ঠাকুরকে সদর ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দেওয়া হলো। অবশ্য রাজ্যের মন্ত্রীপদ মহারাজার আমলে অনেকবার রদবদল হয় এবং আইন-প্রণয়ন, আদালত প্রতিষ্ঠা, স্ট্যাম্প প্রচলন ইত্যাদির মাধ্যমে শাসন ও বিচার বিভাগ সুদৃঢ় হয়।

মহারাজা বীরচন্দ্র শুধু সুশাসকই ছিলেন না, তিনি একাধারে সুকবি, সুগায়ক ও নানা গুণের আধার ছিলেন। তিনি গুণী ব্যক্তির সমাদর করতে জানতেন। তাঁর সময়ে ভারতের তৎকালীন সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী প্রধান ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই ত্রিপুরার দরবারে স্থানলাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে এবং মহারাজা বীরচন্দ্রের ব্যক্তিগত সাহিত্যকর্মগুলি পূর্ববর্তী 'আধুনিক যুগ' অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

মহারাজা বীরচন্দ্র সর্বগুণান্বিত রাজা ছিলেন। ৩৪ বৎসর সুনামের সঙ্গে রাজত্ব করার পর ১৩০৬ ত্রিপুরাব্দের (১৮৯৬ইং) ২৭শে অগ্রহায়ণ তিনি কলিকাতায় পরলোক গমন করেন।

গ্রন্থকার ত্রিপুরার পাঁচজন মহারাজাকে তাঁদের স্মরণীয় কার্যাবলীর জন্য এই গ্রন্থে তোলে ধরেছেন। মহারাজা বিজয়মাণিক্য ও কৃষ্ণমাণিক্য তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও পরাক্রমের জন্য ত্রিপুরার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েছেন, কিন্তু মহারাজা ধর্মমাণিক্য, ধন্যমাণিক্য ও বীর চন্দ্র মাণিক্য শৌর্য-বীর্য ছাড়াও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রসারে যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তার বিস্তৃত বিবরণ লেখক এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা ভাষার প্রসারকল্পে ত্রিপুরার রাজদরবারে এই ভাষা রাজভাষারূপে সম্মান প্রাপ্ত হয়।

গ্রন্থটির মাধ্যমে ত্রিপুরার কয়েকজন রাজন্যবর্গের বিভিন্ন কীর্তি - কাহিনীর সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়। রাজ-প্রসঙ্গে বিষয়ে এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। তাছাড়া ত্রিপুরার স্মরণীয় রাজাদের রাজত্ব ও কীর্তি - কাহিনী জানার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অপরিহার্য।

গ্রন্থটি সাধুভাষায় লিখিত। ভাষা পরিচ্ছন্ন ও সাবলীল। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের গদ্যশৈলীর দুইটি নমুনা আলোচ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিস্বরূপ দেওয়া গেল —

ক) "মহারাজা প্রতিপক্ষের বল জানিয়া, মন্ত্রবর্গের পরামর্শানুসারে, সন্ধির প্রস্তাব করা সঙ্গত মনে করিলেন, এই প্রস্তাব সহ উত্তর সিংহ উজীরকে রামশঙ্কর দেওয়ানের নিকট প্রেরণ করা হইল। দেওয়ান সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, অধিকন্তু দূতস্বরূপ প্রেরিত উজীর উত্তরসিংহকে অবরুদ্ধ করিলেন। অতঃপর যুদ্ধ করাই স্থির হইল।"

(মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য - পৃষ্ঠা - ৬৫)



খ) "মহারাজা বীরচন্দ্রের কবিত্ব প্রতিভা সকলেরই অনুকরণীয় হইয়াছিল। রাজ পরিবারের কুমার, কুমারীগণ, ঠাকুর পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দ এবং রাজধানীবাসী অনেকেই সেকালে বঙ্গ-রাণীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এমনকি, অসভ্য কুকি সমাজেও কবিতা রচনার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল। কুকিরাজ বানখাম্পুই-র রচিত কবিতাই একথার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।"

(মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য - পৃষ্ঠা - ১১৭)

কোথাও কাহিনী অতিরঞ্জনের প্রয়াস নেই, বরং যুক্তিতথ্যে সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে রাজাদের কাহিনীগুলি অত্যন্ত সরস ও মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

—ঃ—

দেশীয় রাজ্য ঃ—

কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা

ত্রিপুরার একজন স্বনামধন্য লেখক হলেন কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা। (১৮৬৪ - ১৯২৩ইং) তিনি প্রথমে ছিলেন মহারাজা বীরচন্দ্রের পরিসহায়ক এবং পরে তিনি মহারাজা রাধাকিশোরের সময় বিশেষ দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর একান্ত পার্শ্বচর হয়েছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর অনুরাগ। এই প্রেরণাবশেই তিনি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে বহু প্রবন্ধ লেখেন এবং এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় সেই সময়ের 'প্রদীপ' 'সাধনা', প্রবাসী, 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'মর্ম্মবাণী', কুচবিহারের সাহিত্য পত্রিকা 'পরিচারিকা' এবং 'ত্রিপুরার বার্ষিকী', 'রবি' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এইসব প্রবন্ধগুলি তাঁর লেখা 'দেশীয় রাজ্য' (১৯২২ ইং) গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়।

এই 'দেশীয় রাজ্য' বিভিন্ন তথ্য সংবলিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে উৎসর্গ করা হয়েছে। উৎসর্গপত্রের তারিখ ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩২ ত্রিপুরাব্দ (১৯২২ ইং)। গ্রন্থটি লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১০ই মাঘ, ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৪ ইং) প্রকাশিত হয়।

'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থটি দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে ৭টি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে দেশীয় রাজ্যের অবস্থান, সমস্যা এবং দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ কি— প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ৯টি প্রবন্ধ ত্রিপুরা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা— আর দুইটি প্রবন্ধের একটি মনিপুরের চিত্র সম্পর্কিত, অন্যটি মহীশূরের রাজাদের বিবাহ পদ্ধতি নিয়ে লেখা হয়েছে।

কর্মজীবনে নানাকারণে লেখক বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য পরিভ্রমন করেন এবং দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত নানা তথ্য সংগ্রহ করে তিনি এই সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহান্বিত

হন ও দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি লেখেন। তাছাড়া গ্রন্থের নামকরণেও এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য।

প্রথম খন্ডঃ—

ভারতে দেশীয় রাজ্যের স্থান।

ইংরাজ সরকারের অধীনস্থ ভারতের দেশীয় রাজ্যের নৃপতিরা নিজ দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে চরম উদাসীন হয়ে পড়েছেন, সেই জন্য প্রবন্ধকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এই প্রবন্ধে তীব্র মন্তব্য করেছেন।

> "এমন অবাধ সুবিধা, শান্তিময় সিংহাসন ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক সমগ্র ভারতের দেশীয় নৃপতিবৃন্দের করায়ত্ব, থাকিতে, তাঁহারা যদি নিজ অস্তিত্ব, নিজ দায়িত্ব, ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহাদের মহত্ত্ব, অনুভব করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে তাঁহারা নিতান্তই 'দয়ার পাত্র'।

অথচ দেশের প্রতি তাঁদের যথেষ্ঠ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রয়েছে কেননা, ভারতীয় সাহিত্য-শিল্প-ধর্ম ইত্যাদির সর্বাঙ্গীন বিকাশ এই দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভব হয়েছে। লেখক মনে করেন যে, এই সব দেশীয় রাজ্যগুলি শিল্প ও সংস্কৃতি বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। অথচ এই দেশীয় রাজ্যের নৃপতিরা আজ বিলাতীয়ানায় অভ্যস্ত হয়ে চরম বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত আছেন দেখে লেখক কিছুটা বেদনার্ত। একটি প্রদর্শনীতে বিলাতী জিনিষের প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় অনুরাগ দেখে লেখক বিস্মিত হয়েছেন। সেই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য থেকে আনীত জিনিযপত্রে খাঁটি ভারতীয় শিল্পের আদল দেখে লেখকের মনে হয়েছে— "ভারত শিল্প আজও দেশীয় রাজ্য 'জাত-কুল' বজায় রাখিয়া জীবিত আছে, আজও ভারত নৃপতিগণই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।"

প্রসঙ্গক্রমে লেখক আবার মহীশূর, বরোদা, ত্রিবাঙ্কুর, বিকানির, গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজ্যগুলির উচ্চ প্রশংসা করে এই রাজ্যগুলি যে সমাজ-সংস্কারের

পথে বিশেষ অগ্রনী, তার উল্লেখ করেছেন। লেখক এই প্রসঙ্গে বিশেষ আশা পোষন করে বলেছেন - "ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কার যদি কখনও সম্ভব হয়, তবে তাহা দেশীয় রাজ্যগুলিতেই সাধিত হইবে এবং ক্রমে তাহা ভারতময় বিস্তারলাভ করিবে।" দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য হলো— "যে পর্যন্ত রাজারা শিক্ষায়, দীক্ষায় এবং চরিত্রবলে দেশের সম্মানলাভ করিতে না পারিবেন, সে পর্যন্ত তাঁহারা ভারতবর্ষের শীর্যস্থানীয় হইয়াও ভারতে অপরিচিত থাকিবেন..........................।"

লেখক দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের কারণ নির্নয়ে বলেছেন, ইংরাজের কর্তৃত্বে থাকার ফলে তাঁদের জীবনে এসেছে এক কর্মহীন অবকাশ ও চরম নিশ্চিন্ততা। ফলে তাঁরা অবসর মুহূর্তগুলিকে ভরিয়ে তুলেছে বিলাস-ব্যসনে। এদিকে সুচতুর ইংরাজ সরকারও সুযোগের অপব্যবহার না করে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় বিধি আরোপ করে দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সর্মময় কর্তৃত্ব নিচ্ছে। পরিশেষে লেখকের বক্তব্য হলো—

> দেশীয় রাজ্যের দায়িত্ববোধ পুরামাত্রায় হওয়া একান্ত দরকার, যাহাতে নবীন ভারতের উন্মাদনার সকল সুর রাষ্ট্রমন্ডপে বাজিয়া উঠে, তাহার আয়োজনই স্পৃহনীয়।"

দেশীয় রাজ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঃ—

বৃটিশ শাসনে ভারতে নানা মুনির নানা মত হবার ফলে দেশীয় রাজ্যগুলি আজ 'নীরবপন্থী—অথচ সমগ্র ভারতের সর্বময় কর্তৃত্বও তাঁদের হাতে দেওয়া যায় না। তার কারণ সম্পর্কে লেখক বলেছেন- –

> "ইহা বোধহয়, সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে যে, দেশীয় রাজ্যের হাতে সমগ্র ভারতবর্ষ কখনও যাওয়া উচিত হইবে না। কারণ ভরতবাসী জানে এবং শুনে দেশীয় রাজ্যগুলি সবই একাধিপতি রাজা বা নবাব ইঁহাদের হাতে ভারতের শাসননীতিফেলিয়া দেওয়া কখনও নিরাপদ হইতে পারে না।"

তবে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিরা যে সর্বদিক থেকে মন্দ, লেখক তা মানতে রাজী নন। তাই তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"ভরতবাসী মনে করে দেশীয় রাজ্যের রাজারা এখনও মূর্খ, স্বেচ্ছাচারী, বহু বিষয়ে ইঁহারা অপরাধী (with a few honourable exception) এবং ইঁহারা কোন পন্থাতেই চলেন না।"

দেশীয় রাজ্যের প্রতি লর্ড কার্জনের যে একটি দরদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, লেখক তার উল্লেখ করেছেন। দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি লর্ড কার্জন বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন বলেই তিনি সবসময় তাঁদের জন্য বিশেষ কিছু করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জানতেন—"এই প্রাচীন বংশীয়দিগকে হৃদয় না দিলে মন পাওয়া সুকঠিন।" দেশীয় রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি যে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তা লেখকের একটি উক্তিতে প্রমানিত হয়।

> "এইজন্যই বোধহয় (Lord Curzon) ভারতীয় নৃপরিবৃন্দকে সাগরপারে যাইয়া his religion, his tradition and his people যেন পরসঙ্গে ভুলিয়া না যান, সেইজন্যই এক (proceeding) করিয়া বিলাত যাওয়ার পথবন্ধ করিয়াছিলেন"।

দেশীয় রাজ্য—সেকাল ও একালঃ—

এই প্রবন্ধটি অন্যান্য প্রবন্ধগুলির তুলনায় আকারে বড়। এতে দেশীয় নৃপতিদের উপর ভারতের শাসন সংরক্ষণের ভার আরোপ সম্পর্কে লেখক দেশীয় রাজ্যের পক্ষ সমর্থন করে বলেছেন—

> "আমার বোধহয়, আবহমানকাল প্রায় অনেক রাজ্য পুরুষানুক্রমে যাঁহারা শাসন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা প্রজাশাসনে সিদ্ধহস্ত। তাঁহাদের উপর নির্ভর করা দেশ-কাল-পাত্রভেদে বর্ত্তমান সময়ে অনুচিত হইবে না বলিয়া মনে করি।"

তবে এই দায়িত্ব ন্যস্ত কবার পূর্বে তাঁদের মানসিকতা এবং শিক্ষাদীক্ষা এই ক্ষেত্রে কতটুকু কার্যকরী হবে, তাও বিচাব করে দেখতে হবে। এছাড়া এই দায়িত্ব তাঁরা সর্বতোভাবে গ্রহন করবেন কিনা, তাও ভেবে দেখতে হবে বলে লেখক মনে করেন। তাছাড়া ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে দেশীয় নৃপতিরা যে বিশেষ উপযুক্ত, তাতে লেখকেব কোনো সংশয় নেই। লেখক এর সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন—

> "বাজন্যবর্গ যদি নিজ নিজ ইচ্ছামত উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজ্যের প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অধিকারবান্ হন ও মন্ত্রীগণ যদি রাজ্যের উন্নতিব জন্য দায়ী থাকিয়া কার্য্য করেন, রাজার মান-সম্ভ্রম উন্নতি যদি তাঁহার নিজের বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে সরকার নিযুক্ত পলিটিক্যাল অফিসার হইতে সে সকল দেশীয় কর্মচারীর দ্বারা রাজ্যের কম মঙ্গলসাধিত হয় না।"

তবে একথা ঠিক যে, কয়েকজন দেশীয় নৃপতি ব্যতীত প্রায় সবাই আরামের জন্য উন্মুখ। আত্মসুখে তাঁরা এত বেশী নিমগ্ন যে, রাজ্য ও প্রজাসাধারণের উন্নতিকল্পে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর খুব কম। তবু লেখক তাঁদের ক্ষমতার উপর আস্থাশীল হয়ে প্রত্যয়ের সুবে বলছেন —

> "তবে তাঁহারা সুশাসন করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়— যদি তাঁহাদের ভাব এবং স্বভাব পরিবর্তিত হয় এবং তদনুসারে তাঁহাবা চলেন এবং চালিত হন। তাঁহাদের সুমন্ত্রীর দরকার।"

পরিশেষে লেখকেব এই সম্বন্ধে পরামর্শ হলো—

> 'সুমন্ত্রণার জন্য স্বীয়রাজ্যের সুশিক্ষিত সন্তানদের নিযুক্ত করিলে, তদ্বারা মন্ত্রণাসভা গঠিত হইলে বাজ্য এবং রাজ্যের প্রজাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে। ক্রমশঃ রাজ্যশাসনে সুশিক্ষিত প্রজাগণ রাজাকে

> রাজ্যশাসনে সাহায্য করিলে উভয়কুল রক্ষা পাইবে। বর্তমান ভাবতে স্বায়ওশাসনের যে বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে এসব দেশীয় রাজ্য রক্ষা পাইবে।"

এই প্রবন্ধে লেখক সামন্ততান্ত্রিকতার পক্ষ সমর্থন করেছেন। তিনি যে সামন্ততন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, তা এই প্রবন্ধ পাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়। অবশ্য এর ভাল-মন্দ দুইই বিভিন্ন সমালোচকের অভিমত সহ তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনপ্রণালী অনুসন্ধানের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছেন। এই বিষয়ে লেখকের বক্তব্য হলো—

> "তবে কথা এই যে, তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা বর্তমান সময়ে যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে তাঁহারা শাসন করিতে কোন পথ অবলম্বন করিবেন অথবা কবিতে পারেন সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।"

বিষয়ের দিক থেকে বিচার করলে বর্তমান সময়ের গনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ও দৃষ্ঠিভঙ্গীতে এই প্রবন্ধটির মূল্য খুবই সীমিত।

দিল্লীর শিল্প প্রদর্শনীঃ—

১৯০৩ সালে দিল্লী দরবার উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। এই প্রবন্ধটিতে লেখক দিল্লী দরবারকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এক শিল্প প্রদর্শনী সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পরিবেশন করেছেন। দিল্লী দরবারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য হলো—

"রাষ্ট্রনীতি রক্ষার্থ, অথবা লর্ড কার্জনের বাহাদুরির জন্যই হউক কিংবা ভারতীয় নৃপতিবৃন্দেকে নিয়া একটা তামাসা করার জন্যই হউক দিল্লীতে ১৯০৩ সালে একটা দরবার হইয়া গিয়াছে।"

এই প্রদর্শনী অন্যতব আকর্ষণ ছিল ভাবতীয শিল্প। ভাব ে ঃ শিল্পে ঐতিহ্য সম্পর্কে লেখকেব অভিমত হলো---

> 'ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত দর্শকবৃন্দ এই শিল্প প্রদর্শনী দেখিয়া প্রত্যাশা করিতে পারিয়াছিলেন যে, ভাবতীয শিল্প, আজও যাহা বর্তমান আছে তাহার তুলনা অন্যত্র সম্ভবে না।''

ভারতীয় শিল্পের প্রসার ও ঐতিহ্যের পেছনে যে রাজাদের অবদান অপরিসীম এবং রাজানুগ্রহেব ফলে শিল্পীবাও যে প্রচুর উৎসাহ ও উন্নতিলাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, লেখক প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি ভারতশিল্পের উত্থান-পতনের ইতিহাস বিশ্লেষনে বলেছেন যে, হিন্দু রাজত্বের এই শিল্প প্রসারতা ও উন্নতি মোগল আমলেও অক্ষুন্ন ছিল। কারন মোগল বাদশাহরা হিন্দু-শিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারপর ইংরাজ আমলে ভারতীয় শিল্পের পতন শুরু হয়, কারন ইংরাজরা এদেশের শিল্পের প্রতি সহৃদয ছিল না। ফলে শিল্পের অবস্থা হলো---

> '' .... ভারতশিল্প অভিভাবক বিহীনা বিধবার ন্যায় পিতৃকুল আশ্রয় লইয়া দীন হীন অবস্থাপ্রাপ্তা হইলেন---হিন্দুর বিধবার সাজ পরিযা নিবাভরণ হইলেন। রাজা মহারাজাদের ঘবে ভারতশিল্প প্রানহীন প্রাচীনত্বেব নিদর্শনস্বরূপ গচ্ছিত হইল।''

উপযুক্ত সমাদরের অভাবে দেশীয় শিল্পের এই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় লেখক বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাছাড়া দেশীয় শিল্পের প্রতি ভরতীয়দের চরম অবজ্ঞা এবং তুলনায় বিলাতী জিনিষের প্রতি বিশেষ অনুরক্তিতে লেখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে দেশীয় রাজাদের কর্তব্য হলো, ভারতশিল্পকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা অথচ তাঁরা আজ তা না করে পরানুকরণপ্রিয় হয়ে উঠেছেন, যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

আবার বর্তমান সময়ে ভারতশিল্পের প্রতি ইংরাজদের সুদৃষ্টি পড়ায় লেখক কিছুটা আশান্বিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লর্ড কার্জনের ভারতীয় শিল্পের প্রতি আগ্রহ ও পৃষ্টপোষকতার উল্লেখ করেছেন।

> "কিন্তু তবুও বলি, লর্ড কার্জন ভারতশিল্পের উন্নতি ও পুনরুদ্ধারের জন্য যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই।"

পরিশেষে লেখক এই আশা পোষন করেন যে, দিল্লীর এই শিল্প প্রদর্শনীকে ভিত্তি করে দেশীয় নৃপতিদের মন আবার হয়তো দেশীয় শিল্পের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবে এবং ভারতশিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁরা আন্তরিকভাবে চেষ্টিত হবেন।

দেশীয় রাজগণ ও উপাধি ব্যাধি ঃ—

এই প্রবন্ধটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। ইংরাজ সরকারের পক্ষ থেকে রাজা ও রায়বাহাদুর উপাধির জন্য লালায়িত মানুষের হাস্যকর চিত্র এই প্রবন্ধে অংকিত হয়েছে। অন্যদিকে উপাধিপ্রাপ্ত রাজারা যে 'হিজ হাইনেস' সম্বোধন না করলে চটে যান এবং মূল্যহীন সম্মানলাভের জন্য প্রানপণ চেষ্টিত হয়, তার একটি পরম উপভোগ্য চিত্রও তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের একটি কৌতুকপূর্ণ উক্তি—

> "মনে করুন একজন টাকার জোরে রাজা হইলেন। গভর্নমেন্ট 'রাজা' উপাধি সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগতভাবে জীবদ্দশাকাল পর্যন্ত দান করেন। বংশধরেরা 'যে তিমিরে'—'সেই তিমিরে'ই পড়িয়া থাকেন। যিনি রাজা হইলেন, তাঁহার পত্নী 'রানী' হইলেন না, ব্যাকরনশাস্ত্রে এইরূপ প্রথা অসিদ্ধ হইলেও, ইহা আধুনিক রাজ-ব্যবহার সম্মত বটে।"

তারপর লেখক উপরি-উক্ত প্রসঙ্গে ছোট ছোট ঘটনার অবতারনা করে সম্পূর্ন দির্লিপ্তভাবে দেশীয় লোকের ও রাজাদের এই উপাধি ব্যাধির সর্বাঙ্গীন চিত্র তুলে ধরেছেন।



> "একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম একজন 'রাজা' ছোট লাটের উদ্যান-সম্মিলনীতে কোন রাজপুরুষের নিকট হইতে প্রতি নমস্কার আদায়ের লোভে সেলাম ঠুকিবার জন্য আসে পাশে ঘুরিতেছিলেন। সাহেবটি একজন সেক্রেটারী, সঙ্গে মেম ছিলেন।............রাজা নাছোড়বান্দা, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, সম্মুখে যাইয়া হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু সাহেব "good morning Raja, how do you do? বলিয়া চলিয়া গেলেন। মেমটি রাজার বেশভূষা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Who is this living cushion?

কিন্তু লেখকের বক্তব্য হলো—"এমন কৌতূহলোদ্দীপক হাস্য রসাত্মক সজ্জা লইয়া রাজা নাম ফলাইবার দরকার কি?"

লেখক এই উপাধি ব্যাধিকে একটি জটিল ব্যাধিরূপে গণ্য করেছেন ও এই মিথ্যা মোহ যে দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে চরম অবমাননাকর তার উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে লেখক এর উপযুক্ত চিকিৎসা নির্ণয়ে বলেছেন —

> "..............স্বদেশের নিকট যিনি পূজা পাইবেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। নতুবা রাজা উপাধি সরকার বাহাদুর দিলেও সেটা ব্যাধি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।"

দেশীয় রাজ্যের বর্তমান সমস্যা ঃ—

Mont-ford reform প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়, লেখক এই প্রবন্ধে তার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং ব্রিটিশ ভরত ও দেশীয় রাজ্যকে এক করে দেওয়ার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে তাঁর গুরুতর অভিযোগ হলো—

"তাহারা আদুরে দুলাল, আপনাদের আমোদ-প্রমোদে আহ্লাদে আটখানা, প্রজার অর্থে আপনার রাজভোগ জোগান, রিপুচরিতার্থতায় জীবনের আয়ু ক্ষয় করেন, বিলাতে, য়ুরোপ, দেশে ইহাদের অনেকের জীবন, ইন্দ্রিয় শিকারে রং তামাসায় রঙ্গীন তাসেরই মত। মানুষ খেলিতে পারে যখন পেটে অন্ন থাকে, কিন্তু অন্নহীন বসনভূষনক্লিষ্ট প্রজারা এইসব রঙ্গীন তাসের খেলা ভরতে আর কতকাল চলিতে দিতে পারে।"

তবু লেখক এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী নন। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের তুলনায় দেশীয় নৃপতিরা "পর্ব্বতের নিকট বল্মীকস্তূপ" যদিও, তবু তাঁরা যদি ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে কাজ করেন তবে হয়তো এরূপ অবস্থা থাকবে না। তাছাড়া লেখক ব্রিটিশের 'লালফিতা' শাসনের প্রতি আস্থাশীল নন। তাঁর ধারনা—

"ইংরাজী ছাঁচে দেশীয় রাজ্যগুলি ঢালাই হইলে অতীতের সভ্যতার যে ফটোগ্রাফটি অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়াও এতদিন সজীব ছিল, তাহার অস্তিত্বেও বিলোপ ঘটিবে।"

'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কেবিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। এইক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার প্রগতিশীলতা লক্ষনীয়। তিনি যথাসম্ভব নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশীয় রাজ্যের সমস্যা ও সমাধানের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি কৃতকার্যও হয়েছেন। আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ও গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

"আজকাল আমরা যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া থাকি এবং সরকার বাহাদুর আমাদিগের অভিমতগুলি যে চক্ষে দেখিয়া

থাকেন, মহিমচন্দ্রের দৃষ্টি তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রলোকের। তিনি প্রতিকূল বা অনুকূল কোন শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই।"

দেশের রাজা ও মন্ত্রীরা যে দেশের মঙ্গল কামনায় ইচ্ছুক হলে কতটুকু সফল হতে পারেন, তার অনেক নজির তিনি দিয়েছেন এবং এই ক্ষেত্রে বিদেশী এজেন্টদের প্রভাবে যে দেশীয় রাজারা স্বদেশের রীতি-নীতি ভুলে কি রকম উদ্ভট জীবে পরিনত হয়, তার চিত্রও তিনি যথাযথ ভাবে এঁকেছেন।

প্রথম খন্ডের প্রবন্ধগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যে ও যুক্তি-তথ্যে সমৃদ্ধ। তাছাড়া তাঁর দেশপ্রীতি যে কত গভীর তা "দিল্লীর শিল্প প্রদর্শনী" প্রবন্ধটি পাঠ করলে অনুধাবন করা যায়। প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে সারগর্ভ ও মৌলিক চিন্তাধারার ফসল। তাছাড়া লেখকের বাক্‌চাতুর্য ও পরিহাসপ্রিয়তা প্রবন্ধগুলিকে করেছে সরস ও প্রানবন্ত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

ক) "যে অবস্থায় রাজ্যের রাজাব ন্যায় পলিটিক্যাল অফিসারকেও রাজ্যের উন্নতির জন্য বাধ্য হইতে হইবে (চাকুরির মায়া বড় দায়।) ও এক্ষণে পলিটিক্যাল প্রভুর যে শক্তি ও প্রাধান্যে 'রাজা চরাইতে' নিয়োজিত রাজ্যের উন্নতি অবনতিতে চাকুরী রক্ষা করিতে হইলে, তাঁহাদের সে শক্তি রাজ্যের কল্যাণে নিশ্চয় প্রয়োগ করিতে হইবে ও রাজন্যবর্গকে তাঁহারা সাহায্য করিতে বাধ্য হইবেন।"

(দেশীয় রাজ্য-পৃষ্ঠা-৪৩)

খ) "ভারতবর্ষ যেন দ্রৌপদী সুন্দরী। আর তিনি যেন পণ করিয়া স্বয়ম্বরা হইতে চান। মাঝে মাঝে কর্ণরূপী শ্রীসম্পন্ন বীরপুরুষ উপস্থিত হন, তখন যেন বেচারী দ্রৌপদীকে বলিতে হইতেছে (মর্ম্মের ভাব চাপা রাখিয়া) — আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না। সুন্দরীর স্বয়ম্বর সভায় এখনও দুর্জ্জয় অর্জ্জুন আসিয়া উপস্থিত হন নাই। ভারত নৃপতিকুলের অবস্থা তদ্রূপ।"— (দেশীয় রাজ্য-পৃষ্ঠা-৭৬)

গ) "আপনারা নিজ নিজ বংশ মর্য্যাদা ভুলিয়া সেলামি তোপের বরাদ্দমতে আপনাদের সম্মান গ্রহণ করিবেন কিন্তু মনে মনে যাহাই ভাবুন বাহিরে কিন্তু প্রকাশ করিবেন কাহারও প্রতি এ দরবারে উচ্চ নীচ ভাব প্রকাশ করা হয় নাই। সবাই যেন ভাবেন যে যার যার কৃষ্ণ তার তার দক্ষিনে, এই বিচিত্র রাসমন্ডপে আপনারা সখিভাবে নাচিয়া গাহিয়া যান, কৃষ্ণপ্রাপ্তি অদৃষ্টে থাকিলে ঘটিবে বৈকি?"— (দেশীয় রাজ্য-পৃষ্ঠা-৮৯-৯০)

প্রবন্ধগুলি সাধুগদ্যে লিখিত। ভাষা পরিচ্ছন্ন ও সাবলীল। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের বক্তব্য হলো—

"দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা সম্বন্ধে এরূপ সারগ্রাহী পুস্তক বাঙ্গালা কেন ভারতের কোন ভাষায়ই হয় নাই। এই বহিখানি পত্রসংখ্যা হিসাবে সুবৃহৎ না হইলেও বিষয় গৌরবে মহৎ। ইহার লেখায় জটিলতা বা প্রহেলিকার মত কিছু নাই। ইহার রচনা দর্পণের ন্যায় পরিস্কার-ভাষা স্থানে স্থানে এমন সুন্দর এবং বিষয় গুলি এরূপ সংযত পরিপাট্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে মনে হয়, তাহা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের হাতের অযোগ্য হইত না।"

—ঃ—

"দেশীয় রাজ্য"

দ্বিতীয় খন্ড

এই খন্ডের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি ত্রিপুরা সম্পর্কিত, শুধু শেষের দুইটি প্রবন্ধ মনিপুর ও মহীশূর রাজ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছে।

এই খন্ডের প্রথম প্রবন্ধটির নাম— "ত্রিপুরায় বীরচন্দ্র।" ত্রিপুরার সর্বত্র ও রাজঅন্তঃপুরে প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব প্রতিপালিত হয়। রাজঅন্তঃপুরে অনুষ্ঠিত ঝুলন উৎসবের বিস্তারিত বর্ণনা এই প্রবন্ধটিতে রয়েছে। মহারাজা বীবচন্দ্র যে কূটনীতিজ্ঞ অপেক্ষাও সুকবি-সুগায়ক ও সুরসিক ছিলেন, লেখক বিভিন্ন ঘটনাবলী উল্লেখ করে তা প্রমান করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম "ঝুলন স্মৃতি" হলেও এর বিষয়বস্তু আদৌ ঝুলন সম্পর্কিত নয়। এতে মহারাজা বীরচন্দ্রের রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। মহারাজা বীরচন্দ্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের জটিলতাই এই প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয়।

'হোরি' প্রবন্ধটি ত্রিপুরার হোলি উৎসবকে উপলক্ষ করে লেখা হয়েছে। ত্রিপুরার এই হোলি উৎসবকে জাতীয় উৎসব বলে গন্য করা হয়। লেখক প্রবন্ধের প্রথমে ত্রিপুরার হোলি উৎসব সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া মহারাজা বীরচন্দ্রের দরবারে যে গুণী, রসিক ও গায়কদের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল, লেখক তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। অবশ্য এই গ্রন্থের "ত্রিপুরায় আধুনিক যুগ (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে)" অংশে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ লিপি বদ্ধ করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে ব্যক্তি বীরচন্দ্রই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছেন।

"বীরচন্দ্রের শাসনে জেল" প্রবন্ধে মহারাজা বীরচন্দ্রের সময় জেল ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা সম্পর্কে মহারাজার ব্যক্তিগত মনোভাব বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। জেল কয়েদীদের কি নিয়মে রাখা হবে, এই প্রসঙ্গে মহারাজা বীরচন্দ্রের বক্তব্য হলো— "জেইলে কয়েদী রাখা, এখনকার নির্ম্মম জেইল নিয়মানুসারে না চলিয়া দেশকাল পাত্র ভেদে চলা উচিত।"

প্রসঙ্গক্রমে লেখক একসময়ে ত্রিপুরায় প্রচলিত 'আলঙ্গ' নামে জেলের উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরার বহু সম্মানিত ব্যক্তিরাও সামান্য অপরাধের শাস্তিস্বরূপ এই জেলে অবস্থান করতেন। এই জেলের নিয়মবিধি সম্পর্কে লেখক বলেছেন—

> "পূর্ব্বে আলঙ্গ নামে একপ্রকার জেইল ছিল.............. তাহাতে নানা শ্রেনীর লোক পড়িত কিন্তু দেশকাল পাত্রভেদে তাহাদের বসবাসের বন্দোবস্ত ছিল, পৃথক পৃথক রকমে। রাজ সম্পর্কান্বিত ব্যক্তিবর্গ, ঠাকুর পরিবারে ও অপর ভদ্রালোকের প্রচুর ও নানা উপাদেয় আহার-বিহারের বন্দোবস্ত ছিল।"

"এই জেলে সম্পর্কে ১৮৯৫খ্রীঃ Late Mr. Mc. Minn - এর মত হলো— "The prisoners seem to enjoy family comforts." —(দেশীয় রাজ্য-পৃষ্ঠা-২০৭)

"ত্রিপুরা দরবারে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এটি একটি স্মরনীয় ও মূল্যবান প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে এই গ্রন্থের "ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ ও রবীন্দ্রনাথ" ও "মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর" অধ্যায়ে পরিপূর্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে তার পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

"ত্রিপুরা প্রসঙ্গ" প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কুমিল্লা শাখার এক বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করা হয়। প্রবন্ধটি ত্রিপুরায় বঙ্গভাষা প্রসারতা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে। বঙ্গভাষার প্রসারে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের অনুরাগ ও অবদান সম্পর্কে লেখক এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত রাজমালা, কৃষ্ণমালা, শ্রেনীমালা প্রভৃতি গ্রন্থের (উক্ত গ্রন্থগুলি বিশদভাবে আলোচিত) উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ত্রিপুর রাজ-অন্তপুরের মহিলারাও যে বঙ্গভাষার চর্চা করতেন, তার বিভিন্ন নজির তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক মহারাজা ধর্মমাণিক্যের পত্নী মহারানী ধর্মশীলা (নানুয়াদেবী),

কৃষ্ণমানিক্যের পত্নী জাহ্নবী দেবী, দুর্গামানিক্যের পত্নী সুমিত্রা দেবী ও তাঁর কন্যা আনন্দময়ী দেবীর নামোল্লেখ করেছেন, যাঁরা নিঃসন্দেহে ত্রিপুরা রাজ্যের বিদুষী নারী ছিলেন। পরিশেষে লেখক বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সেবক ও সেবিকা মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ও তাঁর সহোদরা অনঙ্গমোহিনী দেবীর প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যাঁদের কবিতা ও সাহিত্যনুরাগ সম্পর্কে পূর্বে এই গ্রন্থে আলোচনা করা করেছে।

"ত্রিপুরায় বঙ্গভাষা" প্রবন্ধটি পাঠ করলে এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামকরণের কোনো সঙ্গতি খুজে পাওয়া যায় না। বঙ্গভাষা সম্পর্কিত কোনো আলোচনা এর মধ্যে নেই। ত্রিপুরায় নববর্ষ উৎসবের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক ত্রিপুর জাতির নিজস্ব উৎসব 'লামাপ্রা' পূজা, (মহারাজার যাত্রার সময় ও শুভবিবাহাদিতে এই পূজা হয়) 'পরাই' পূজা অর্থাৎ গৌরী নামে দেবতার অর্চনার (রাজ সিংহাসনের সামনে এই পূজা হয়) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এই পূজার প্রথা সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য হলো—

> "এই দেবতার পূজোপকরণ মধ্যে আমরা দেখিতে পাই রাজার দর্পণ এবং রানীর রিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং ঐসব জিনিষের পূজা পৃথকভাবে হইয়া থাকে।"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিপুরী মেয়েদের বক্ষাবরণ বস্ত্রকে 'রিয়া' বলা হয়। এই 'রিয়া' ত্রিপুরার একটি বিশিষ্ট শিল্প নিদর্শন।

"বার্ষিক" প্রবন্ধটি ১২৮৬ ত্রিপুরাব্দে (১৮৭৬ইং) লিখিত হয়। ত্রিপুর রাজপরিবার থেকে একসময় "বার্ষিক" নামে একটি বার্ষিকী পত্রিকা প্রকাশিত হতো। প্রবন্ধটিতে লেখক একটি নিজস্ব কবিতার মাধ্যমে ত্রিপুর ইতিহাসের এক বীরাঙ্গনার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটি হলো — মহারাজা কীর্তিধরের রাজত্বকালে হীরাবন্ত খাঁ নামে এক ধনী বণিকের সঙ্গে কীর্তিধরের বিরোধকে কেন্দ্র করে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরের যুদ্ধ আসন্ন হয়। মহারাজ কীর্তিধর

ভয়ে সন্ধি করতে চাইলে রাজমোহিনী তাতে বাধা দেন এবং ত্রিপুর সৈন্যদেব এই ব্যাপারে উৎসাহিত করে নিজেই যুদ্ধে অবতীর্না হন। তাঁর প্রবল প্রতাপে গৌড় সৈন্যরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়।

"ত্রিপুরার শিল্প" প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্প 'রিয়া', 'সুজনী' সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। 'রিয়া' নামে একপ্রকার বক্ষাবরণী ত্রিপুর মহিলারা বহুকাল ধরে ব্যবহার করছেন। এই 'রিয়া' ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্প নির্দশন। আর একটি ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্প নিদর্শন হলো সূচীশিল্প 'সুজনী' যা বসবার আসন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ শিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ত্রিপুরার প্রাচীন শিল্প গৌরব সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য হলো —

> "প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্য সাম্রাজ্যের ন্যায় বিস্তৃত ছিল। আরাকান হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত তাহার বিস্তৃতি ছিল। ত্রিপুরার আর্ট এই সুবিস্তীর্ণ দেশ প্রদেশের আচার ব্যবহার বক্ষে ধারণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল।"

তাছাড়া বিভিন্ন দেশের শিল্পের আমদানীর ফলে যে ত্রিপুরাব শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করেছে, লেখক তার উল্লেখ করেছেন।

> "বর্ম্মার আর্ট বঙ্গদেশের আর্টের সহিত মিল হইয়া গেল। বর্ম্মাদেশ, চীন, লোসাই প্রভৃতি দেশ এবং পূর্ববঙ্গ দেশ স্বীয় স্বীয় কলাবিদ্যার দ্বারা সজ্জিত হইয়া ত্রিপুরাপতিকুলের অংকশায়িনী হইয়াছিল। এইসব দেশের শিল্পই আমাদিগকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত একটা ইতিহাস প্রণনয় করিয়া দিয়াছে"

আধুনিক সভ্যতার সান্নিধ্যে এসে ত্রিপুরার এই শিল্প প্রসাবতা ও বৈশিষ্ট্য যে অধুনা লোপ পেতে বসেছে, তারজন্য লেখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবু লেখকের দৃঢ় ধারণা—



> "ইতিবৃত্ত শিল্পকলা দ্বারা সুশোভিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিবে। আবার আমাদের সুজনী, কাঁথা এবং আলিপনার সূক্ষ্ম কার্য্য অবশ্য ফিরিয়া আসিবে।"

"মণিপুর চিত্র" প্রবন্ধটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতে অতীতের মণিপুর রাজ্যের সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র রাজ অতিথি রূপে মণিপুর রাজ্যে গিয়েছিলেন। প্রবন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার কাহিনীই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই প্রবন্ধ পাঠে আমরা সেইসময়ের মণিপুর রাজ্যের বহু খুঁটিনাটি চিত্রের সন্ধান পাই।

রসের দেশ এই মণিপুর এবং রসিকতা মণিপুরীদের স্বভাবগত। তাছাড়া মণিপুর স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ। এখানকার স্ত্রীলোকেরা সুরসিকা ও আমোদপ্রিয়। এরাই আমোদ-প্রমোদের মূল উৎস। কৃষিই মণিপুরীদের প্রধান জীবিকা। তাঁদেব পোষাক-পরিচ্ছদ হলো — "মাথায় উষ্ণীষ, পরণে ত্রিকচ্ছ বসন এবং একখানা ধপ্‌ধপে সাদা চাদবে শরীর ঢাকা, প্রায় সমস্ত মণিপুরী জাতির এই পোষাক। — তাঁদের শিষ্টাচার সম্পর্কে লেখক বলছেন —

> "রাস্তাঘাটে মণিপুরীদের একে অন্যকে অভিবাদন একটা বৃহৎ ব্যাপার। ইহারা জাপানীদের মত প্রচুর আমোদী এবং সাদর অভিবাদন ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্ত্রীলোক বলিয়া ইতর বিশেষ নাই। অভিবাদন করাই যেন তাহাদের আর এক রকমের আমোদ।"

এই প্রবন্ধে লেখক মণিপুরীদের অতিথি সৎকার প্রসঙ্গে এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন —

> "............ কিন্তু এই Happy Valley- তে অতিথি সৎকারের জন্য 'কীর্ত্তন' দিয়া থাকে। ...... বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র আমাকে একটি চৌকীতে বসাইয়া আমার পাদপ্রক্ষালনের ব্যবস্থা

> হইল। ইহাকে পাদ্যঅর্ঘ্য বলা যাইতে পারে। .... ব্যাপারখানা কি জানিতে অভিলাষ হইবামাত্র কতকগুলি মণিপুরী লোক অগ্রসর হইয়া আমাকে 'বার্ত্তন' করিয়া বসিল।"

'বার্ত্তন' শব্দটির ব্যাখ্যায় লেখক বলেছেন —

> "'বার্ত্তন' খুব সম্ভব 'বার্ত্তা' শব্দের অপভ্রংশ, ইহা 'নিমন্ত্রণ' করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভ্যাগতকে যে পান দেওয়া তাহাকে 'পান পিবা' বা 'পান দান' বলা হয়। পাদ্যঅর্ঘ্য প্রথমেই দেওয়া হয় তৎপর আসন গ্রহণ করার পর 'লেই চন্দন' অর্থাৎ পুষ্পচন্দন দান ও তাম্বুল দান দ্বারা অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করার নিয়ম। ইহা ছোটবড় সকল ব্যাপারেই নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিকে করা হয়। ইহা ভিন্ন অভ্যর্থনার অঙ্গ পূর্ণ হয় না।"

তাছাড়া অতিথি ও কুটুম্বকে তাঁরা দেবতা বলে মনে করেন। তাঁদের এই অতিথি সৎকারের একটি লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে, বিষয়টি একেবারে সহজ ও আড়ম্বরশূন্য অথচ আন্তরিকতায় পূর্ণ।

দাসত্ব প্রথার মতো "লালুপ প্রথা" সেইসময় মণিপুরে চালু ছিল, তবে চিরাচরিত ঘৃণ্য দাসত্ব প্রথা হিসাবে এই প্রথাকে ধরা যায় না। লেখক সেই সময়ের মণিপুরের Political Agent Colonel এর লেখা My Experience in Manipur — P. 113 থেকে একটি উদ্ধৃতি সহযোগে এই প্রথার বৈশিষ্ট্যকে বুঝাতে চেয়েছেন।

> "The Manipuri paid very little revenue in money, and none in direct texes. The lend all belonged to the Rajah, and every holding paid a small quantity of the rice each year. The chief payment was in personal service. This system known by the

> name of "Lalloop", and by so often miscalled, "forced labour", was much the same as formerly existed in Assam under its "Ahom Rajahs."

মণিপুরী সমাজ সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য হলো —

> "মণিপুর সমাজে সকলের স্থান সমান ছিল, উচ্চ-নীচ ভেদ ছিল না, রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত এক সমাজভুক্ত ছিল, তদ্দরুণ সমাজ - শরীরে একতা প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা সুখে ছিল।"

মণিপুরের বিচারাদালতের নাম "চেরাব"। এই 'চেরাব' নামক কোর্টেই আদালতের সব কাজ হয়ে থাকে। 'চেরার' কোর্টের বিচারপতিদের অবাধ ক্ষমতা। 'চেরাব' এর বিচার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখক বলেছেন —

> "এই 'চেরাব' বিচারপতিগণের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং অপর তিন ভাগ প্রজাসাধারণ হইতে দস্তুরমত নির্বাচিত হইয়া থাকে, কাজেই রাজার পক্ষে Majority কখনও পাওয়া যায় না, প্রজার পক্ষেই Majority হইয়া পড়ে। এই পাঁচজন 'চেরাব' কোর্টের বিচারপতিগণ একত্রে বসিয়া রাজ্যের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই আদালতে উকিল নাই, মোক্তার নাই, স্ট্যাম্প নাই, কোর্ট ফি প্রভৃতি কোন জঞ্জাল নাই — এমন কি লেখাপড়া পর্য্যন্ত নাই।"

উক্ত কোর্টে রাজ্যের যুবরাজ ও রাজবংশীয়দের পর্য্যন্ত বিচার হয়ে থাকে। এই বিচার প্রথা অদ্যবধি মণিপুরে আছে।

পরিশেষে লেখক মণিপুরের বিধবাবিবাহ প্রথার বিবরণ দিয়েছেন। মণিপুরে বিধবাবিবাহ সুপ্রচলিত। কারণ এই প্রথায় তাঁরা রীতিমত বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল।

''মহীশূরের রাজোদ্বাহ'' প্রবন্ধটি 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধ। মহীশূর রাজবংশের একটি বিবাহ উপলক্ষে লেখক সেখানে গিয়েছিলেন। উক্ত রাজবংশের বিবাহ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিবরণ লেখক এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন।

''দেশীয় রাজ্য'' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য। লেখকের চিন্তাশীলতা প্রবন্ধগুলিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ত্রিপুরাকে সর্বতোভাবে জানার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় খন্ডের প্রবন্ধগুলি বিশেষ আবশ্যক। এই খন্ডের অধিকাংশ প্রবন্ধ যদিও বর্ণনাত্মক, তবু বিষয়কে লেখক সরসভাবে উপস্থাপন করে এর মধ্যে রসসঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া লেখকের রচনানীতি সরস ও প্রাঞ্জল। লেখকের রচনারীতির একটি নমুনা দেওয়া গেল :

ক) ''তখন প্রাতে কাছারী বসিত। রাজার হুকুম তাই অভুক্ত অবস্থায় বিনা যানবাহনে চলিয়া আসিতে হইল। ঠাকুর লোক বিশেষ আধুনিক ম্যাজিস্ট্রেট্ তাঁহার মেজাজ যে কড়া হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার স্নেহের পাত্র কাজেই কড়া কথা বলা নিরাপদ মনে করেন। দাদা ভাই আহারে বসিলাম। তখন আমার নাকিসুরে কথা বলিবার অধিকার জন্মিল।'' (দেশীয় রাজ্য - পৃষ্ঠা - ২০৪)

এই গ্রন্থ সম্পর্কে আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—

> ''পুস্তকখানি পাঠ করিলে মনে হইবে, মহিম যদি শুধু সাহিত্যেরই সাধনা করিতেন তবে তিনি সাহিত্য জগতে স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন''।
>
> (দেশীয় রাজ্য - ভূমিকা অংশ)

— ঃ —



"রিয়া"

কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা

ত্রিপুবার বিশিষ্ট লেখক কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মার "রিয়া" প্রবন্ধটি প্রথমে আগবতলায় অনুষ্ঠিত কোনো এক শিল্প প্রদর্শনীর জন্য লেখা হয়, এবং পরে তা ১৩২৭ ত্রিপুবাব্দে (১৯১৭ইং) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

'রিয়া' ত্রিপুবাব একটি বিশিষ্ট শিল্প নিদর্শণ। বহুকাল ধরে ত্রিপুরার রাজপরিবারে, ঠাকুর পরিবারে ও জনসাধারণের মধ্যে এই রিয়া শিল্পচর্চা ও রিয়ার ব্যবহাব চলে এসেছে। এই বিয়া ত্রিপুবার একটি জাতিগতও শিল্পগত বৈশিষ্ট্য। ত্রিপুরীদের জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনে এর প্রভাব যে কতটুকু সুদূর প্রসারী, তা কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা এই প্রবন্ধে আলোচনা কবেছেন। রিয়া শিল্পে প্রাচীনত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি ত্রিপুরার প্রাচীন মহারাজা সুবরাই, (মহারাজ ত্রিলোচন) যিনি ত্রিপুরায় বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রচলনের প্রয়াসী ছিলেন বলে রাজমালায় কথিত, তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। লেখক এই প্রসঙ্গে একটি উপাখ্যানও প্রবন্ধটিতে তোলে ধরেছেন। এই উপাখ্যানের মাধ্যমে জানা যায়, ত্রিপুরী মহিলাদের মধ্যে তিনি এক প্রতিযোগিতাব আহ্বান করতেন। প্রতিযোগিনীদের মধ্যে যার রিয়া শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতো, সে পুবস্কারস্বরূপ বাজবাণী হবার সৌভাগ্যলাভ করতো। এইভাবে ত্রিপুরীদেব ঘবে ঘরে পববর্তীকালে এই রিয়া শিল্প প্রসাবলাভ করে।

'রিয়া' শিল্পবিধি সম্বন্ধে কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা বলেছেন—

> "ত্রিপুর বংশীয়দের মধ্যে মহিলাগণ নিজেদের রিয়া নিজেরাই বুনিতেন এবং তাহা নিজেরাই ব্যবহার করিতেন। সধবা স্ত্রীলোকগণ নিজেদের ব্যবহার্য্য রিয়া নিজেরাই বুনিতেন ইহাই নিয়ম ছিল।"

মহারাজা বীরচন্দ্রের সময়ে ত্রিপুরায় এই শিল্পচর্চার ভিত্তিতে মহারাজার তত্ত্বাবধানে সাড়ম্বরে শিল্প প্রদর্শনী হতো। এই প্রদর্শনীতে শিল্পের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার দেওয়ার প্রথাও ছিল। মহারাজা নিজে এই পুরস্কার দিতেন বলে এই পুরস্কার শ্রদ্ধার সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্ত ত্রিপুরী মহিলারা লক্ষ্মীর পেটরায় সযত্নে রেখে দিতেন।

বর্হিজগতে এই 'রিয়া' শিল্পের পরিচিতি ও প্রসার প্রসঙ্গে লেখক কয়েকটি উদাহরণ পুস্তিকাটিতে সন্নিবেশিত করেছেন। মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলে মন্ত্রী শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী রাজমহিষীর দেওয়া রিয়া পাগড়ীরূপে পরিধান করে Government House - এ গেলে, এই রিয়ার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে Lady Dufferin পরবর্তীকালে ত্রিপুরা থেকে রাজকুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা মারফৎ একটি রিয়া আনান।

মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের আমলে মিঃ রাল্‌ফ লিক্ যখন British Resident of Tripura - পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁকে মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের মহিষী জাহ্নবীদেবী একটি জড়োয়া কাজ করা রিয়া উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। এই রিয়া দেখে মিঃ রাল্‌ফ লিক্ মন্তব্য করেছিলেন যে, বেনারসের প্রসিদ্ধ কিংখাবের তুলানায় এই রিয়া শ্রেষ্ঠ শিল্প। তিনি এই রিয়া শিরোপা হিসাবে বহুদিন ব্যবহার করে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ এই রিয়া সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়মের আর্ট কালেকশান বিভাগে দর্শনীয় বস্তু হিসাবে প্রদান করেছিলেন।

মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সময়ে লেখক নিজেও রাজমহিষী তুলসীবতীদেবীর কাছ থেকে রাজভক্তি ও রাজসেবার পুরস্কার স্বরূপ একটি বিশেষ কারুকার্যসম্পন্ন রিয়া পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লেখকের এই রিয়াটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চপ্রশংসিত হয়।

পরবর্তীকালে কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মার পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মাকে দেওয়া রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর নিজের হাতে তৈরী রিয়া দেখে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার কাছ থেকে রিয়াটি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন।

সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে যে রিয়ার ব্যবহার আছে, লেখক এই সম্বন্ধেও আলোকপাত করেছেন। রিয়া ত্রিপুরীদের সমাজজীবনে প্রথাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরীদের বিবাহে শাশুড়ী পুত্রবধূকে রিয়া উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। কোনো ত্রিপুরী মহিলার মৃত্যু হলে তার ব্যবহৃত রিয়া একটি আসনে রেখে শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন হয়। তাছাড়া রাজমহিষীরা এবং রাজপরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলারা যাকে সম্মান বা স্নেহ করেন, তাদের শ্রেষ্ঠ উপহারস্বরূপ এই রিয়া প্রদান করা হয়।

নববর্ষে ত্রিপুরী ওঝার মাধ্যমে 'গরাই' পূজা অর্থাৎ গৌরীর অর্চনা রাজসিংহাসনের সামনে করা হয়। এই পূজা উপলক্ষে মহারাজার ব্যবহৃত দর্পন এবং মহারাণীর ব্যবহৃত রিয়ারও স্বতন্দ্রভাবে পূজা হয়। রাজা-রাণীকে দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করে সন্তানস্বরূপ প্রজাসাধারণ উপরি-উক্ত দর্পন ও রিয়ার পূজা করে। তাছাড়া রাজবাড়ীতে শুভকাজ উপলক্ষে এবং মহারাজার যাত্রাকালে ত্রিপুরীরা 'লাম্‌প্রা' পূজা করে। এই পূজা হলো 'বিনাইগর' (গণেশ) দেবতার পূজা। এতে রাজমহিষীর ব্যবহৃত বিয়া দেওয়া হয়।

ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী রিযাশিল্প যে আজ বর্হিসভ্যতার প্রভাবে লুপ্তপ্রায়, সেইজন্য পরিশেষে লেখক খুব দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা রচিত 'রিয়া' প্রবন্ধটির মাধ্যমে ত্রিপুরার একটি বিশিষ্ট শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও প্রসার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরণের শিল্পচর্চা ত্রিপুরীদের মধ্যে বহুকাল ধরে চলে এসেছে। তারমধ্যে রিয়া (কাঁচলী) বয়নশিল্পেই তাদের উন্নত ধরণের শিল্পনৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য এই রিয়া বা কাঁচলী ত্রিপুবার ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়। অবশ্য এই রিয়া বা কাঁচলী ব্যবহার যে সুপ্রচলিত ছিল, সংস্কৃত ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। তবে ত্রিপুরীদের নিজস্ব তৈরী রিয়ার শিল্পনৈপুণ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অভিনব। এই সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত হলো —

"Some of the Tripura textiles in coloured silk and cotton, particularly the gold and silver embroidered silk "riyah" or breast - covers in narrow strips, is a distinctive and elegant production of the textile art which made Tippera famous. Metal work, wood - carving and sculpture in stone were arts in which the Tippera peole excelled. Tipra contribution in the history and culture of Eastern India, particularly East Bengal has its own unique place." — (Kirat-Jana-Krti" — page 139 - 1974)

ত্রিপুরার শিল্প ও তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানতে হলে 'রিয়া' সম্বন্ধীয় এই পুস্তিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধে লেখক ত্রিপুর সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত করেছেন। এইদিক থেকে গ্রন্থটির মূল্যবোধ রয়েছে। প্রবন্ধটি সাধুভাষায় গদ্যে লিখিত এবং ভাষার সরসতার জন্য সুখপাঠ্য। লেখকের গদ্যশৈলীর একটি নমুনা নীচে দেওয়া গেল।

"ত্রিপুর জাতির মধ্যে এখনও 'রিয়া' তৈরীর নানা প্রকার কারুকার্য্যখচিত প্রাচীন নক্সা তাঁরই (সুবরাই মহারাজা) নামে পরিচিত। প্রত্যেক ত্রিপুর পরিবারে এই নক্সা বংশ-পরম্পরায় প্রচলিত থাকে। এমন কি শাশুড়ী বধূকে এই নক্সা রিয়া বিয়ের সময়ে উপহারস্বরূপ দেওয়ার প্রথা অদ্য পর্যন্ত প্রচলিত আছে।"

— ঃ —



'উদয়পুর বিবরণ', 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর' —

ধর্মনগব বিভাগ, খোয়াই বিভাগ,

কৈলাসহর বিভাগ।

লেখক — ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত।

ত্রিপুরার রাজআমলের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ''ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর'' নামে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের প্রামাণিক বিবরণ তিনি এই গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য প্রতিটি বিভাগকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখা হয়েছে। যেমন — উদয়পুর বিবরণ, ধর্মনগর বিভাগ, খোয়াই বিভাগ, কৈলাসহর বিভাগ ইত্যাদি।

ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর ইংরাজী জিলা গেজেটিয়ারের আদর্শে বাংলা ভাষায় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রামাণিক বিবরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ফলে তাঁর আদেশে লেখক ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এই ধরণের গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থগুলিকে ত্রিপুরার বাংলা গেজেটিয়ারের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যেতে পারে।

লেখক ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থগুলি রচনার কাজ শেষ করেন, কিন্তু ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার কর্তৃক গ্রন্থগুলি ছাপা হয অনেক পরে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ''উদয়পুর বিবরণ'' — এর কাজ হয় সর্বাগ্রে - ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ''ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর -- ধর্মনগর বিভাগ'' ও ''খোয়াই বিভাগ'' গ্রন্থ দুইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে আর ''কৈলাসহর বিভাগ'' গ্রন্থটি ছাপা হয় ১৯৭৬ সালে। এই গ্রন্থগুলি ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস প্রসঙ্গে মূল্যবান দলিল হিসাবে ধরা যায়। লেখক দীর্ঘকাল ত্রিপুরার বাজকার্যে নিযুক্ত থেকে রাজকার্যের প্রয়োজনে ত্রিপুরাব বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন ও বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন। গ্রন্থপাঠে বোঝা যায়, লেখকের যথেষ্ট নিষ্ঠা ও আন্তবিকতা ছিল, যার ফলে, প্রতিটি বিভাগ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিবরণ সংগ্রহ কবে তিনি গ্রন্থগুলিকে যথাসম্ভব সমৃদ্ধ

করেছেন। গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে তথ্য সমৃদ্ধ। তাছাড়া ত্রিপুরায় ইতিপূর্বে এই ধরণের রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, ফলে গতানুগতিকতার মধ্যে এর বৈচিত্র্যময়তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থগুলির বিবরণে জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীকে বাদ দিলে অন্যান্য অংশ নিঃসন্দেহে তথ্যভিত্তিক।

জেলা গেজেটিয়ারের আদলে প্রাকৃতিক অবস্থা, ইতিহাস, অধিবাসী, সাধারণ স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, গমনাগমণের পথ, কৃষি, স্থান ও ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়, এই আটটি অধ্যায়ে যাবতীয় তথ্য গ্রন্থগুলিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বর্তমানে ত্রিপুরার বিভাগগুলির প্রশাসনিক ভাগ, বিভিন্ন কারণে নানাধরণের পরিবর্ত্তন, ও পরিবর্দ্ধন এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়নের ফলে ত্রিপুরার প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন বিভাগগত বিবরণের পরিসংখ্যানও হয়তো এই কারণে অনেক পাল্টে গেছে। তবু ত্রিপুরার এই সমস্ত বিভাগগুলির প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানতে হলে এই গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে অপরিহার্য।

বিভিন্ন জাতের অচেনা পাহাড়ীদের (ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া, হালাম, কলইদফা, কাইপেং, মণিপুরী, চাকমা ও মগ ইত্যাদি) ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন ও তাদের সুখ-দুঃখকে বিশেষভাবে জানার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থগুলির মূল্য অপরিসীম।

— ঃ —

"আগ্রার চিঠি"

রাজকুমার সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা



ত্রিপুবার সুসাহিত্যিক রাজকুমার সমরেন্দ্র দেববর্মার আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো "আগ্রার চিঠি"(১৩৩৫ ত্রিং)। গ্রন্থটি পত্রাকাবে লেখা ভ্রমনবৃত্তান্ত।

অতীতে আগ্রা অঞ্চলকে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে দিল্লীর বাদশাহদের যে কীর্তি-কাহিনী গড়ে উঠে, লেখক তা বিভিন্ন আলোকচিত্র সহ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থে লেখকের পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে।

লেখক প্রাচীন-কীর্তি-কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও তাদেব আচাব-আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিববণ দিযেছেন।, যার ফলে গ্রন্থটি বিষয়-বৈচিত্র্যে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তবে এই বর্ণনা লেখকের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেনি। আগ্রার জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও আচাব-আচরণ প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

ক) এ দেশের স্ত্রীলোকেবা সচরাচর ঘাগরা পরে, মাঝে মাঝে চুনরী শাড়ী পরিতেও দেখা যায়। আঙ্গিয়া গায়ে দিয়া তার উপর ওড়নাতে সমস্ত গা ঢাকা। ঘোমটা ছাড়া খালি মাথায় চলাফিরা করে না। মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেই পুরুষের মত ইজার পরিয়া পিরাণ গায়ে দেয়, তার উপর উড়না উড়ে। কখনও কখনও আঙ্গিয়াও গায়ে দেয।"

খ) "এ দেশে বর বাঙ্গালীর মত চেলী পরিযা বিবাহ করিতে যায় না। জড়ির কাজ করা বেশ-ভূষায় খুব জাকজমকের সহিত সেজেগুজে প্রায়ই ঘোড়ায় চড়িয়া বিবাহ করিতে যায়, আর সেই বেশেই বিবাহ করে।... .... যতই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হওক না কেন, কোন পুরুষের বিবাহ দেখিবার অধিকার নাই।"

বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের ফলে গ্রন্থটি হয়েছে সরস ও চিত্তাকর্ষক। বিষয় বর্ণনায় কোনো উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য নেই। গ্রন্থটি সাধুগদ্যে লিখিত এবং ভাষা পরিচ্ছন্ন ও সহজ। লেখকের লিখিত গদ্যের কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল।—

ক) “সকলের মনোরঞ্জনও দেখার জন্য যে সমস্ত জিনিষ ও যন্ত্রপাতি সাজান হইয়া থাকে তাহা দেখিয়া অন্তঃপুরমহিলাদেরও জ্ঞান লাভ এবং আমোদ উপভোগ করা চাই। সেই জন্য ঐ স্থানে পরদা দেওয়া হয়। তখন স্ত্রীলোকেরাই চারিদিকে প্রহরীর কাজ করে, কোন পুরুষ সেখানে যাইতে পারে না।”

খ) “মদন মোহনের পুরাতন মন্দিরের নিকট যে একটি মন্দির আছে, লোকে তাহাকে মদনমোহনের নূতন মন্দির কহে, এবং তাহাতে স্থাপিত বিগ্রহকে মদনমোহন বলিয়া পূজা অর্চ্চনা করে।

গোবিন্দজী ও মদনমোহনের বিগ্রহ বৃন্দাবনে যেমন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গোপীনাথও সেইরূপ। ইহাও এখানে নাই।”

আবার বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লেখকের সরস ও কৌতুককর মন্তব্য বিশেষ উপভোগ হয়েছে। যেমন—

“কি হিন্দু কি মুসলমান, সব শ্রেনীর স্ত্রীলোকেই ভারি ভারি ওজনের গহনা পরিতে ভালবাসে। হাতে পায়ে তাহারা প্রায় একসের কি দেড়সের ওজনের গহনা পরে। হাতের বালা কি পায়ের মল কাহাকেও ছুড়িয়া মারিলে তাহা যদি মাথায় লাগে লোক খুন হইতে পারে।”

গ্রন্থপাঠে অতীত আগ্রার চিত্র যেমন জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে, তেমনই তৎকালীন আগ্রার জনজীবন সম্বন্ধেও একটি সুষ্ঠু ধারনা লাভ করা যায়। গ্রন্থটি আগ্রার একটি ফাটোগ্রাফের মত।

"ত্রিপুরার স্মৃতি"

রাজকুমার সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা

১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৭ইং) মহাবাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পুত্র সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা "ত্রিপুরার স্মৃতি" গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি লেখক মায়ের নামে উৎসর্গ করেছেন। এই গ্রন্থে লেখক ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা জেলার ঐতিহাসিক স্থান সহ প্রাচীন কীর্তি-কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করে প্রাচীন ত্রিপুরার লুপ্ত গৌরবকে তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

গ্রন্থটিকে ঠিক ভ্রমনকাহিনী মূলক গ্রন্থ বলা যায় না, আবার প্রবন্ধ বা পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ হিসাবেও একে চিহ্নিত করা যায় না। এ'কে অতীত-স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ বলা যায়—যা অনেকটা রম্যরচনার পর্যায়ে পড়ে।

আলোচনার সুবিধার জন্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

ক) প্রাচীন জনপদ সম্বন্ধীয়।
খ) প্রাচীন কীর্তি-কাহিনী সম্বন্ধীয়।
গ) ধর্ম সম্বন্ধীয়।

উপরিউক্ত রচনাগুলিতে প্রাচীন ত্রিপুরার বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এইসব তথ্যের মাধ্যমে লেখক ত্রিপুরার প্রাচীন ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ক) প্রাচীন জনপদ সম্বন্ধীয়

পাইট্‌কারা পরগনার অন্তর্গত দুইটি প্রাচীন জনপদ।

পাইট্‌কারা পরগনার অন্তর্গত বরকামতা স্থানটি ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা নগরীর ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে।



তাছাড়া এই পাইট্‌কারার অন্তর্গত নূরনগর পরগনার বাঘাউড়া নামক গ্রামের এক পুষ্করিনী থেকে একটি পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিও উদ্ধাব করা হয়েছে। মূর্তিটি সুন্দর কারুকার্যসম্পন্ন ও প্রায় দুইহাত উঁচু। মূর্তিটির সঙ্গে একটি কুটিল অক্ষরে উৎকীর্ন লিপিও রয়েছে। লেখক এই লিপির ছবিও দিয়েছেন। তাতে লেখা আছে—

> "ওঁ সম্বৎ ৩ মাঘ দিনে ২১ শ্রীমহীপালদেব রাজ্যে কীর্ত্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারকাখ্য সমতটে বিলকীন্নকীয় পরম বৈষ্ণবস্য বনিক্ লোকদত্তস্য বসুদত্ত সুতস্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুন্যয় শোভিত বৃদ্ধয়ে।"

এই লিপির বক্তব্য অনুযায়ী এই প্রমানিত হয় যে, বঙ্গদেশের দক্ষিন -পশ্চিম প্রান্তবর্তী সমতট নামে প্রদেশটি কোন একসময়ে রাজা প্রথম মহীপালের শাসনাধীন ছিল এবং এই বরকামতা গ্রামটি সেইসময়ে সমতট প্রদেশের প্রসিদ্ধ রাজধানী "কর্মন্ত"। অবশ্য এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। তবে এই মতের পক্ষপাতী হলেন, ঢাকা কৌতুক সংগ্রহালয়ের তত্ত্বাবধায়ক নলিনীকান্ত ভট্রশালী ও ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ। তাছাড়া বরকামতা গ্রামে প্রায় বিশ হাত উঁচু ও ত্রিশ হাত প্রস্থ একটি পাষাণ স্তম্ভ মাটির স্তূপের উপর প্রোথিত আছে। স্থানীয় লোকেরা এটিকে শিবলিঙ্গ ভেবে পূজা করে। কিন্তু লেখকের বক্তব্য হলো, এই মাটির স্তূপ খনন করলে হয়তো এই প্রদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

বরকামতা গ্রামের সন্নিকটেই চাঁদিনা গ্রামটি অবস্থিত। সেখানে কতকগুলি প্রাচীন গৃহের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই গ্রামের একটি প্রাচীন পুষ্করিনী থেকে প্রায় তিনহাত উঁচু একটি শিল্পচাতুর্যসম্পন্ন চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্তি পাওয়া গেছে। তাছাড়া সেখানে একটি মাটির স্তূপের উপর ইঁটের তৈরী চতুষ্কোন একটি বেদী আছে। স্থানীয় লোকের ধারণা গ্রামটি মুসলমান ভূ-স্বামীদের অধিকারে থাকার সময় যে ইমাম্‌বাড়া তৈরী হয়েছিল, এই বেদীটি তারই ধ্বংসাবশেষ।

কয়েকটি পাথরের মূর্তিও এখানে পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে "মহাভিনিস্ক্রমণ" মূর্তিটি ঢাকার কৌতুক সংগ্রহালয়ে, আর অন্য মূর্তিগুলি কুমিল্লা

নগরীতে রক্ষিত আছে। মূর্তিগুলির মধ্যে সূর্যমূর্তি ও গনেশ মূর্তির কারুকার্য বিশেষ প্রাশংসনীয়।

ময়নামতী ও তৎসমীপবর্তী প্রাচীন জনপদঃ—

পালরাজগণ ছাড়াও ত্রিপুরার দক্ষিন-পশ্চিম প্রান্তে মেহেরকুল পরগনার অন্তর্গতি কুমিল্লা নগরীর পশ্চিমে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত 'লালমাই' পর্বতমালার সন্নিকক্ষে ময়নামতী'তে খর্গবংশীয় রাজা মানিকচন্দ্র রাজত্ব করতেন এবং তাঁর রানী ময়নামতীর নামানুসারে যে এই স্থানের নামকরণ হয়, লেখক এই জনশ্রুতির উল্লেখ করেছেন। এখানে 'গেপীচাঁদের সুড়ঙ্গ' বলে একটি বিবর আছে। প্রবাদ আছে যে, মাণিক চন্দ্রের পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র বা গোপীচাঁদ মায়ের আদেশ অনুযায়ী 'হরিপা' নামে এক সিদ্ধপুরুষের কাছে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর ঐ বিবরে প্রবেশ করে যোগসাধন করেছিলন। তাছাড়া ওখানে মাটির স্তূপ খননের ফলে ইঁটের তৈরী কয়েকটি ঘরের দরজাসহ একটি বড় প্রাচীর উদ্ঘাটিত হয়েছে। এরফলে, লেখক মনে করেন, সম্ভবতঃ এটি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কোনো চন্দ্ররাজ নির্মিত বৌদ্ধবিহারও হতে পারে এবং গোপীচাঁদ হয়তো এখানে যোগসাধন করতেন। স্তূপটি খনন করলে প্রাচীনকালের নির্মিত নিকেতন এবং কৌতুহলপূর্ণ প্রাচীন ব্যবহারিক জিনিষপত্র, লিপি, তাম্রশাসন ও মুদ্রাদি যে আবিষ্কৃত হতে পারে, লেখক এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এই খননের ফলে হয়তো এক অন্ধকারময় ইতিহাস আবিষ্কৃত হতে পারে বলে লেখক আশা করেন। এই স্থানের আধিবাসীরা জাতি হিসাবে 'যোগী' বলে পরিচিত। এরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চন্দ্র রাজগণের সময় থেকে এখানে বসবাস করছে বলে লেখক মনে করেন। এরা প্রথমে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল এবং পরে তারা ক্রমশঃ হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়েছে বলে লেখক অভিমত প্রোষন করেন। এদের জীবিকার রীতি সম্পর্কে লেখক বলেছেন যে, এই জাতির 'হল' স্পর্শ করা নিষিদ্ধ বলে এরা ভূমিকর্ষণ করে না, ফলে বস্ত্রবয়নই তাদের জীবিকার একমাত্র উপায় এবং এটাই তাদের জাতীয় ব্যবস্থা। তাদের তৈরী বস্ত্র পূর্ববঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ।

'ময়নামতী'র পাশে নিশ্চিন্তপুর নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের কাছে লালমাই পর্বতগাত্রে কয়েকটি ইঁটের স্তূপ আছে। এই ইঁটের স্তূপগুলি সম্পর্কে স্থানীয় জনশ্রুতি আছে যে, ময়নামতীর রাজা মাণিকচন্দ্র ও তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্র এখানে রাজধানী স্থাপন করে যেসব অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন, এইগুলি তারই ধ্বংসস্তূপ। লেখক অনুমান করেন, স্থানীয় বা অন্য অঞ্চলে অধিবাসীরা ইঁট নেবার ছলে বা গুপ্তধনের লোভে হয়তো এইসব সুরম্য অট্টালিকাগুলি বিধবস্ত করেছে। লোভের বশবর্তী হয়ে লোকে যে এইসব প্রাচীন কীর্তিগুলি বিলুপ্ত করে, সেইজন্য লেখক দুঃখপ্রকাশ করেছেন। এখানে একটি পাথরের নারায়ণ মূর্তিও উদ্ধার করা হয়েছে।

'ময়নামতী'র উত্তর-পশ্চিমে তিন মাইল দূরে 'বেরল্ল' নামে গ্রামটির পেছনে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেঁও বলেন, 'বেরল্ল' নামটি বেরুদের নামে এক রাজপুত্রের নাম অনুযায়ী হয়েছে, যিনি এই অঞ্চলের জনৈক রাজা কুসুমের পুত্র ছিলেন। আবার অনেকের মতে, মেহেরকুল পরগনা চন্দ্ররাজাদের আয়ত্তে থাকার সময় এই বেরল্ল গ্রামই 'করুমন্ডপুর' নামে তাঁদের রাজধানী ছিল, তবে এই সম্পর্কে যথাযথ কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে এখানে প্রাপ্ত নটেশ্বর মহাদেব, গনেশ, জগদ্ধাত্রী, কালভৈরব, বুদ্ধ, জম্ভন প্রভৃতি পাথরের তৈরী মূর্তি পাওয়ার ফলে এই ধারণা হয় যে, বৌদ্ধধর্মের অবসানকাল থেকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকাল পর্যন্ত এইসব স্থান একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ বা কোনো রাজার রাজধানী ছিল বলে লেখক অভিমত পোষন করেন।

লালামাই পর্ব্বতপ্রান্ত দেশস্থ কতিপয় স্থানঃ—

কুমিল্লা নগরীর পশ্চিমপ্রান্তে লালমাই পাহাড়ে কোট্‌বাড়ী, শালবানপুর, ভোজরাজার কোট আনন্দরাজার কোট প্রভৃতি স্থান আছে। এই সব স্থানে কিছু প্রাচীন নিদ্রর্শন থাকায় জনশ্রুতি আছে যে, কোনো একসময় কয়েকজন রাজা-এই স্থানগুলিতে রাজত্ব করতেন।

কোট্‌বাড়ীতে কয়েকটি ইঁটের তৈরী প্রাসাদ ও প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ ছিল। বর্তমানে স্তূপীকৃত ইঁট ছাড়া আর কিছু নেই। তবে নামকরণ ও নিদর্শনাদির মাধ্যমে অনুমান করা যায় যে, এখানে দুর্গ ও প্রাসাদ ইত্যাদি একসময় ছিল।

কোট্‌বাড়ীর দক্ষিণে একমাইল দূরে 'শালবানপুর' স্থানটি রাজা গোপীচন্দ্রের গুরু সিদ্ধাচার্য 'হরিপা' ও 'চৌরঙ্গী'র জন্মস্থান বলে সেখানে জনশ্রুতি আছে। কথিত আছে যে, হরিপার পিতা রাজা শালবানের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হয় এবং উক্ত রাজার নামানুসারে সেখানে একটি বড় সরোবরও আছে।

কোট্‌বানীর উত্তরে, আধমাইল দূরে 'ভোজরাজার দীঘি' নামে যে একটি প্রসিদ্ধ সরোবর আছে, তার পশ্চিমদিকে কয়েকটি ইঁটের তৈরী বাসভবন বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে, এইগুলি সেই প্রদেশের রাজা ভোজের রাজপ্রসাধ ছিল। উপরিউক্ত দীঘি'র উত্তর দিকে আনন্দসাগর নামে একটি প্রসিদ্ধ পুষ্করিনীর পশ্চিমপ্রান্তে ইঁটের তৈরী কয়েকটি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। জনশ্রুতি আছে যে, আনন্দ নামে এক রাজা এই অঞ্চলে কোনো একসময় রাজত্ব করেছিলেন। এই ধ্বংসাবশেষ তাঁর তৈরী রাজপ্রাসাদ এবং এই রাজার নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয় 'আনন্দরাজার কোট' তবে এইসব বিবরণের পেছনে জনশ্রুতি ব্যতীত অন্য কোনো প্রামানিক তথ্য পাওয়া যায় না।

রাজা ভবচন্দ্রের বিধ্বস্ত নিকেতন ঃ—

কুমিল্লা নগরীর দক্ষিনে প্রায় ২০ মাইল দূরে চৌদ্দগ্রাম পরগনার অন্তর্গত ঈশানচন্দ্র নগর ও ভজনমুড়া বা ভচনমুড়া নামে দুইটি গ্রাম আছে। এই দুই গ্রামের মাঝামাঝি একটি প্রান্তরে স্তূপীকৃত ইঁট রয়েছে দেখা যায়। জনশ্রুতি আছে, ভবচন্দ্র নামে এক বাতিকগ্রস্ত রাজা সেখানে কোনো একসময়ে রাজত্ব করতেন এবং এই স্তূপীকৃত ইঁটগুলি তাঁরই রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। রাজা ভবচন্দ্র ছিলেন উভট প্রকৃতিসম্পন্ন। ফলে তাঁর উভট কার্যকলাপের বিভিন্ন হাস্যকর কাহিনী সেখানকার লোকসমাজে প্রচলিত। সম্ভবতঃ ভবচন্দ্রের নামানুসারে 'ভবচন্দ্রমুড়া' নাম হয় এবং পরবর্তীকালে হয়তো লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে ভজনমুড়া বা ভচনমুড়া নাম হয় বলে লেখকের ধারণা।

ভজনমুড়া বা ভচনমুড়া এই ইঁটের স্তূপ সম্পর্কে লেখকের ধারনা— হয়তো এই স্তূপ প্রাচীন কোনো বৌদ্ধবিহার ও নিকেতনের ধ্বংসাবশেষ। উপরি-উক্ত রচনাগুলি অনুধাবন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অতীতে কুমিল্লা নগরীর দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলি কয়েকজন বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মাবলম্বী রাজার শাসনাধীনে ছিল।

প্রায় ৫০০ বছর আগে বীরমণি হাজারী নামে এক ত্রিপুর রাজকর্মচারী চৌদ্দগ্রাম পরগনার পূর্বদিকে অবস্থিত খন্ডল পরগনায় একটি পুষ্করিনী খনন করার সময় একটি পাথরের শিবশক্তির প্রতিমূর্তি দেখতে পেয়ে মূর্তিটিকে 'নূতন অগরতলা' নগরীতে স্থানান্তরিত করেন। মূর্তিটি বর্তমানে 'উমা-মহেশ্বর' নামে খ্যাত, মূর্তিটির পায়ের নীচের অংশে যে লিপি আছে, তা ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক পন্ডিত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ পাঠোদ্ধার করেছেন। তাতে জানা যায়, শ্রী তড়ঙ্গ চন্দ্র দেব নামে একজন রাজা কোন্নোক নামে একজন শিল্পীকে দিয়ে এই মূর্তিটি করিয়েছিলেন। ত্রিপুরার দক্ষিন-পশ্চিম প্রান্তের বিভিন্ন জনপদ থেকে প্রাচীন দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হতে দেখে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কোনো সময়ে এইসব জায়গায় নানাবংশের রাজারা রাজত্ব করে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি গড়িয়েছিলেন।

নূরনগর, সরাইল ও বরদাখাত পরগণার অন্তর্গত কতিপয় প্রাচীন জনপদ। ঃ—

এই প্রবন্ধে লেখক উপরি-উক্ত পরগণাগুলির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন।

বঙ্গদেশের নাটঘর অঞ্চলের দক্ষিনে প্রায় ৩ মাইল দূরে 'টীয়ারা' নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে পাথরের তৈরী একটি দশভূজার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে —হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী নামে জনৈক গ্রামবাসীর পত্নী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মূর্তিটি পান ও গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দশভুজা মূর্তিটির সঙ্গে পাথরের

তৈরী শতদলের উপর একটি হরিমূর্তি স্থাপিত আছে। মূর্তিটির উপরিভাগে ক্ষুদ্র একটি বুদ্ধমূর্তি দেখে অনেকের ধারণা, এটি বুদ্ধদেবের শিষ্য অবলোকিতের মূর্তি। স্থানীয় লোকের মুখে শোনা যায়, এই মূর্তিটি নবীনগর থানার অন্তর্গত আমোদপুর গ্রামনিবাসী জনৈক সূত্রধরের বাড়ীর পুষ্করিণী খননকালে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

টীয়ারার উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় দুই মাইল দূরে শিবপুর গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই লিঙ্গমূর্তির জন্যই গ্রামের নাম শিবপুর জনশ্রুতি আছে যে, পার্শ্ববর্তী গ্রাম মীরপুর থেকে একটি দুগ্ধবতী গাভী এসে প্রতিদিন এই লিঙ্গমূর্তির উপর দুধের ধারা বর্ষন করতো। শিবলিঙ্গটি কখন এবং কার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, জানা যায় না।

সরাইল পরগণার অন্তর্গত 'উর্সীউরা' গ্রামের মথুরনাথ দাস নামে জনৈক ব্যক্তির বাড়ীর অন্তর্গত একটি প্রাচীন জলাশয়ে তৈরী একটি দ্বিভূজ পুংমূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি হরিমূর্তি নামে পূজিত হচ্ছে যদিও, তবু এটি বুদ্ধদেবের মূর্তি হওয়াই সম্ভব। কারন দ্বিভুজ কোন মূর্তি হিন্দু দেব-দেবীতে দেখা যায় না।

প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর আগে বাঘউড়া গ্রামের জনৈক ভাণ্ডারী মহাশয়ের বাড়ীর পুরানো পুষ্করিণী সংস্কারের সময় একটি নারায়ণ মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটিব পায়ের নীচের লেখা অনুযায়ী জানা যায়, এ'টি বর্তমানে 'বিলকেন্দুআই' গ্রাম নিবাসী বৈষ্ণব বনিক লোকদত্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া এই গ্রামের মুসলমাননেরা কবর খনন করতে গিয়ে ইঁটের কতগুলি বাসভবনের বিধ্বস্ত অংশ পায়। তাতে মনে হয়, ওখানে কোনো বৌদ্ধবিহার অথবা দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বরদাখাত পরজনার 'শ্রীকাইল' নামক গ্রামের একটি মন্দিরে বরদেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ একটি শক্তিদেবীর পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। জনশ্রুতি যে, কালিদাস ব্রহ্মচারী নামে জনৈক সাধক কোনো এক পদ্মবন থেকে একটি পাথরের কালীমূর্তি এনে এই গ্রামে স্থাপন করেন। কিন্তু কিছুদিন পর মূর্তিটি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়। পরে পূজারীরা বারানসী থেকে একটি কালীমূর্তি এনে সেখানে প্রতিষ্ঠা করে।

বরদাখাত পরগণা'র অন্তর্গত লাউর গ্রাম নিবাসী এক ব্যক্তির বাড়ীতে পুষ্করিণী খননকালে একটি তৈরী ছোট চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্তি পাওয়া যায়। এই মূর্তিটি গোকর্ণ গ্রামের পশ্চিমে একটি আখড়ায় স্থাপিত আছে বলে জানা যায়। তাছাড়া নূরনগর, বরদাখাত, সরাইল এই তিনটি পরগনার অন্তর্গত আরও কয়েকটি গ্রাম থেকে প্রাচীনকালের ধাতু ও পাথরের তৈরী বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। এর ফলে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বৌদ্ধধর্মের পতন ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান এই সন্ধিক্ষণে এইসব গ্রামগুলি সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল। উপরিউক্ত পরগনাগুলির বর্তমান নাম মুসলমান আমলে প্রদত্ত হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে পরগনাগুলির অবশ্য অন্যনাম ছিল বলে লেখক অভিমত পোষন করেন।

হীরাপুর ঃ—

কথিত আছে, উদয়পুরের পূর্বদিকে চার মাইল দূরে হীরাপুর নামক স্থানে মহারাজা বিজয়মাণিক্যের মহিষী লক্ষ্মীদেবী মহারাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার ফলে নির্বাসিতা হন। মহারানীর নামানুসারে প্রথমে এই স্থানের নাম হয় লক্ষ্মীপুর। কিন্তু পরে মহারাজা উদয়মাণিক্যের সময়ে মহিষী হীরাদেবী এই নাম বদল করে নিজ নামানুসারে নাম রাখেন হীরাপুর।

"হীরাপুর নাম পূর্ব্বে লক্ষ্মীপুর, ছিল।"
উদয়মাণিক্য রানী হীরাপুর কৈল।।
(রাজমালা—বিজয়মাণিক্য খন্ড)

এখানে কয়েকটি ইঁটের স্তূপ দেখে এই ধারণা হয় যে, সম্ভবতঃ মহিষী হীরাবতী দেবী নিজ নামকে অক্ষয় করে রাখার জন্য এখানে মন্দির ও গৃহাদি নির্মান কবিয়েছিলেন।

খ) প্রাচীন কীর্তি কাহিনী সম্বন্ধীয়
জগন্নাথ দীঘি ও পুরাণ রাজবাড়ী।

কুমিল্লা নগরীর দক্ষিণে চৌদ্দগ্রাম পরগণার আট মাইল দূরে তিষ্ণা পরগণায় 'জগন্নাথদীঘি' নামে একটি প্রসিদ্ধ বড় সরোবর আছে। এই সরোবরটি ত্রিপুরার মহারাজা কল্যানমাণিক্যের পুত্র রাজকুমার জগন্নাথদেব খনন করিয়েছিলেন। এর আয়তন দৈর্ঘ্যে একমাইল। এর তুল্য দীঘি ত্রিপুরা রাজ্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রতিবৎসর চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এখানে মেলা বসে এবং এই উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। এই সরোবর খননের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে পথশ্রমে ক্লান্ত পথিকের বিশ্রাম ও পিপাসা নিবারণার্থে এই জলাশয় স্থাপন করা হয়েছে বলে লেখক মনে করেন।

এই জগন্নাথদীঘি থেকে চার মাইল দক্ষিনে 'পুরান রাজবাড়ী' নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। জানা যায়— মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের সময় ভ্রাতৃবিরোধের ফলে গোবিন্দমাণিক্য ও সহোদর কুমার জগন্নাথদেব রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। গোবিন্দমানিক্য তখন চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে আরাকান অধিপতির আশ্রয়ে বাস করেন আর জগন্নাথদেব উক্ত রাজবাড়ী স্থাপন করে বসবাস করেন। তবে এই ঘটনা নিছক অনুমান মাত্র।

ধর্মসাগর দীর্ঘিকা ঃ—

কুমিল্লা নগরীতে ত্রিপুরার মহাবাজা ধর্মমানিক্যের দ্বারা খনিত দৈর্ঘ্য ৮৩৪ হাত ও প্রস্থে ৫৫৪ হাত একটি দীঘি আছে। মহারাজার নামানুসারে এই দীঘির নাম 'ধর্মসাগর'।

ত্রিপুরার ইতিহাসে মহারাজা ধর্মমাণিক্য ধর্মপরায়ণ ন্যায়বান রাজা হিসাবে চিহ্নিত। লেখক এই প্রবন্ধে উক্ত মহারাজার জীবনচরিতকে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে, সোমবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই দীঘিটি

উৎসর্গ করার সময় মহারাজা একটি তাম্রশাসনের মাধ্যমে অন্যান্য যৌতুকসহ উনিশ দ্রোণ শস্যপূর্ণভূমি আটজন ব্রাহ্মনকে দান করেছিলেন। এই দীঘির উত্তর পারে যে দুটি সুন্দর প্রাসাদ আছে, তা মহারাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্য নির্মান করেছিলেন।

অমরপুর ঃ—

প্রাচীন ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরের পূর্বদিকে প্রায় ১০ মাইল দূরে 'বড়মূড়া' পর্বতমালার পূর্বপ্রান্তে অমরপুর স্থানটি অবস্থিত। এই স্থানটি এক সময় ত্রিপুরার রাজধানী ছিল।

মহারাজা অমরমাণিক্য এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির ইত্যাদি নির্মান করেছিলেন। তাছাড়া এখানে তিনি অমরসাগর নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ দীঘিও খনন করিয়েছিলেন। মহারাজা অমরমাণিক্য কিভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, লেখক এই ইতিহাস বিশদভাবে এই রচনায় বিবৃত করেছেন। কথিত আছে যে, বঙ্গদেশের যবন শাসনকর্তা আরাকানবাসী মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যু প্রভৃতি বহিংশত্রুর আক্রমণ এবং রাজ্যের অন্তর্বিপ্লব থেকে রাজ্যরক্ষার জন্য তিনি উদয়পুর থেকে অমরপুর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এখানে ত্রিতল ভগ্ন প্রাসাদটি মহারাজা অমরমাণিক্যের রাজপ্রাসাদ বলে বিবেচিত। এই রাজ প্রাসাদের প্রবেশপথের দুইদিকে দুইটি কারুকার্যসম্পন্ন পাথরের থাম আছে। থাম দুইটির শিল্পচাতুর্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। রাজপ্রাসাদ ছাড়া মহারাজার কীর্তি হিসাবে আর একটি প্রাসাদ ও কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও সেখানে আছে। তাছাড়া সেখানে 'ফটিকসাগর' নামে আর একটি দীঘি আছে। এই ফটিকসাগর ও অমরসাগরের মাঝামাঝি জায়গায় একটি বিধ্বস্ত মন্দির থেকে গরুড়ারূঢ় দশভুজবিশিষ্ট একটি পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে গ্রামের লোক এই মূর্তিটিকে মঙ্গলচন্ডী বলে পূজা করে।



সুজামসজিদ ঃ—

কুমিল্লার অন্তর্গত সুজাগঞ্জ গ্রামের সুজা মসজিদটি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের দ্বারা নির্মিত হয়। যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল, তা হলো — বাংলা,বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা শাহজাদা সুজা ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবের দ্বারা পরাজিত হয়ে আরাকান অঞ্চলে ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হন। মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যও সেই সময় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যের দ্বারা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আরাকান অধিপতি মঘ রাজার আশ্রয়ে ছিলেন। উভয়ে শাহজাদা সুজাকে সাদরে বরণ কবেন। ত্রিপুরার 'রাজমালা' গ্রন্থের গোবিন্দমাণিক্য খন্ডে এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ আছে।

মহাবাজা গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় বাজা হওয়ার পর এই মিলনের স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত ১০৭৬ ত্রিপুরাব্দে (১৬৬৬ইং) এই মসজিদটি শাহজাদা সুজার নামে নির্মান করেন ও এই গ্রামের নামও তাঁর নাম অনুযায়ী হয় 'সুজাগঞ্জ'।

দেবতা মুড়া ঃ—

ত্রিপুবার দক্ষিণে যে সুদীর্ঘ পর্বতমালা রয়েছে, তাব পশ্চিমে বড়মুড়া নামে ৭৫ মাইল দীর্ঘ একটি পর্বতশ্রেণী আছে। ওম্পিছড়া নামে একটি ক্ষীনকায় নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বড়মুড়া পর্বতের পূর্বদিকে গোমতী নদীব সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মিলনস্থলের কাছে পর্বতের নীচের অংশে শ্রেনীবদ্ধভাবে খোদিত কয়েকটি দেবমূর্তি আছে। তাছাড়া পর্বতের উপরিভাগে গভীর অরণ্যের পর্বতগাত্রে একটি মহিষমর্দিনী দুর্গার প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। এই স্থানটির নাম 'দেবতামুড়া'।

কবে এই মূর্তিগুলি খোদিত হয়েছিল জানা যায় না। তবে লেখকের ধারণা, কোন বিশেষ ঘটনার চিহ্নস্বরূপ অথবা বৌদ্ধধর্মের অবনতির পর হিন্দুধর্মের বিশেষ প্রচারের উদ্দেশ্যে হয়তো এই মূর্তিগুলি খোদিত হয়েছিল। তাছাড়া এই অঞ্চলে কোনো সময় ভাস্কর-শিল্পী ছিল বলে লেখকের ধারণা। এই সব শিল্পীদের হয়তো অন্য দেশ থেকে আনা হয়েছিল।

এই দেবতামুড়া থেকে ১৫মাইল পূর্বে রাইমা-সাইমা নামে দুইটি পার্বত্য নদী মিলিত হয়ে সবেগে নীচে নেমে এসেছে। এটি 'ডুম্বরু' নামে প্রসিদ্ধ গোমতী নদীর উৎপত্তি স্থান। 'ডম্বরু' ত্রিপুরার একটি সুবিখ্যাত জলপ্রপাত। এই অঞ্চলের অধিবাসী মঘ, চাকমা ও রিয়াং প্রভৃতি অশিক্ষিত পার্বত্য জাতিরা এই জলপ্রপাতকে দেবতাস্বরূপ ভক্তি করে এবং ছাগ-মহিষ ইত্যাদি বলিদানের মাধ্যমে পূজা দেয়। এই জলপ্রপাতের উপরে পর্বতশিখরে 'ডম্বরু জাঙ্গাল' নামক স্থানটিতে একসময় একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল।

পিলাক পাথর ঃ—

ত্রিপুরার দক্ষিনপ্রান্তে বিলোনীয়া উপবিভাগের অন্তর্গত 'পিলাক পাথর' নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। এই গ্রামের উত্তরদিকে প্রবাহিত মুহুরী নদীর কাছাকাছি যে দীঘিটি আছে, তা ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্যের শ্যালক বলিভীম নারায়ণ খনন করান বলে কথিত আছে। এই দীঘির নাম তাঁর নামানুসারে রাখা হয় 'বলিভীম নারায়ন দীঘি'।

পিলাক পাথর গ্রামটি পূর্বপিলাক ও পশ্চিম পিলাক এই দুইভাগে বিভক্ত। পূর্ব পিলাকের পশ্চিম প্রান্তে 'দেবদারু' বা 'দেবারু' নামে যে অরণ্য আছে, সেখানে মাটির স্তূপের উপর অষ্টভুজা শক্তিদেবীর মূর্তি আজানুমাটিতে প্রোথিত আছে। এর আয়তন জানু থেকে মস্তক পর্যন্ত প্রায় দুই হাত।

তাছাড়া পশ্চিম পিলাকের অন্তর্গত ঠাকুরানী বাড়ী নামক স্থানে একটি পাথরের চতুর্ভুজ ভাঙ্গা নৃসিংহ মূর্তি মাটির স্তূপের উপর পড়ে আছে। মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই হাত। এই মূর্তির কিছু দূরে একটি ছাদবিহীন বিধ্বস্ত ইঁটের মন্দিরে প্রায় নয় হাত দীর্ঘ এবং দুই হাতের বেশী প্রস্থ একটি বড় পাথরের মূর্তি মাটিতে পড়ে রয়েছে। সেখানকার লোকেরা এটিকে নারায়ণের মূর্তি বলে। উপরি-উক্ত তিনটি মূর্তিই কারুকার্যবিহীন। এই ঠাকুরানীবাড়ী অঞ্চলে স্তূপীকৃত ইঁট দেখে বোঝা যায়, এখানে হয়তো সেনাপতি বলিভীম নারায়ণ প্রসাদ করিয়েছিলেন, সেজন্য এই স্থানটিকে পুরান রাজবাড়ীও বলে।

এই মূর্তিগুলি ত্রিপুরার সেনাপতি বলিভীম নারায়ণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। তবে মূর্তিগুলি যে স্থানীয় অপটু শিল্পীর দ্বারা নির্মিত, তা সহজ অনুমেয়। বিলোনিয়ার অন্তর্গত 'ম তাইছড়া' নামে একটি ছোট নদীতে 'মাতঙ্গিঁনী' নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে বলে জানা যায়।

কল্যাণপুর ঃ—

ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী 'পুরান আগরতলা' থেকে ২০মাইল দূরে 'কল্যাণপুর' নামে একটি জনপদ আছে। এখানে মহারাজা কল্যানমাণিক্য একটি দীঘি খনন করান এবং নিজ নামানুসারে 'কল্যাণসাগর' নামকবণ করেন। এই দীঘির পাড়ে ইঁটের তৈরী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও আছে। কল্যানপুরের পূর্বদিকে বডমুড়া পর্বতেব নানা স্থানে স্তূপীকৃত ও বিকীর্ন ইঁট ও ইঁটের তৈরী প্রাসাদের ভিত্তি এখনও আছে। এইগুলি যে রাজাদের কীর্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নাটঘর ঃ—

ত্রিপুরার জেলার নূরনগর পবগনার অন্তর্গত নাটঘর নামে একটি প্রাচীন গ্রামে স্থাপিত পাথরের শিবমূর্তিটি এই অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধ। অমরনারায়ণ চৌধুরী নামে গ্রামস্থ এক ব্যক্তির জলাশয় থেকে এই মূর্তিকে উদ্ধার কবা হয়। মূর্তিটি দ্বাদশভূজ বিশিষ্ঠ এবং নৃত্যের ভঙ্গীতে অবস্থিত। মূর্তির পদতলে একটি বৃষমূর্তি আছে। এই নটরাজ মহাদেবের নামানুসাবে এই গ্রামের নাম নাটঘর।

'যুগীর পুকুর' নামে একটি প্রাচীন জলাশয় থেকে এই প্রমানিত হয় যে, এই গ্রামে একসময় নাথ বা যোগী সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতো। এই কারণে 'নাথগড়' থেকেও 'নাটঘর' হতে পারে। এই গ্রামে দুইটি দীঘি এবং 'বিবীর পুকুর' ও বাঁদীর পুকুর' নামে দুইটি জলাশয় থেকে মনে হয়, কোনো সময়ে এই স্থানে কোন মুসলমান ভূম্যাধিপতির অধীনে ছিল।



গ) ধর্ম সম্বন্ধীয়

চন্ডীমুড়া ঃ—

কুমিল্লা নগরীর পশ্চিমপ্রান্তে ৬ মাইল দূরবর্তী লালমাই পর্বতের চন্ডীমুড়া নামক স্থানে দুইটি প্রাচীন মন্দির আছে। স্থানীয় লোকেরা এই মন্দির দুইটিকে চন্ডীমন্দির বলে।

মন্দির দুইটি ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের ভ্রাতা জগন্নাথদেবের কন্যা দ্বিতীয়াদেবীর দ্বারা নির্মিত হয়। ত্রিপুররাজাদের জীবনচরিত গ্রন্থ-'রাজমালা—রত্নমাণিক্য খন্ডে' এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। চন্ডীমুড়ার কাছে 'দুত্যার দীঘি' নামে জলাশয়টিও দ্বিতীয়াদেবী খনন করান। জনশ্রুতি যে, ১৩২৫ বঙ্গাব্দে চাঁদপুর নিবাসী নিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধাতু নির্মিত ও সুবর্ণ পত্রে মন্ডিত এক অষ্ঠভূজা শক্তিমূর্তি এই মন্দিরদ্বয়ের একটিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। মূর্তিটি কুমিল্লানিবাসী মহেশচন্দ্র ভট্রাচার্যের সহায়তায় বগাসাইর পরগণার অন্তর্গত দৌলবাড়ী গ্রামের বৈকুন্ঠ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছ থেকে আনা হয়েছিল। মূর্তিটিকে উক্ত গ্রামের এক পুষ্করিনী থেকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু যে বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর মাঘ মাসে মূর্তিটি চুরি হয়।

ঢাকার কৌতুক সংগ্রহালয়ে এই মূর্তির যে ফটো আছে, তাতে মূর্তিটির শিল্পচাতুর্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মূর্তিটির পায়ের নীচের অংশে যে লিপি আছে, তা অনুধাবন করলে জানা যায়, একসময় খর্গবংশীয় রাজারা এই অঞ্চলে রাজত্ব করাকালীন বিজিতারি খর্গরাজ নামে এক রাজার মহিষী প্রভাবতী দেবী এই অষ্টভূজা শক্তিদেবীর ধাতু মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত করেন।

বর্তমানে এই দুইটি মন্দিরের মধ্যে একটিতে সুন্দর কারুকার্যসম্পন্ন একটি দন্ডায়মান দ্বিভুজ নরমূর্তি আছে। জনসাধারণ একে সূর্যমূর্তি বলে। এছাড়া পিতলের তৈরী একটি ছোট আকারের অষ্টভূজা শক্তিমূর্তি ও পাথরের তৈরী একটি চক্র এই মন্দিরে স্থাপিত আছে। এই চক্রটি বিষ্ণুচক্র বলে অভিহিত হয়। এই মন্দিরের উত্তরদিকে আর একটি মন্দির আছে, তারমধ্যে একটি অষ্টধাতুর তৈরী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

চন্ডীমূড়া থেকে প্রায় ১০মাইল দূরে হরিপুর গ্রামে নমঃশূদ্র জাতীয় এক ব্যক্তির গৃহে পাথরের তৈরী একটি দশভূজা মহিষমর্দিনীর মূর্তি স্থাপিত আছে। এর আয়তন দুই হাতের কিছু বেশী হবে। মূর্তিটি সুন্দর কারুকার্যসম্পন্ন। গ্রামের একটি পুষ্করিণী সংস্কারকালে এটিকে পাওয়া যায়।

সতররত্ন বা সপ্তদশরত্ন ঃ—

কুমিল্লা নগরীর পূর্বদিকে জগন্নাথপুর গ্রামে 'সতররত্ন' নামে যে একটি ভাঙ্গা মন্দির আছে, ত্রিপুরার স্থাপত্য শিল্পের এটি একটি চরম নিদর্শন।

কথিত আছে যে, ১০৯২ ত্রিপুরাব্দের (১৬৮২ ইং) শেষভাগে ত্রিপুরার মহারাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করে মারা যান। তারপর দীর্ঘকাল এই মন্দিরের কোনো কাজ হয়নি। পরবর্ত্তী ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৭৬০ইং) ত্রিপুরার ধর্মপ্রবণ মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য মন্দিরের কাজ পুনরায় শুরু করেন। তারপর মহাসমারোহে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার দারুমূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। জগন্নাথ দেবের মূর্তিটির হাতে আঙ্গুল থাকায় ভ্রমবশতঃ লোকে এই ত্রিমূর্তিকে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার প্রতিমূর্তি বলে। মূর্তির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য সেইসময় তুলাপুরুষ, পঞ্চাগ্নি, দানসাগর প্রভৃতি পুন্যকাজ করেন এবং পনের দ্রোণ ভূমি তাম্রশাসনের মাধ্যমে দেবোত্তর প্রদান করেন। তাছাড়া এই গ্রামের সরোবরটিও তিনি খনন করিয়েছিলেন।

'সতররত্ন' মন্দিরের চূড়াটি উচ্চতায় একশ হাত এবং চূড়ার উপর একমন সোনার দ্বারা মন্ডিত একটি তামার কলস আছে। বর্তমানে মন্দিরটির নানা অংশ বিধ্বস্ত অবস্থায় আছে।

এই 'সতররত্ন' মন্দিরের দক্ষিণে একটি মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরটি মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের জননী সুলক্ষনা দেবী নির্মান করিয়েছিলেন। এখানে এই ত্রিমূর্তিকে কেন্দ্র করে প্রতি বৎসর মেলা হয়।

রাজরাজ্যেশ্বরী কালী ঃ—

ত্রিপুরার মহারাজা রত্নমাণিক্য বারানসী থেকে যে একটি পাথরের তৈরী কালীমূর্তি এনে কুমিল্লা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত করেন, তার নাম রাজরাজ্যেশ্বরী কালী। 'ত্রিপুরবংশাবলী' নামে ত্রিপুর রাজাদের জীবন চরিত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ আছে।

এই কালীমূর্তি পূর্বে সংসারত্যাগী গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে পূজিত হলেও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত হয়। মূর্তিটি জাগ্রত বলে সেখানকার জনসাধারনের দৃঢ় বিশ্বাস।

উদয়পুর ঃ—

প্রাচীনকালে ত্রিপুর রাজগণের প্রতিষ্ঠিত বর্তমান উদয় পুর স্থানটি অদ্যাবধি নানা গৌরবময় কীর্তি-কাহিনী বহন করে রয়েছে। এটি পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 'লিকা' সম্প্রদায়ভুক্ত মঘরাজাদের রাজত্বকালে এর নাম ছিল 'রাঙ্গামাটি'। পরবর্ত্তী কালে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ত্রিপুররাজ যুঝারফা লিকা রাজাকে পরাজিত করে রাঙ্গামাটি অধিকার করেন ও রাজধানী স্থাপন করেন। 'রাজমালা' গ্রন্থের যুঝারফা খন্ডে উক্ত কাহিনীর বিশদ বিবরণ আছে।

মহারাজা যুঝারফা বঙ্গদেশের কিছু অংশ জয় করেছিলেন। এই বঙ্গ বিজয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে সেইসময় থেকে ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত বলে অনুমান করা হয়।

ষোড়শ শতকে মহারাজা উদয়মাণিক্য নিজ নামানুসারে এই রাঙ্গামাটি নামকরণ করেন উদয়পুর। মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের সময়ে বিভিন্নরাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় উদয়পুর থেকে সেই সময় রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয় বর্তমান পুরাণ আগরতলায়। মহারাজা যুঝারফা থেকে মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য পর্যন্ত বিভিন্ন রাজারা উদয়পুরে রাজত্ব করার ফলে এখানে বহু দেবমন্দির, রাজপ্রসাদ, জলাশয়, রাজবর্ত্ম প্রভৃতি কীর্তি স্থাপিত হয়। যেমন দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী, মহাদেববাড়ী,

গোপীনাথ মন্দিব, দুত্যার বাড়ী প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেখক রাজাদের এইসব কীর্তিগুলির বিশদ বিবরণ গ্রন্থে দিয়েছেন, যা সংক্ষেপিতভাবে নীচে দেওয়া গেল।

দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী ঃ—

ত্রিপুর রাজাদের স্থাপিত বিভিন্ন দেব-দেবীর মধ্যে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ৫২ পীঠের অন্যতম। যোড়শ শতকের প্রথমভাগে মহারাজা ধন্যমাণিক্য এই দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 'রাজমালা ধন্যমাণিক্য খন্ড' — এ এই সম্পর্কেবিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

মন্দিরগাত্রে মোট পাঁচটি শিলাফলক আছে। পূর্বদিকে দুইটি পাথরের ফলকের লিপিতে মহারাজা ধন্য মাণিক্য ও মহারাজা রামমাণিক্যদেব যে যথাক্রমে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বৃক্ষাদি রোপন করেছিলেন, তার বিবরণ আছে। উত্তরদিকে মন্দিরের গায়ে একটি পাথরেব ফলকেব লিপিটি হলো —

"এ এ তু মাম শ্রীবলিভিম না রা (য়) ণ ত্রিপুরা
শ্রী (হরি) ব (ল্লভ) না রায় (ণ) বিশ্বা (স)
শক ১৬ ৩"

বর্তমানে এই লিপিটির কিছু অংশ বিনষ্ট হয়েছে, ফলে লিপিটি অস্পষ্ট, তবে এই লিপি পাঠে জানা যায় — পরবর্তীকালে রাজা রামমাণিক্যের শ্যালক সেনাপতি বলিভীম নারায়ণ এই মন্দিরের সংস্কার সাধন করে এই লিপি স্থাপন করেন। মহারাজা দুর্গামাণিক্যের মহিষী জগদীশ্বরী দেবীও ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দে (১৮৫৭ইং) এই মন্দিরের সংস্কার সাধন করে একটি লিপি স্থাপন করেন।

দেবীর মন্দির ইঁটের তৈরী। মন্দিরের ভিতর ত্রিপুরাসুন্দরী নামে পাথরের তৈরী সুপ্রসিদ্ধ শক্তিদেবীর চতুর্ভূজা মূর্তি সংস্থাপিত। মূর্তিটি উচ্চতায় সাড়ে তিন হাত। এই মূর্তির পাশে আর একটি প্রায় দুই হাত উঁচু চতুর্ভূজা শক্তিমূর্তি বস্ত্রে

আচ্ছাদিত আছে। জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই মুর্তিই প্রকৃত ত্রিপুরাসুন্দরী নাটমন্দিরের বড় ঘন্টাটি ১২৩৯ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৯ ইং) মহারাজা কাশীচন্দ্রের দ্বারা প্রদত্ত হয়।

মহাদেব বাড়ী ঃ—

উদয়পুরের মহাদেব বাড়ী মন্দিরটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এর নাটমন্দির ইঁটের তৈরী। এখানে আরও দুইটি মন্দির আছে। মন্দিরের দক্ষিণে বিজয়সাগর নামে দীঘিটি মহারাজা বিজয়মাণিক্যের দ্বারা খনিত হয়।

মন্দিরের প্রাচীরটি যে মহারাজা কল্যাণমাণিক্য নির্মাণ করেছিলেন, তা মন্দিরের সিংহদ্বারের উপর স্থাপিত পাথরের ফলকে লেখা লিপিপাঠে জানা যায়, আর মন্দিরগাত্রের শিলালিপি পাঠে জানা যায় — ধন্যমাণিক্য কর্তৃক স্থাপিত এই শিবমন্দির জীর্ণ হলে পরে কল্যাণমাণিক্য বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

গোপীনাথের মন্দির ঃ—

মহাদেব মন্দিরের উত্তরদিকে অবিস্থিত ইঁট-পাথরের সংযোজনে নির্মিত মন্দিরটির নাম গোপীনাথের মন্দির। মন্দির দ্বারের শিলালিপিতে লেখা আছে, ১৫৭২ শকাব্দে মহারাজা কল্যাণমাণিক্য এই মন্দির নির্মাণ করে তারমধ্যে গোপীনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

দুত্যার বাড়ী ঃ—

গোপীনাথের মন্দিরের পূর্বদিকে একটি প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত দুইটি মন্দির আছে। স্থানীয় জনসাধারণ এই মন্দির দুইটিকে 'দুত্যার বাড়ী' বলে। 'দুত্যা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ জানা যায় না। তবে 'দৈত্য' বা 'দ্বিতীয়া' শব্দের অপভ্রংশ হওয়া সম্ভব। যদি তা হয়, তবে এই দুইজনের মধ্যে একজন হয়তো মন্দির দুইটি নির্মাণ করেছিলেন।



'রাজমালা'য় বর্ণিত আছে যে, মহারাজা বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ একটি মঠ নির্মাণ করে তাতে জগন্নাথের বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই সূত্র অনুযায়ী একটি মন্দির দৈত্যনারায়ণের দ্বারা নির্মিত হওয়া সম্ভব। মহারাজা রামমাণিক্যের শ্যালক সেনাপতি বলিভীম নারায়ণের কন্যা দ্বিতীয়া দেবীর দ্বারাও মন্দির দুইটি নির্মিত হতে পারে। আবার কুমার জগন্নাথদেবের কন্যা দ্বিতীয়া দেবীর দ্বারাও নির্মিত হওয়া সম্ভব।

গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী গুণবতী দেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দিরঃ—

দুত্যার বাড়ীর পূর্বদিকের একটি প্রাঙ্গণে তিনটি মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরগুলিকে বিষ্ণুমন্দির বলা হয়। মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী গুণবতী দেবী এই মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন।

জগন্নাথের দোল ঃ—

উদয়পুর জগন্নাথ দীঘির পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে যে পাথরের মন্দিরটি আছে, এটিকে 'জগন্নাথের দোল' বলে। মন্দিরটি পাথরের প্রাচীরাদ্বারা বেষ্টিত। এই মন্দিরে একসময় জগন্নাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু মন্দিরের শিলালিপি পাঠে জানা যায় — মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁর ভ্রাতা জগন্নাথদেব একত্রে মায়ের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুর নামে এই মন্দিরটি উৎসর্গ করেন। বর্তমানে ত্রিপুরেশ্বরী দেবী ও মহাদেব ছাড়া মন্দিরে আর কোনো বিগ্রহ নেই।

উদয়পুরের প্রধান রাজপ্রাসাদ ঃ—

গোমতী নদীর উত্তর তীরে একটি সু-প্রসিদ্ধ রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে। স্থানীয় জনসাধারণ এটিকে গোবিন্দমাণিক্যের প্রাসাদ বলে। বর্তমানে এই ভগ্ন প্রাসাদ, একটি মন্দির ও কিছু স্তূপীকৃত ইঁট ব্যতীত আর কিছু নেই।

ভগ্ন প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায় — মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য পিতার স্বর্গ লাভের উদ্দেশ্যে ১৫৯৯ শকাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করে তাতে নারায়ণের বিগ্রহ স্থাপন করেন।

উদয়পুরে আরও অনেক কীর্তি চিহ্ন আছে। যেমন — ছত্রমাণিক্য, ধ্বজমাণিক্য ও কাশীচন্দ্রমাণিক্যের নির্মিত প্রাসদের ভগ্নাবশেষ, নাজিরের জাঙ্গাল, ডম্বরুর পথ, প্রাচীন সেনানিবাস, দুইটি সরোবরের মাঝখানে জলটুঙ্গি ও ফুলটুঙ্গি নামে দুইটি ভবনের ধ্বংসাবশেষ; 'লোকপলানী' নামে খ্যাত একটি দ্বিতল ভবন, চাঁদ-সুরুজের, পুল, ফুলকুমারীর কুঞ্জ নামে একটি ছোট পর্বত এবং ফুলকুমারী দীঘি, প্রভৃতি কীর্তিচিহ্নগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিজয়নগর, অমরসাগর, চন্তাইয়ের দীঘি প্রভৃতি জলাশয়, বদর মোকাম, গাজীর দরগাহ, মোগল মস্‌জিদ প্রভৃতি মুসলমানদের ভজনালয় প্রভৃতি কীর্তিচিহ্নগুলি আজও উদয়পুরের তথা ত্রিপুরার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দেয়।

ঊণকোটি ঃ—

ত্রিপুরা রাজ্যের ঊণকোটি একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পার্বত্য তীর্থ, বলে পরিগণিত। এই তীর্থটি ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর প্রান্তে কৈলাসহর নামে উপবিভাগের অন্তর্গত। স্থানে স্থানে কৈলাস অধিপতি মহেশ্বরের মূর্তি খোদিত এবং দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই তীর্থের নাম হয় ঊণকোটি। আর ঊনকোটিশ্বরের নামানুযায়ী এই পরগণার নামকরণ হয় কৈলাস-হর। পরবর্তীকালে লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে 'কৈলাসহর' হয়েছে। এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'ঊণকোটি মাহাত্ম্য' নামে কয়েকটি হাতের লেখা গ্রন্থ রয়েছে। এইসব গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় — বিন্ধ্যগিরির অন্তর্গত বরবক্র বা বরাক্ নদী ও তার দক্ষিণে প্রবাহিত মনু নদীর মধ্যবর্তী ভূখন্ডে ঊণকোটি নামে যে পর্বত আছে, প্রাচীনকালে মহামুনি কপিল এই ঊণকোটিতে তপস্যা করে এখানে 'কপিলতীর্থ' ও লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া সংস্কৃত ও বাংলা রাজমালার বর্ণনানুযায়ী জানা যায় — মহেশ্বর এই



ঊণকোটিতে গুপ্তভাবে থাকায় সত্যযুগে মনুরাজা এখানে মনুনদীর তীরে বসে জপতপের মাধ্যমে এই দেবতার আরাধনা করেছিলেন বলে এই মনুনদী আজও পুণ্যময় বলে বিবেচিত। অবশ্য 'ঊণকোটি মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বিন্ধ্যগিরির নামোল্লেখের কারণ জানা যায় না। তবে লেখক ঊণকোটির প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তবে এটি যে একটি সুপ্রাচীন তীর্থ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহারাজা কুমার যে ছাম্বলনগরে গিয়ে শিবভজনা করেছিলেন, তা সংস্কৃত 'রাজরত্নাকর' ও বাংলা 'রাজমালা'য় বর্ণিত আছে। ছাম্বলনগর অতীতে ঊণকোটির কোন্ জায়গায় অবস্থিত ছিল, তা নির্ণয় করা বর্তমানে দুরূহ হলেও এই স্থানটি যে ঊণকোটি পর্বতের কোনখানে ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহারাজা কুমার এই পর্বতে স্থাপিত কোনো একটি শিবমূর্তির উপাসনা করেছিলেন। তাছাড়া ঊণকোটি পর্বতের উপরে মহারাজা ত্রিলোচন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটিও এই স্থানের প্রাচীনত্বকে বিশেষভাবে প্রমাণ করে।

ত্রিপুরার মহারাজারা যে এই প্রদেশে ও শ্রীহট্টে রাজত্ব করেছিলেন, তার নিদর্শন এখনও আছে। এখানে কয়েকটি ইঁটের তৈরী প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই ভগ্ন প্রাসাদগুলি 'আদি ধর্ম্মফার' রাজপ্রাসাদ বলে কথিত। তিনি এখানে এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করতে গিয়ে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১৬ হাত একটি ইঁটের কুন্ড তৈরী করে ৫১ জন মৈথিলী ব্রহ্মণকে ঊণকোটিতে সাদরে ডেকে এনেছিলেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হলে তিনি এইসব ব্রাহ্মণদের দুইটি তাম্রশাসনের মাধ্যমে ভূমিদান করেন। এখনও উক্ত ব্রাহ্মণদের বংশধরদের কাছে এই তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। কথিত আছে যে, উক্ত 'কৈলাস-হর' নাম এই 'ধর্ম্মফা' কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল।

ঊণকোটি পর্বতের উচ্চতা ১০০ হাতের কিছু বেশী। পর্বতারোহণের সময় কয়েকটি প্রাচীনকালের তৈরী সোপান পর্বতগাত্রে দেখা যায়। এই পর্বত শিখর থেকে একটি জলস্রোত সবেগে নীচে নেমে এসে তিনটি পাষাণকুন্ডে পতিত হয়েছে। সবচেয়ে নীচের কুন্ডু থেকে এক ক্ষীণকায়া স্রোত পর্বতের নীচে প্রবাহিত হয়েছে। এই পর্বতের নানাস্থানে পাথরের গায়ে বহু মূর্তি খোদিত আছে। তাছাড়া আলাদাভাবে

বহু মূর্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নানাস্থানে পড়ে রয়েছে। তবে মূর্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, একই সময়ে এক ব্যক্তির দ্বারা এই মূর্তিগুলি নির্মিত হয়নি। পর্বতগাত্রে খোদিত মূর্তিগুলিতে কোনো শিল্পচাতুর্য নেই, কিন্তু আলাদাভাবে থাকা মূর্তিগুলিতে আবার বিশেষ শিল্পচাতুর্য বর্তমান।

উপরি-উক্ত তিনটি কুন্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ কুন্ডটির পাশে একটি বড় পাথর কেটে এক বিশাল মস্তকনির্মিত হয়েছে। এই মূর্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি ত্রিণয়ন বিশিষ্ট এবং দন্ড বিকশিত। তাছাড়া কুন্ডল আছে। মস্তকটি ঊণকোটিশ্বর কালভৈরব নামে খ্যাত।

এর কিছুদূরে দুই হাত পরিধি সম্পন্ন আর একটি মস্তক আছে। এই মূর্তিটিকে স্থানীয় জনসাধারণ বিষ্ণুমূর্তি বলে। আবার কেও কেও একে সূর্যমূর্তিও বলে। তাছাড়া ওখানে একটি ঘরে যে ত্রিমুখ পাথরের মূর্তি আছে, লোকে মূর্তিটিকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরর মূর্তি বলে। মূর্তিটির কারুকার্য বিশেষ প্রশংসনীয়। এইরূপ কারুকার্য সম্পন্ন আর একটি চতুর্মুখ পাথরের মূর্তি মাটিতে প্রোথিত আছে, জনসাধারণ একে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রঘ্নের মূর্তি বলে। কিন্তু মূলতঃ এটি ব্রহ্মার মূর্তি। মূর্তিগুলির কারুকার্য দেখে মনে হয়, কোনো বিদেশী সুদক্ষ শিল্পীর দ্বারা এইগুলি নির্মিত হয়েছিল।

পর্বতের উপরিভাগে একটি পঞ্চমুখ ও অষ্টভুজ বিশিষ্ট ধনুর্ধারী মূর্তি ও তারপাশে দ্বিভুজ বিশিষ্ট আর একটি মূর্তি আছে। মূর্তি দুইটি যথাক্রমে রাবণ ও মন্দোদরীর প্রতিমূর্তি বলে খ্যাত। সেখানে একটি গাছের নীচে একটি গণেশ মূর্তি ও কয়েকটি পাথরের মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলি বিশেষ প্রাচীন নয় বলে অনুমেয়।

উক্ত তিনটি কুন্ডের মধ্যে নীচের কুন্ডটির উপরিভাগে পর্বতগাত্রে সৌষ্ঠবহীন অনেকগুলি মূর্তি খোদিত আছে, তারমধ্যে একটি ভগীরথের প্রতিমূর্তি বলে খ্যাত। একটি পাথরে দুইটি ধনুর্বাণধারী মূর্তি খোদিত আছে, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা এই মূর্তি দুইটিকে লব-কুশ বলে অভিহিত করে।

এই মূর্তিগুলি কখন, কোন্ সময়ে ও কার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল জানা যায় না। তবে স্থানীয় প্রবাদ যে, এইসব মূর্তিগুলি কালু কামার নামে জনৈক ব্যক্তির দ্বারা নির্মিত হয়।

ঊণকোটি তীর্থে প্রতি বৎসর অশোকাষ্টমী তিথিতে এক মেলা হয়। নানাস্থানের লোকেরা এই সময় পুণ্যার্থে এখানে এসে জড় হয়। ফলে এই নির্জন পার্বত্য প্রদেশ ক্ষণকালের জন্য কোলাহলে মুখরিত হয়।

কসবা ঃ—

ত্রিপুরা জেলার নূরনগর পরগণার অন্তর্গত কসবা নামে স্থানটি পূর্বে কৈলারগড় নামে অভিহিত হতো, যেহেতু কোনো একসময় এই স্থানটি কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ছিল।

এখানে মহারাজা ধন্যমাণিক্যের মহিষী কমলাদেবী নিজ নামানুসারে 'কমলাসাগর' দীঘিটির প্রতিষ্ঠা করেন। এই দীঘির পূর্বতীরে অবস্থিত মন্দিরে একটি অষ্টভুজা ভগবতীর পাষাণমূর্তি স্থাপিত আছে। কথিত আছে যে, মূর্তিটি কল্যাণমাণিক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মূর্তিটি পূর্বে শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত কাসিমনগর পরগণার মধ্যবর্তী ধর্ম্মসর গ্রামের অধিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে ছিল। মহারাজা কল্যাণমাণিক্য পরে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মূর্তিটিকে সেখান থেকে এনে উক্ত কৈলারগড় দুর্গে স্থাপন করেন। ত্রিপুর বংশাবলী গ্রন্থে এই বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ আছে। মূর্তিটির নীচে শিবলিঙ্গ খোদিত থাকায় সকলে এটিকে কালীমূর্তি নামে অভিহিত করে। এই শক্তিদেবী ত্রিপুরার সর্বত্র কসবার কালী নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে উক্ত দুর্গটির কোনো চিহ্ন মাত্র নেই।

এই অঞ্চলের মহারাজা কল্যাণমাণিক্য নিজ নামে 'কল্যাণসাগর' দীঘিটি খনন করিয়েছিলেন। কসবা কালীবাড়ীতে প্রতি বৎসর অমাবস্যা তিথিতে বিরাট মেলা হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু লোকের সমাগম হয়।

রাধানগর গ্রামস্থ পঞ্চরত্ন মন্দির ঃ—

ত্রিপুরা জেলার উপবিভাগ ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ার পূর্বদিকে ও আখাউড়া গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে কালীগঞ্জ নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। এই গ্রামটির বর্তমান নাম রাধানগর। এই গ্রামের দুইটি দীঘির মাঝখানের ভূখণ্ডে রাধামাধবের মন্দির নামে একটি প্রাচীন মন্দির স্থাপিত আছে। মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য উদয়পুর থেকে পুরাণ আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করার পূর্বে উক্ত দুইটি দীঘি খনন করান।

১১৮৫ ত্রিপুরাব্দে (১৭৭৫ইং) ধর্মপরায়ণা রাণী জাহ্নবী দেবী এই মন্দির নির্মাণ করে তাতে রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরের কিছু অংশ বিধ্বস্ত হওয়ায় মূর্তিদ্বয় অন্য গৃহে স্থানান্তরিত হয়। রাধামাধবের বিগ্রহ ছাড়া জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার যে দারুমূর্তি রাণী জাহ্নবী দেবী এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা এখনও সেখানে আছে। এই মন্দির সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের জীবনচরিত 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থে আছে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত ১৬৮৯ শকাব্দের (১৭৬৭ খ্রীঃ) একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে, যাতে জানা যায় — রঘুনাথ দাস নামে জনৈক ব্রজবাসী মহান্ত পূজার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।

'ত্রিপুরার স্মৃতি' গ্রন্থটি একটি তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। গ্রন্থটিতে লেখক প্রাচীন ত্রিপুরা ও তার কীর্তি কাহিনীকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, এবং তা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে বিষয় সম্পর্কিত প্রাচীন ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের আপ্রাণ চেষ্টাও করেছেন। 'জগন্নাথ দীঘি', 'ধর্মসাগর দীর্ঘিকা', 'অমরপুর', 'কল্যাণপুর' প্রভৃতি রচনাগুলিতে যথাক্রমে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, ধর্মমাণিক্য, অমরমাণিক্য ও কল্যাণমাণিক্যের জীবন কাহিনী প্রাসঙ্গিকভাবে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এইক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে লেখক ত্রিপুরার মহারাজাদের জীবনচরিত গ্রন্থ 'রাজমালা'কে ভিত্তি করেছেন।

কোনো কোনো কীর্তিব সঠিক ইতিহাস না পেলে লেখক স্থানীয় কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির উপর নির্ভব কবে তার প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এইক্ষেত্রে আমাদেব বিশ্বাস হযতো কিছুটা শিথিল হতে পারে, কিন্তু লেখক যে সত্য নির্ণয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তা গ্রন্থটি পাঠ করলে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তিনি প্রামাণ্য হিসাবে মন্দির গাত্রের শিলালিপি, রাজাদের তাম্রশাসন ইত্যাদির উপর নির্ভর করেছেন। যেখানে অনন্যোপায় হয়েছেন, সেখানে তিনি কিংবদন্তী বা জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়েছেন।

বর্তমান ত্রিপুরা থেকে প্রাচীন ত্রিপুরার পরিধি যে অনেক বড় ছিল, তা গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। মহাবাজাদের বিভিন্ন কীর্তি-কাহিনী তুলে ধরতে গিয়ে লেখক ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ স্থানগুলির অবস্থান সম্পর্কে ভৌগোলিক বিবরণ যথাযথভাবে দিয়েছেন, যাবফলে গ্রন্থটি ত্রিপুবা প্রসঙ্গে একটি বিশেষ পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় রয়েছে।

গ্রন্থেব রচনাগুলি অত্যন্ত সরস ও মনোজ্ঞ। লেখক সাধুভাষার মাধ্যমে সাবলীলভাবে প্রাচীন ত্রিপুরাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ও তার কীর্তি কাহিনীকে জানতে হলে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। এইদিক থেকে গ্রন্থটির মূল্য অপবিসীম।

" ভারতীয় স্মৃতি" ঃ—

মহারাজা বীবচন্দ্রেবপুত্র রাজকুমার সমবেন্দ্রে চন্দ্র দেববর্মা ত্রিপুরার একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তিনি নিঃসন্দেহে সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাস, ভ্রমনমূলক সাহিত্য, অনুবাদ কাব্য প্রভৃতি পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হয়। তিনি যে উর্দু ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন, তাব প্রমাণ পাওয়া যায তাঁব রচিত আবুগফর বাহাদুব শাহের উর্দু কবিতার বঙ্গানবাদে এবং "ত্রিপুবা স্মৃতি" গ্রন্থটি উর্দু ভাষায রূপান্তরিত কবার পেছনে। বিষয়-বৈচিত্র্য তাঁর রচিত সাহিত্যেব একটি লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে লিখে তিনি ত্রিপুরার সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেন।

সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাব লেখা "ভারতীয় স্মৃতি" গ্রন্থটি ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৬)ইং প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিকে ভ্রমনমূলক সাহিত্য বলা যায়। গ্রন্থের



অবতরনিকা অংশে লেখক গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করেছেন—

> "স্বীয় কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য আমি নানা স্থানের প্রাচীন মূর্তি ও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ প্রভৃতির যে সমস্ত আলোকচিত্র গ্রহন করিয়াছি, তন্মধ্যস্থ কতগুলির আলোকচিত্র সহ বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। তবে প্রয়োজনানুসারে তৎসমুদয়ের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যাহা উল্লেখ করিতে হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপে করিয়াছি। .... বস্তুতঃ যে সমুদয় প্রাচীন কীর্তিমালার বিষয় পুস্তকাকারে বিবৃত হইতে দেখি নাই, তৎসমুদয়ের বিষয় বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য।"

এই গ্রন্থে ভারতের কিছু সংখ্যক কীর্তি-কাহিনী সম্বলিত ঐতিহাসিক স্থানের আলোকচিত্র সহ বিবরণ আছে। লেখক যে ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীব মাধ্যমে এইসব ঐতিহাসিক স্থানগুলি অবলোকন করেছেন, তা গ্রন্থ পাঠে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

গ্রন্থে আলোকচিত্র স্থানগুলি হলো—

পুরী জিলা— বরুনীগড়, ধবলী।

গয়া জিলা— কাওয়াডোল, বরাবর পর্বত, নাগার্জুন পর্বত, ধরাওত, দাপ্থু, শেরঘাটি ও গুনেরী, উমেগা, দেওগ্রামস্থিত সুর্য-মন্দির, পালী, কেস্পা, ঘেঁজনা, সীতামারী।

শাহাবাদ জিলা— রোহিতাশ্ব দুর্গ, ভোজপুর।

এলাহাবাদ জিলা—কৌশাম্বী, বিতভয় পত্তন, প্রতিষ্ঠানপুর, জতুগৃহ।

লেখক এই গ্রন্থে উপরিউক্ত স্থানগুলিব ভাবতীয় ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন কীর্তির বিস্তারিত বিববণ দিয়েছেন। কোনো প্রবন্ধে প্রাচীন কীর্তিকে আশ্রয় কবে প্রাসঙ্গিকভাবে বাজাদের ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। পুরী জেলার অন্তর্গত বারুনী

পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত বারুনীগড় দুর্গকে ভিত্তি করে উৎকল রাজাদের রাজত্বের সম্যক ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। তবে ইতিহাস এখানে লেখককে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করেনি, বরং ইতিহাসের সহযোগিতায় মূল বক্তব্য কাহিনী সরস ও মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। যে সব পুরাকীর্তি অদ্যাবধি অবহেলিত থেকে গেছে, লেখক এই গ্রন্থে সেইসব কীর্তির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এবং এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

প্রবন্ধগুলিতে উচ্ছ্বাসের কোনো প্রাবল্য নেই, বরং বিষয় সন্নিবেশে ও বর্ণনা নৈপুণ্যে প্রবন্ধগুলি হয়েছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক। প্রবন্ধগুলি সাধুগদ্যে লিঘিত। ভাষা অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল হওয়ায় পাঠকের মনকে অতি সহজে আকৃষ্ট করে।

গ্রন্থের গদ্যভাষার দুইটি নমুনা দেওয়া গেল—

ক) "এই অঞ্চলে যে কয়েকটি দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে কতগুলির অবস্থা ভাল, আর কয়েকটির অবস্থা উত্তম বলিয়া বোধ হইল না। একটি মন্দির বৃক্ষ লতাদির পরিবৃত হইয়া ধ্বংস পথে দাঁড়াইযাছে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, বহুদিন পূর্ব্বে জনৈক ব্যক্তি এই মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার নির্মানকার্য্য শেষ হওয়ার কিছুদিবস পরেই সেই ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় মন্দিরে কোন দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।"

খ) " উল্লিখিত বেদীর চতুষ্পার্শ্বে বিকীর্ন, রথোপরি ভাস্কর প্রভৃতি নানাবিধ মূর্তি খোদিত কতিপয় প্রস্তরফলক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই সমুদয় বেদীতে সমাবেশপূর্ব্বক প্রাগুক্ত চতুর্মুখবিশিষ্ট শিলাস্তম্ভ সমেত যে এক আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়েছিল, তাহা অন্যান্য চিত্রের সহিত এই পুস্তকে প্রদত্ত হইল। ঐ সমস্ত প্রস্তরফলক ও পূর্ব্বে বর্ণিত বিধ্বস্ত দুর্গের অভ্যন্তর হইতে আনীত বলিয়া স্থানীয় লোকমুখে অবগত হওয়া যায়।"

পরিশেষে বলা যায়, অজানাকে জানার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভ্রমণকারীদের পক্ষে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অপরিহার্য।

ত্রিপুরেশ্বরের উদয়পুর পরিভ্রমণ

(মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর)

লেখক — নীলকণ্ঠ সেন

৮



ত্রিপুরার মহারাজা যে বিশেষ বিশেষ কারণে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতেন, তাঁর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় তাঁদের স্বহস্ত লিখিত ডায়েরীমূলক রচনায় এবং রাজ -পার্শ্বচরদের লিখিত বিবরণীতে। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের উদয়পুর পরিভ্রমণের বিস্তৃত কাহিনী নিয়ে রাজ-পার্শ্বচর নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় "ত্রিপুরেশ্বরের উদয়পুর পরিভ্রমণ" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

গ্রন্থ রচনার প্রকাশকাল গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি তবে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর যে রাজমহিষী ও পারিষদবর্গসহ ১৩২১ ত্রিপুরাব্দের ৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী, ১৯১১ইং, আগরতলা থেকে উদয়পুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, লেখক তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর রাজ্যে আভ্যন্তরীন অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ত্রিপুরার প্রাচীনতম ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে উদয়পুব গিয়েছিলেন।

. লেখক মহারাজাব ভ্রমনকাহিনী বিবৃত কবার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্যেরও বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণে জানা যায়, সেই সময় ত্রিপুবাব পার্বত্য পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল। যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় পায়ে হেঁটে

জনসাধারণকে দূরাঞ্চল পাড়ি দিতে হতো। মহারাজারা অবশ্য হাতীতে চড়ে পরিভ্রমণ করতেন। হাতীর জন্য ত্রিপুরা প্রসিদ্ধ। পথ চলতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হলে বিশ্রামের জন্য পাহাড়ী ত্রিপুরীদের বাঁশের তৈরী বিশ্রাম মঞ্চ থাকতো। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে তখন যে তালুকী বন্দোবস্ত ছিল, লেখক তারও বিবরণ দিয়েছেন, ঐতিহাসিক স্থান উদয়পুরের বিভিন্ন কীর্তি-কাহিনীর বিস্তৃত বিববণও লেখক এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর ও বিলোনিয়া উপবিভাগের বিস্তৃত অঞ্চল যে হাতীর আবাসস্থল, লেখক তার উল্লেখ করেছেন, এবং শিকার প্রিয় মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর এই ভ্রমন উপলক্ষে হাতী শিকারকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার "হস্তীখেদা" (হাতী ধরবার বিশেষ কৌশল পদ্ধতি) পদ্ধতির বিশদ বিবরণও দিয়েছেন।

গ্রন্থটি মোটামুটি তথ্যসমৃদ্ধ। ঐতিহাসিক স্থান উদয়পুরের বিশদ বিবরণ ও ত্রিপুরার অন্যান্য তথ্যাদি জানার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক। গ্রন্থটি সাধুগদ্যে লিখিত, ভাষাও সহজবোধ্য। লেখকের গদ্যরীতির একটি নমুনা নীচে দেওয়া গেল—

ক) "শ্রী শ্রীনিবাস চন্দ্র সাহা বহুকাল যাবত এ রাজ্যবাসী এবং নানারূপে শ্রী শ্রীযুক্ত এবং রাজ্যের সেবা করিয়া থাকে, উদয়পুর অবস্থানকালীন **শ্রী শ্রীযুক্ত** তাহার কার্য্যে সবিশেষ সন্তোষলাভ করিয়া তাহাকে "রায়চৌধুরী" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।" (পৃষ্ঠা—১৭)

— ঃ —

আমার সোনামুড়া ও উদয়পুর বিভাগ পরিভ্রমণ ডায়েরী

মহারাজা বীরবিক্রম কিশের মাণিক্য বাহাদুর



মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর লিখিত "আমার সোনামুড়া ও উদয়পুর বিভাগ পরিভ্রমন" ডায়েরী গ্রন্থটি ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৪ ইং) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। উপরি-উক্ত পরিভ্রমণে লেখক প্রতিদিনের বিভিন্ন ঘটনা বিস্তারিতভাবে এই ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। মাত্র দশ-দিনের জন্য মহারাজা বীরবিক্রম উপরি-উক্ত স্থান পরিভ্রমণ করেন।

ডায়েরীর পূর্বাপর ঘটনা অনুধাবন করলে বোঝা যায়, ত্রিপুরারাজ্যেব আভ্যন্তরীন অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং স্থান পরিভ্রমণই এই ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সোনামুড়া-উদয়পুর উপবিভাগের অধিবাসীদের বিদ্যালয়, রাস্তা-ঘাট, হাসপাতাল সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার বিবরণ, উদয়পুরে রাজাদের কীর্তি-কাহিনীর বিবরণ এবং ত্রিপুরার পার্বত্য উপজাতিদের (রিযাং, জমাতিয়া, ক্বপিনী, হালাম, নোয়াতিয়া ইত্যাদি) জীবনযাত্রার রীতি-নীতি ও সমস্যার বিবরণে ডায়েবীটি মোটামুটি তথ্যনির্ভব। তাছাড়া ত্রিপুবার প্রজাসাধারণের রাজানুগত্য যে অপবিসীম ছিল তা এই ডায়েরী থেকে জানা যায়। অবশ্য, মহারাজা বীরবিক্রমও এই সম্পর্কে ডায়েরীতে স্পষ্টভাবে বলেছেন —

"আমার ডায়েরী শেষ করিবার পূর্বে আমি এই বলিতে চাই যে, সবস্থানেই প্রজার অগাধ রাজভক্তি দেখি এবং তাহারা ভালরূপে সবস্থানেই অভ্যর্থনা কবে।" (ডায়েরী — পৃষ্ঠা—৩১)

ত্রিপুরার রূপকথা
খুম্‌পুই বাররুক্‌ক
(অজগর সাপের গল্প)

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

এক বিপত্নীক গরীব অচাই-এর (ওঝা) দুই মেয়ে ছিল। মেয়ে দুইটি সারাদিন জুমে' কাজ করতো। সামর্থ্য না থাকায় জুমে কোনো টঙ্ঘর ছিল না। ফলে বর্ষাকালে তাদের ভিজতে হতো আর রেখে দেওয়া দুপুরের খাবারও নষ্ট হয়ে যেতো। অনেকদিন তাদের এই জন্য দুপুরে খাওয়া হতো না। এই অবস্থায় একদিন বড় বোন ছোট বোনকে বললো, যদি কেও সহৃদয়ে তাদের জুমে টঙ্ বেঁধে দেয় তবে সে তাকে বিয়ে করবে। এই বলে দুইবোন বাড়ী চলে গেল।

বনদেবী তাদের কষ্ট দেখে সেইদিন রাত্রেই একটি সুন্দর টঙ্ তৈরী করে দিলেন। পরদিন তারা জুমে এসে দূর থেকে সুন্দর টঙ্‌টি দেখে খুশী হয়ে কাছে এলে দেখে এক বিরাট অজগর সাপ টঙ্‌টিতে শুয়ে আছে। সাপটি তাদের দেখে টঙ্ থেকে নেমে পাশের বনের ভিতর চলে গেল। বড়বোন অগত্যা তার কথামত সাপটিকে মনে মনে স্বামীত্বে বরণ করলো।

১) ত্রিপুরায় পার্বত্য জাতির মধ্যে হালচাষের কোনো প্রথা নেই। টিলা ও পাহাড়ের উপর জঙ্গল কেটে তাতে ত্রিপুরীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন নিভে যাওয়ার পর ছাইগুলিকে তারা সেখানকার মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। তাতে সারের কাজ হয় এবং মাটিও উর্বর হয়। তারপর 'টাক্‌কাল' নামে একপ্রকার দা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে তারা ধান, তরকারী ইত্যাদির ফলন করে। এই প্রথাকে 'জুমচাষ' বলে, 'জুম' অর্থ হলো ক্ষেত।

২)   বাঁশের মাচার উপর যে ঘর তৈরী হয়, তাকে ত্রিপুরীরা বলে 'টঙ্ঘর'। বন্য জন্তুদের হাত থেকে জুমের ফসল রক্ষা করার জন্য এর উপর বসে পার্বত্য জাতিরা জুম পাহাড়া দেয়।

বড়বোন একদিন ছোট বোনকে তার 'কুমুইকে' (ভগ্নিপতি) নিমন্ত্রণ করতে বললো। কিন্তু ছোটবোন তা করতে চায় না, কারণ তার মনে বড় ভয়। অগত্যা বড়বোনের মনের দিকে চেয়ে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুর করে ডাকলো—

"কুমুই য়ো য়ো কুমুই মাই চানানি ফাইদি—"

অর্থাৎ—   দিদির বর ও দিদির বর ক্ষিধে
কি পায় না তোমার কিছু?
ভাত বাড়া এই আশা নিয়ে
দিদি আমার বসে আছে
খাবে তো দৌড়ে এস ডাকের পিছু পিছু।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বন তোলপাড় করে অজগর এসে হাজির হয়ে টঙ্-এর উপরে রাখা ঘাবার খেয়ে গেল। এই ভাবে প্রতিদিন চলতে লাগলো।

কিছুদিন পর ওঝা গ্রামান্তর থেকে বাড়ী এসে ছোট মেয়ের মুখে সব খবর শুনে রেগে গেল। একদিন বড়মেয়েটি যখন অন্য প্রতিবেশীর জুমে কাজ করছিল তখন ওঝা ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে জুমে এসে সাপটিকে মেরে রেঁধে রাত্রে বড় মেয়েকে খেতে দিল। মেয়েটি খেতেবসেও খেতে পারলোনা। তার মন এক অজানিত আশঙ্কায় বারবার কেঁপে উঠতে লাগল।

পরদিন খুব শঙ্কিত মনে সে ছোটবোনকে নিয়ে জুমে এসে সুর করে কেঁদে কেঁদে তার স্বামীকে ডাকতে লাগলো এই বলে—

"দঙয় য়ো য়ো দভয়
দঙয় মাই চানানি ফাইদি।"

অর্থাৎ— প্রিয়তম, তোমার কি ক্ষিদে পায় না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সাপ এলো না দেখে বড়বোন চিন্তিত মনে ছোটবোন সহ এক খালের পাড়ে এলো। ওরা জানে না যে এই খালেই ওঝা সাপের মাথাটি ফেলেছিল। ওরা দেখে খালটিতে অসংখ্য 'খুম্পুই' ফুল ফুটে আছে। ছোটবোন ফুল দেখে খুশী হয়ে একটি ফুল পেড়ে এনে যেই কানে পরলো, অমনি তা শুকিয়ে গেল। বড়বোন সেই শুকনো ফুলটি কানে পরামাত্র

৩) ত্রিপুরী ভাষায় দোলনচাঁপাকে বলে 'খুম্পুই'।

আবার সতেজ হলো। ফলে বড়বোনের মনে দেখা দিল এক বিরাট সংশয়। তার মনে হলো যে তার স্বামী হয়তো এই জলের ভিতর আছে। তাই ধীরে ধীরে জলে নামতে নামতে বললো—

"খুম্পুই বারুরু, তুই বোম তরুরু
আজ নাইসি প্রাদি দওয়—"

অর্থাৎ— ফুল তুমি ফুটতে থাক, জল তুমি বাড়তে থাক, স্বামী দাঁড়াও, আমি আসছি।

এই বলতে বলতে একসময় সে জলের ভিতর ডুবে গিয়ে দেখলো এক বিরাট প্রসাদের দরজার সামনে তার স্বামী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে ঘটনাক্রমে কিছুদিনের মধ্যে এক রাজার সঙ্গে ছোটবোনের বিয়ে হলো। রাজার অন্য রানীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তার সর্বনাশ সাধনের জন্য সুযোগ খুঁজতেলাগলো। ছোটবোনের পর পর সাতছেলে ও এক মেয়ে হল রানীরা তাদের লুকিয়ে খালের জলে ফেলে দিয়ে রাজাকে বললো যে, ছোট রানীর গর্ভে কাঠ-পাথর হয়েছে। রাজাও তাদের কথায় বিশ্বাস করে ছোট রানীকে রাক্ষসী ভেবে মাথা মুড়িয়ে প্রাসাদ থেকে বের করে দিলেন।

এদিকে ছোটরানীর ছেলেমেয়েরা তার বড় বোনের আশ্রয়ে বড় হতে লাগলো। খালে কেও জল আনতে গেলে ওরা ঢিল ছুঁড়ে কলসী ফুঁটো করে দেয়। ক্রমে ক্রমে এই ঘটনার কথা রাজার কানে গেল। রাজা তখন লোক জন সহ খালের পাড়ে এলে দেখেন, সাতটি ফুঁট-ফুটে ছেলেমেয়ে একটি নৌকায় বসে রয়েছে। রাজা খুশীমনে তাদের যেই ধরতে গেলেন, অমনি তারা নৌকাসহ জলের তলায় চলে গেল। এই ভাবে কয়েকবার চেষ্টা করেও তিনি তাদের ধরতে না পেরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা তখন বললো যে, তীর থেকে যে স্ত্রীলোব বুকের দুধ দিয়ে তাদের পেট ভরাতে পারবে, সে হবে তাদের মা। রাজার আদেশে রাজ্যের বহু স্ত্রীলোক এসে চেষ্টা করেও তাদের পেট ভরাতে পারলো না। সবশেষে এলো ছোটরানী। সে তাদের পেট ভরালো। রাজা তখন বুঝতে পারলেন যে এরা তারই ছেলেমেয়ে। রাজা ছোটরানী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুশীমনে প্রাসাদে ফিরে এসে দুষ্টা রানীদের চরম শাস্তি দিলেন।

('রবি' পত্রিকা—প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা,
চৈত্র—১৩৩৪ত্রিং)

"সিপিংতুই - মাইরুংতুই"

শ্রীমতী গোলাপফুল দেবী

ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের এক ত্রিপুরীপাড়া ছিল। সেখানে এক কৃষক তার দুই স্ত্রী সহ বাস করতো। প্রথম স্ত্রীর এক মেয়ে, নাম সিপিংতুই - আর দ্বিতীয় স্ত্রীর এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলের নাম অজ্ঞ রায় আর মেয়ের নাম মাইরুংতুই। ছোটবেলা থেকে মা হারা সিপিংতুই খুব কষ্টে সৎমার আশ্রয়ে বড় হয়।

সিপিংতুই-এর রং কালো। কিন্তু রং কালো হলেও দেহের গড়ন ও মুখ ছিল খুব সুন্দর এবং স্বভাবও ছিল মধুর। সংসারের সব কাজই সে গুছিয়ে করতো। তাছাড়া তাঁতের কাজ, জুমের কাজ, ঘরকন্নার কাজ সবই সে সুন্দরভাবে শিখেছিল।

মাইরংতুই এর রং ফর্সা হলেও দেখতে সে সুন্দরী ছিল না। তাছাড়া মায়ের আদর পেয়ে সে কোন কাজ করতো না। বরং সিপিংতুইকে সে হিংসা করতো। জল আনতে যাবার সময় মাইরুংতুই ভাল শাড়ী পরে যেতো, আর সিপিংতুইকে পরতে হতো ছেঁড়া শাড়ী। তবু সিপিংতুই কিছু বলতো না।

একদিন দুইবোন জুমে কাজ করতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন বিশ্রাম করছিল, তখন রাজার বিনন্দিয়ারা সেখানে দিয়ে যাবার সময় তাদের দেখে জল খেতে চাইলো। সিপিংতুই তাদের 'তিলক' থেকে যত্নসহকারে জল খেতে দিল। তারা জল খেয়ে খুশীমনে চলে গেল।

এই বিনান্দিয়ারা রাজধানীতে গীয়ে রাজার কাছে সিপিংতুই-এর রূপগুণের খুব প্রশংসা করলো। রাজা সব শুনে ছদ্মবেশে সিপিংতুইকে দেখতে এলেন। সিপিংতুইকে দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে ঘোড়ায় তুলে একেবারে রাজধানীতে এনে ধুমধুাম করে তাকে বিয়ে করলেন।

এদিকে মাইরুংতুই-এর কাছে সব শুনে সৎমা হিংসায় জ্বলতে লাগলেন। কিছুদিন পর মা ও মেয়ে পরামর্শ করে সিপিংতুই-এর বাবা অসুস্থ বলে রাজবাড়ীতে খবর পাঠালো। এই খবরে সিপিংতুই অস্থির হয়ে বাড়ীতে আসার জন্য রাজার কাছে অনুমতি চাইলো। রাজা তখন

**১)   ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশে যারা পুলিশের কাজ করতো,
তাদের বলা হতো—'বিনন্দিয়া।'**

২)   শুকনো লাউ— যা ত্রিপুরীরা কলসের বদলে ব্যবহার করে।

অনিচ্ছা সত্বে অনুমতি দিলেন এবং বাড়ী আসার সময় সিপিংতুই-এর খোঁপায় একটি সোনার কাঁটা গুঁজে দিলেন।

সিপিংতুই বাড়ী-এসে দেখে তার বাবা সত্যিই মরে গেছে। তখন সে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। মাইরুংতুই সেই ফাঁকে সিপিংতুই-এর খোঁপাটি নাড়াচাড়া করতে করতে ইচ্ছা করে সোনার কাঁটাটি টঙের নীচে ফেলে দিল। সিপিংতুই যেই নীচু

হয়ে কাঁটাপি তুলতে গেল, অমনি তার সৎমা পেছন থেকে তার গায়ে গরম জল ঢেলে দিল। সিপিংতুই সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে টঙের নীচে পড়ে গেল। মা ও মেয়ে তখন তাকে মৃত ভেবে ধরাধরি করে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এলো।

তারপর মাইরুংতুই সিপিংতুই-এর শাড়ী গয়না পরে রানী সেজে রাজবাড়ীতে এলো। রানীকে দেখে রাজার মনে সন্দেহ হওয়ায় রাজা অন্তঃপুরের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলেন। রাজার আর কিছুই ভাল লাগে না বলে এক দিন শিকারে চলে গেলেন। সেই বনে রাজার একটি পোষা হরিণ ছিল, যে মানুষের মত কথা বলতে পরতো। সিপিংতুই-এর জ্ঞান হবার পর মৃত প্রায় অবস্থায় এই হরিণটির আশ্রয়ে এসেছিল এবং হরিণ তাকে লতাপাতার সাহায্যে সুস্থ করে তোলে। হরিণ রাজাকে পেয়ে সব কথা বলে সিপিংতুইকে রাজার কাছে নিয়ে এলো। রাজা সিপিংতুইকে দেখে আনন্দিত হলেন। হরিণ রাজাকে বললো যে, মাইরুংতুই এর রক্তে যদি সিপিংতুইকে স্নান করাতে পারেন, তবেই তিনি সিপিংতুইকে নিয়ে যেতে পারবেন। রাজা তখন রাজধানীতে এসে স্নানে যাবার নাম করে মাইরুংতুইকে নদীর ঘাটে এনে তার মাথা কেটে ফেললেন। তারপর মাথাটিকে একটি হাঁড়িতে ভরে দেহটি এনে রাজবাড়ীর পাচককে রাঁধতে দিলেন আর রক্ত নিয়ে সিপিংতুইকে স্নান করিয়ে বাজবাড়ীতে নিয়ে এলেন।

রাজা সিপিংতুই-এর সৎমাকে তারপর নাতির মুখদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করে লোক পাঠালেন। খবর পেয়ে খুশি হয়ে বুড়ী তার ছেলেকে নিয়ে রাজবাড়ী এলো। মা ও ছেলেকে তখন মাইরুংতুই-এর রান্না করা মাংস খেতে দেওয়া হলো। তার পর বিদায়কালে মুখঢাকা একটি হাঁড়ি পথের খাবার বলে দেওয়া হলো। বাড়ী এলে পর প্রতিবেশীরা এসে রাজার দেওয়া মিষ্টি খেতে চাইলে বুড়ী হাঁড়ির ঢাকনা খুলতে গিয়ে মেয়ের কাটা মাথা দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ে মারা গেল।

('ত্রিপুরার রূপকথা'— শিক্ষা অধিকার-ত্রিপুরা, ১৯৫৯)

"খেরেংবার বুবার"—(রান্না ফুল)।
সংগ্রাহিকা—শ্রীমতী প্রিয়ংবদা দেবী।

'বিশু' ও 'সেনা'র মাঝামাঝি সময়। তখন বৈশাখ মাস, দিনকয়েক পরেই গড়িয়া পূজা। ঘরে ঘরে তখন আগামী উৎসবের সর্বাবিধ প্রস্তুতি চলছে। সেই সময় এক ত্রিপুরী যুবক তার শ্বশুরবাড়ীতে থাকার মেয়াদ শেষ করে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে। এবার উৎসবে বাড়ী থাকতে পারবে, তাছাড়া আত্মীয়-সজন, বন্ধু-বান্ধব সবার সঙ্গে উৎসবে মেতে উঠতে পারবে ভেবে ছেলেটি খুব খুশীমনে স্ত্রীকে নিয়ে দ্রুত বনপথে চলছে। এমন সময় বাতাসে ভেবে এলো এক অজানা ফুলের গন্ধ। যুবকের স্ত্রী এই গন্ধে অভিভূত হয়ে যুবকের কাছে ফুলের নাম জানতে চাইলো। যুবক তখন এই ফুলের নাম বললো—'খেরেংবার'(রাস্না)। এই ফুল শুধু স্বর্গের দেবতারাই ব্যবহার করে। তাছাড়া পরীরা এই ফুল স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে বয়ে এনেছে। পৃথিবীর মাটিতে এই ফুলের গাছ বাঁচেনা বলেই অন্য গাছের উপর শিকড় ছড়িয়ে বেঁচে থাকে। যদি কোনো মানুষ এই ফুল ব্যবহার করে তবে 'দিয়ারীর'র(ধ্যান কারী) কথা অনুযায়ী সে 'হুলক'এ (উল্লুক) রূপান্তরিত হবে।

যুবকের কথা বিশ্বাস না করে তার স্ত্রী 'খেরেংবার' ফুলের জন্য বায়না ধরলো। যুবক অগত্যা তাকে কোনোভাবেই শান্ত করতে না পেরে গাছে উঠতে গিয়ে স্ত্রীকে এই ফুল দেবতাকে উৎসর্গ না করে পরতে নিষেধ করলো। যুবক গাছে উঠে অনেক ফুল পাড়লো। মেয়েটি খুশীতে থাকতে না পেরে এক গোছা ফুল খোঁপায় গোঁজামাত্র দেখা গেল ওর স্বামী গাছের ডালে আটকে গিয়ে ধীরে ধীরে 'হুলুক'-এ পরিণত হয়েছে। যুবকের স্ত্রী স্বামীর এই অবস্থা দেখে বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গিয়ে 'মুফুক'-এ (গোধিকা) পরিণত হলো।

আজিও চৈত্রের শেষে কি বৈশাখে যখন 'খেরেংবার' ফুল ফোটে, তখন 'হুলক' ডাকতে থাকে আর 'মুফুক'ও অধীর হয়ে মাটি চাপড়াতে থাকে। 'মুফুক' হওয়ায় সে আর 'খা বুনা' (বুক চাপড়ানো) করতে না পেরে 'হা বুনা' (মাটি চাপড়ানো) করতে থাকে আব দেবতারাও এই দুঃখজনক ঘটনার কথা জেনে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটতে পারে, সেইজন্য খেরেংবার ফুলের গন্ধ হরন-করে নিয়েছে। তাই আজ এই ফুলের কোনো গন্ধ নেই।

(ত্রিপুর সংহতি' পত্রিকা প্রথম বর্ষ— ৪৫শ সংখ্যা। ৩১শে মে, ১৯৬২, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ৭২ ত্রিপুরাব্দ)

'নাঐ অঙ্গয় থাংমানি কথমা'

(নাঐ পাখী হয়ে যাওয়ার গল্প)

শ্রীমতী ক্ষীরোদপ্রভা দেবী

ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশে এক গৃহস্থের দুই মেয়ে ছিল। বড় মেয়ের নাম খুমতি আর ছোট মেয়ের নাম কর্মতি। খুমতির রং কালো ও স্বভাব ছিল মন্দ। তুলনায় কর্মতি দেখতে সুশ্রী আর স্বভাবও ছিল ভাল। এই জন্য খুমতি মনে মনে কর্মতিকে খুব হিংসা করতো। দুইবোন একত্রে জুমে গেলেও কর্মতিই বেশী কাজ করতো আর খুমতি কেবল ফাঁকি দিতো।

একদিন ওরা ফসল আনতে জুমে গেল। ফসল নিয়ে আসবার পথে সুযোগ পেয়ে কর্মতিকে খুমতি নদীর জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। তারপর কর্মতির ফসল গুলো সে 'লাঙ্গা'য় (ঝুড়ি) ভরে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলো।

এদিকে কর্মতি জলে পড়ামাত্র একটি বোয়াল মাছ তাকে গিলতে এলো, কিন্তু কর্মতির দেহ বোয়াল মাছের পেটে গেলেও মুখটি বোয়ালের মুখের সামনে আটকে রইলো। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে খুমতির ঠাকুরমা ঘাটে স্নান করতে এসে কর্মতিকে এই অবস্থায় দেখে দৌড়ে বাড়ী গিয়ে স্বামীকে ডেকে নিয়ে এসে কর্মতিকে মুক্ত করলো। কর্মতির তখন মৃতপ্রায় অবস্থা। তবু অনেক পরিশ্রমে তাকে সুস্থ করে সব ঘটনা জেনে বাড়ী এসে কর্মতির বাবার কাছে খুমতির বিরুদ্ধে নালিশ জানালো। কর্মতির বাবা তখন খুব রেগে একটি বড় বাঁশের খাঁচা তৈরী করে তারমধ্যে খুমতিকে বন্দী করে একটি বড় গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। খুমতি অনেক কান্নাকাটি করেও রেহাই পেলো না। কর্মতি খুমতিকে খুব ভালবাসতো বলে বাড়ীর সকলে যখন জুমের কাজে চলে যেতো, তখন খুমতিকে খেতে দিতো।

একদিন খাঁচায় আবদ্ধ অবস্থায় খুমতি উড়ান্ত 'নাঐ' পাখীদের দেখে আকুল সুরে তাদের ডেকে বললো "নাঐ, অ নাঐ, আ— ন নরগনি বুইখুমু রুদি দং।" (হে প্রিয় নাঐ পাখিরা আমাকে তোমাদের পালক দাও)

(তিল অপেক্ষা বড় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার আকাশচারী পাখী।) নাঐ পাখীরা ওর আকুল আহ্বানে নীচে নেমে এসে প্রত্যেকে একটি করে পালক দিয়ে গেল। এই ভাবে সে তাদের কাছ থেকে ঠোঁট, নখ ইত্যাদি চেয়ে নিল। তারপর ঠাকুমাকে অনেক মিনতি করে সূঁচ-সূতা চেয়ে নিয়ে পাখীদের পালক, ঠোঁট, নখ সব একত্র করে সাজিয়ে একটি সুন্দর নাঐ পাখীর পোষাক তৈরী করলো। একদিন দুপুরবেলা বাড়ীর সবাই জুমে চলে গেলে খুমতি পোষাকটি পরলো এবং তা পরামাত্র খুমতি এক প্রবল শক্তি দেহে অনুভব করলো। তারপর খুমতি সে ঠোঁট ও নখ দিয়ে খাঁচা ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে পাখার সাহায্যে বাড়ীর চারপাশে উড়তে উড়তে নাঐ পাখীদের ডেকে বললো—"নাঐ অ নাঐ, আন নরপনি লগেঅ তিলাংদি দং"(হে প্রিয় নাঐ পাখীরা, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চল)।

এদিকে পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে খবর পেয়ে বাড়ীর সবাই ফিরে এসে খুমতিকে এই অবস্থায় দেখে তাকে নেমে আসার জন্য মিনতি করতে লাগলো। কিন্তু খুমতি ফিরে না এসে দূর আকাশে মিলিয়ে যাওয়ার আগে কর্মতিকে বলে গেল যে, তার সহৃদয়তার জন্য তার নাম ও গায়ের রং অনুযায়ী এই পার্বত্য অঞ্চলের নাম হবে।

পরবর্তীকালে তাই এই পার্বত্য অঞ্চলের নাম হলো—'তুই কর্ম'। ত্রিপুরী ভাষায় জলকে 'তুই' আর হলুদকে 'কর্ম' বলা হয়। 'তুইকর্ম' হলো হলদে বর্ণ জল বা হলদে নদী। আজও ত্রিপুরার সেই পার্বত্য অঞ্চলের নাম 'তুইকর্ম' বলে খ্যাত আছে।

('ত্রিপুরার রূপকথা' -- পৃষ্ঠা— ১—১৫)

— ঃ —



“চেথুয়াং বাই আইয়াং মাছিঅ থাংমানি কথমা”

(ছাত্যানী বৃক্ষ দিয়ে স্বর্গে গমনের গল্প)

শ্রীমতী ক্ষীরোদপ্রভা দেবী

অনেকদিনের কথা, ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে খিতুংরায় নামে এক কৃষকের এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। ছেলের নাম বিছারায়, আর মেয়ের নাম কাচাংতি। কৃষকের ছেলেটি ছিল একরোখা ও জেদী। তাছাড়া বাপের আদরে সে হয়ে উঠেছিল দুর্দমনীয়। কাচাংতি দেখতে সুন্দরী, আর স্বভাব ও ছিল শান্ত। তাছাড়া নামের সঙ্গে স্বভাবেরও বেশ মিল ছিল। ত্রিপুরী ভাষায় ‘কাচাং’ শব্দের অর্থ ‘শান্ত’। কাচাংতি মানে শান্তশীলা। সংসারের কাজ, জুমের কাজ সে নিবিষ্টমনে করতো।

ত্রিপুরার পার্বত্য জাতিদের মধ্যে একটি রীতি হলো—তারা কৃষিকাজ থেকে সামাজিক যে কোন কাজে সবসময় একে অন্যকে সাহায্য করে, আর ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে একসঙ্গে জুমে কাজ করে। সমবয়সী সঙ্গীদের নিয়ে খিতুংরায়ের ছেলেমেয়েরাও দলবেঁধে সারাদিন জুমে কাজ করতো। পাহাড়ীদের আর একটি রীতি হলো— সারাদিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যার পর ‘কামি’তে (পাড়া) ফিরে এসে বয়স্ক পুরুষেরা একত্রিত হয়ে গল্প-গুজব করে ‘লাঙ্গি’ ১ পান করে।

একদিন খিতুংরায় ‘লাঙ্গি’ পান করে গভীর রাত্রে বাড়ী এসে দেখে কাচাংতির জ্বর হয়েছে। পরদিন ‘অছাই’ ২ কে ডেকে এনে ঝাড়ফুঁক করায় তার জ্বর ছাড়লো। এদিকে কাচাংতি জুমে না যাওয়ায় তার সঙ্গীরা চিন্তান্বিত হয়ে তার খোঁজ করতে এসে জ্বর ছেড়েছে দেখে খুব খুশী হলো।

একদিন ছেলেমেয়েরা দল বেধেঁ বনে কাঠ সংগ্রহ করতে গেল। ফিরে আসার পথে কাচাংতি যখন নদী পার হচ্ছিল, তখন বিছারায় তার সুন্দর দেহ কান্তি দেখে বিমুগ্ধ হলো। বিছারায়ের মন তারপর দুর্দমনীয় হয়ে উঠলো। কাচাংতি যে তার আপন সহোদরা, উত্তেজনার মুখে তাও সে ভুলে গেল। সে বাড়ী এসে চুপচাপ শুয়ে রইলো। তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে বাড়ীর সকলে আশ্চর্য হয়ে



তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতেও সে কোন জবাব দিল না। তার ঠাকুরমা অনেক বুঝিয়ে তার মনের খবর জানতে পারলো। কাচাংতিকে বিয়ে করার কথা শুনে বৃদ্ধা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। বিছারায়ের মা-বাবাও তা শুনে রেগে গেলেন। অনেক বুঝিয়েও বিছারায়ের মতের কোনো পরিবর্তন করতে পারলো না। অগত্যা তারা অন্ধ স্নেহবশে মেয়ের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া মনস্থ করলো।

১) এক প্রকার চোলাই মদ, যা ত্রিপুরীরা নিজে তৈরী করে।

২) ওঝা। এরা যে কোন বিপদে বা অসুখে মন্ত্রতন্ত্র আউড়ায় ও ঝাড়ফুঁক করে।

কাচাংতি এই খবর শুনে লজ্জায় ঘৃনায় কি করবে ঠিক করতে পারলো না। মা-বাবার এই মনোবৃত্তি দেখে সে খুবই মর্মাহত হলো। সারারাত্রি চিন্তা করেও কোনো উপায় স্থির করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মরবে বলে ঠিক করলো। পরদিন সকালে সে বিমর্ষ মনে সঙ্গীদের সঙ্গে কাঠ আনতে গিয়ে এক ফাঁকে দল থেকে সরে এসে এক টিলার উপর একটি ছাত্যানী বৃক্ষের নীচে এসে দাঁড়ালো। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ধারণা, এই বৃক্ষের কাছে একান্তমনে প্রার্থনা করে যা চাওয়া যায়, তা নাকি পাওয়া যায়। কাচাংতি এই বৃক্ষের কাছে প্রার্থনা করে বললো—"হে দেববৃক্ষ, আমাকে তুমি স্বর্গে যেতে সাহায্য কর। আমি কুমারী, পবিত্রা, সত্য সাক্ষী করে আমি তোমায় বাঁধলুম।" এই বলে কাচাংতি একনিষ্ঠ হয়ে ভক্তিভরে প্রনাম করে বৃক্ষের উপর উঠে করুণ সুরে বললো—

"লক্ চেথুয়াং লক্, আতা বাই ছে আ-ন
কাইরুনানী হি-ন
আ-ব দে ছানানি কক্?
লক্ চেথুয়াং লক্।"

অর্থাৎ— হে ছাত্যানী বৃক্ষ, দীর্ঘ হও, উন্নত হও. দাদার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায়, এটা কি বলবার কথা? হে ছাত্যানী বৃক্ষ, দীর্ঘ হও উন্নত হও।

এই বলে সে গাছে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে গাছও বড় হতে হতে অনেক উপরে উঠে গেল।

এদিকে কাচাংতির সঙ্গীরা তার খোঁজ করতে করতে সেখানে এসে এই আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে দৌড়ে গিয়ে কাচাংতির মা-বাবাকে খবর দিল। তারা এসে অনেক মিনতি করেও কাচাংতির মন টলতে পারলো না। তাদের ফিরে যেতে বলে কাচাংতি দেবকন্যাদের ডাকতে লাগলো, তাকে নিয়ে যাবার জন্য। দেবকন্যারা তখন তার ডাকে থাকতে না পেরে কাচাংতিকে এসে নিয়ে গেল। যাওয়ার আগে ছাত্যানী বৃক্ষকে কাচাংতি বলে গেল যে, তার আগা বলতে আর কিছু থাকবে না, যাতে অন্য কেউ আর পরবর্তীকালে এই বৃক্ষের সাহায্যে উপরে উঠে আসতে না পারে।

জনশ্রুতি আছে যে, সেই সময় থেকে ছাত্যানী বৃক্ষ নাকি আগাহীন হয়ে জন্মায়। আর এই বৃক্ষ দেখে ত্রিপুরার পাহাড়ীরা আজও পবিত্রা কাচাংতির কথা স্মরণ করে। — ('ত্রিপুরার রূপকথা'—পৃষ্ঠা—১৭—৫৪)

— ঃ —

"তালানী বাছাত্মা"

(চন্দ্র কুমার)

শ্রীমতী ক্ষীরোদপ্রভা দেবী

ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে 'কুফুর' (শুভ্রা) নামে পিতৃমাতৃহীন একটি মেয়ে নিঃসন্তান মামা-মামীর কাছে মানুষ হয়। পূর্ণ যৌবনা কুফুর সঙ্গে দেবতা চন্দ্রদেবের মিলনের ফলে কুফুর সন্তান সম্ভবা হলো, কিন্তু প্রতিবেশীরা দেবতা ও মানুষের এই মিলনকে বিশ্বাস না করে কুফুরকে নির্বাসন দিতে বললো। তাদের সিদ্ধান্ত



অনুযায়ী কুফুর বনে নির্বাসিত হলো। চন্দদেব তখন তাকে থাকাবার জন্য বনে একটি সুন্দর ঘর তৈরী করে দিলেন। যথাসময়ে কুফুরের একটি ব্যাঙ সন্তান হলো। তার নাম রাখা হলো চন্দ্রকুমার। বড় হয়ে চন্দ্রকুমার মার কাছে জানতে পারলো যে, তর পিতা চন্দ্রদেব।

একদিন চন্দ্রকুমার তার পিতাকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে ডাকতে লাগলো। ফলে চন্দ্রদেব তার ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে এলেন। চন্দ্রকুমার তখন তার নিজের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করতে চন্দ্রদেব তাকে বললেন যে, 'নকছুমতাই' -এর (আদিবাসীদের গৃহদেবতা) শাপে সে ব্যাঙরূপ লাভ করে কষ্ট পাচ্ছে। সময়মত এই কষ্ট দূর হবে। চন্দ্রদেব যাওয়ার সময় তাকে আশীর্বাদ করে বললেন যে, নিজ ইচ্ছানুযায়ী পিতার কাছ থেকে একটি ঘোড়া ও একটি রাজপোষাক চেয়ে নিল।

কিছুদিন পর চন্দ্রকুমার মায়ের অনুমতি নিয়ে অন্য এক রাজ্যে চলে গেল। সেখানে সেই রাজ্যের রাজকুমারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হলো। রাজকুমারীর কাছে যাবার সময় চন্দ্রকুমার ব্যাঙের খোলসটি কোন এক গুপ্ত জায়গায় রেখে যেতো আর ফিরার পথে খোলসটি আবার পরে বাড়ী ফিরে আসতো। একদিন চন্দ্রকুমার রাজকুমারীকে এই কথা বলায় রাজকুমারী খুশী হয়ে চন্দ্রকুমারকে বিয়ে করলো।

বিয়ের পর একদিন রাত্রে রাজকন্যা সুযোগ পেয়ে যেই ব্যাঙের খোলসটি পুড়িয়ে ফেলতে উদ্যত হলো, তখন 'নক্‌ছুমতাই' খোলসের ভিতর থেকে বললেন যে, তারা যেন তার পূজা করে। রাজকন্যা তারপর খোলসটি পুড়িয়ে ফেললেন। চন্দ্রকুমারও তার নিজরূপ ফিরে পেলো।

তারপর রাজকন্যার পিতা জামাতা চন্দ্রকুমারকে রাজ্য দিয়ে বনে চলে গেলেন। পরবর্তী কালে চন্দ্রকুমারের তিনপুত্র হলো। এই তিনপুত্র বহু দেশ জয় করলো। তাদের রাজ্যকে সবাই বলে ত্রিপুত্রা রাজার রাজ্য। কথিত আছে, এই ত্রিপুত্রা থেকে 'ত্রিপুরা' নামের সৃষ্টি হয়েছে।

('ত্রিপুরার রূপকথা'— ২২শে শ্রাবন, ১৩৭২ত্রিং)

— ঃ —



বিষলতা উৎপত্তির উপাখ্যান

ত্রিপুরার খুচুঙ্গ কুকিদের রাজা শুভরায় তার সুন্দরী মেয়েকে একজন শ্রেষ্ঠ কুকির সঙ্গে বিয়ে দিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিয়ের রাত্রে কুকিটির মৃত্যু হয়। এই কুকির কনিষ্ঠ ছয় ভাই-এর মধ্যে পাঁচ ভাই পর পর মেয়েটিকে বিয়ে করে বিয়েব রাত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সর্বকনিষ্ঠ ভাই তখন ভাইদের শোকে উন্মত্ত হয়ে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য মেয়েটিকে বিয়ে করলো এবং বিয়ের রাত্রে শয্যায় না থেকে ঘরের অন্যত্র আগুন জ্বেলে বসে রইলো। মেয়েটি নিদ্রিত হবার পর দেখা গেল। তার নাক দিয়ে একটি সাপ বেরিয়ে এলো ও শয্যায় কোন লোককে 'দেখতে না পেয়ে পুনরায় নাকে ঢুকে গেল। সেই কুকি তখন বুঝতে পারলো যে মেয়েটি 'নাগিনী কন্যা' এবং সে তার ভাইদের হত্যা করেছে। কুকিটি তখন ক্রোধে জ্ঞান শূন্য হয়ে মেয়েটিকে হত্যা করতে কৃতসংকল্প হলো। তার পর বেড়াবার নাম করে মেয়েটিকে গভীর অরণ্যে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে গর্তে পুঁতে ফেললো। কিছুক্ষণ পর বাড়ী এসে সবাইকে বললো যে, তার স্ত্রী বনে হারিয়ে গেছে।

এই কথা শুনে রাজা শুভরায় প্রজাদের নিয়ে তখনই মেয়েকে খুঁজতে বনে গেলেন, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলেন না। কন্যার শোকে রাজা কাঁদতে লাগলেন।

একদিন রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখলেন, তার মেয়ে শিয়রের সামনে বসে বলছে যে, সে একজন শাপভ্রষ্ট সাপ, ছয়জন কুকিকে বধ করবার জন্য কন্যারূপে তার ঘরে এসেছিল। কনিষ্ঠ কুকি তাকে বধ করে নদীতীরে বটগাছের নীচে পুঁতে রেখেছে এখন তার নাভি থেকে একটি বিষলতার উদ্ভব হয়েছে। এই লতায় আছে সাপেব বিষ। এই লতার রসে মাখা তীর যার শরীরে প্রবেশ করবে, বিষক্রিয়ায় তার তখনই মৃত্যু হবে। তবে চাথেঙ্গ নদীর (এই নদী বরবক্র বা বরাক নদীর দক্ষিণে অবস্থিত) দক্ষিনের দেশগুলিতে এই বিষ কার্যকরী হবে না।

তারপর রাজা জেগে ওঠে কুকি প্রজাদের সহ বনে গিয়ে মাটি খুঁড়ে মেয়ের সন্ধান পাবার পর দেখেন যে সত্যই তার নাভি থেকে একটি বিষলতার উদ্ভব হয়েছে। তারপর এই বনে প্রচুর বিষলতার উৎপত্তি হলো।

('রাজমালা'—২য় লহর—কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত)



ত্রিপুরার রূপকথা

শিশুমনে রূপকথা, আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। তাছাড়া আবাল বৃদ্ধবনিতার কাছে রূপকথার এক বিরাট আকর্ষনণ আছে। শোনার প্রবনতা মানুষের মনে চিরন্তন। এই চিরন্তন আবেদনের ভিত্তিতে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে রূপকথার সৃষ্টি হয়েছে। রূপকথার রাজত্বে খুব একটা যুক্তি তথ্যের বালাই নেই। এখানে সৌন্দর্য সৃষ্টিই হলো মূলকথা। তবে বর্তমানকালের রূপকথায় এসেছে বাস্তবতাবোধ। এই কারণে রূপকথা বর্তমানকালে এক নূতন স্তরে উন্নীত হয়েছে। রূপকথা প্রান-প্রাচুর্যে ভরপুর ও রসের মাধুর্যে অভিষিক্ত। রূপকথার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত হলো—

> রূপকথার সর্বত্র অবাধ গতি এবং শিশুর সরলমনে এর সবকিছুই বিশ্বাসযোগ্য। তাই বালক সেইটি বোঝে, সে কোনো প্রশ্ন করে না। এই জন্য রূপকথার সবটুকু শিশুর মত উলঙ্গ, সত্যের মত সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মত স্বচ্ছ ....''
>
> (''রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য''—পৃষ্ঠা—২১৪)

রহস্যময়তা আছে বলেই রূপকথায় শিশুমন সহজে আকৃষ্ট হয়। সব মানুষের মধ্যেই এই শিশুমনটি ঘুমিয়ে আছে এবং রূপকথার স্পর্শে সেটি জাগ্রত হয়ে রূপকথার রসাস্বাদন করে।

রূপকথার সৃষ্টিও কিছুটা প্রয়োজনের তাগিদে। পৃথিবীর সবদেশেই মা-ঠাকুরমারা তাদের সন্তানদের জন্য এই রূপকথার সৃষ্টি করেছেন। আবার একথাও ঠিক যে, রূপকথার অনেককিছু আপাত অবাস্তব মনে হলেও মূলতঃ সেগুলি অবাস্তত নয়, রূপকথায় এমন অনেক ছোট-বড় ঘটনা থাকে, যা আমাদের জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।



রূপকথা জাতীয় জীবনের ছবিও প্রতিফলিত হয়। রূপকথায় ব্যক্তিবিশেষের কোনো স্থান নেই, এতে সমগ্র জাতির প্রাণের কথা ও অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হয়।

ত্রিপুরার উপজাতিদের রূপকথাগুলি যারা বাংলাভাষার মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন, তাদের মধ্যে শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, গোলাপফুল দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী, ক্ষীরোদপ্রভা দেবী, বিপিনচন্দ্র দেববর্মার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য পরবর্তীকালে ত্রিপুরার 'শিক্ষা অধিকার'-এর প্রচেষ্টায় কিছুসংখক রূপকথা সম্বলিত বই বের হয়।

ত্রিপুরায় উপজাতিদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর রূপকথা। ত্রিপুরার রূপকথাগুলিতে ত্রিপুরীদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। ত্রিপুরী 'ককবরক' ভাষায় রূপকথার সঠিক প্রতিশব্দ নেই, তবে "কেরাংকয়মা" শব্দটি মূলতঃ রূপকথা শব্দের অর্থ বহন করে। ত্রিপুরার উপজাতীয় রূপকথাগুলি বহুকাল ধরে বংশ-পরম্পরায় ত্রিপুরীদের মুখে মুখে চলে আসছে। এইসব রূপকথায় ত্রিপুরীদের জাতীয় বীরত্বের কাহিনী, প্রেমিক-প্রেমিকার মানসিক উচ্ছ্বাস, তাদের ধর্মাচরণ, সমাজচিত্র, বিভিন্ন ধরনের সংস্কার ও পাহাড়ী প্রকৃতি জুড়ে রয়েছে। এই সব রূপকথা পাহাড়ী কথকরা তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় বলে থাকে। বহুকাল ধরে মুখে মুখে প্রচলিত থাকায় গল্পের কোথাও কোথাও হয়তো কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়, তবে তাতে গল্পের মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, হলো যে, এই সব রূপকথা গুলির উপর আদিবাসীদের বিশ্বাসও ধর্মবোধের প্রভাব প্রবল।

আলোচনার সুবিধার জন্য মাত্র সাতটি রূপকথা পূর্বে সংক্ষেপিত করে দেওয়া হয়েছে। এই রূপকথাগুলি পর্যালোচনা করলে ত্রিপুরার রূপকথার বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা কতটুকু, তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

প্রথম গল্পটি হলো "খুমপুই বারুরুক" বা অজগর সাপের গল্প। এটি ত্রিপুরার একটি জনপ্রিয় রূপকথা। ত্রিপুরী ভাষায় দোলনচাঁপা ফুলকে বলে "খুমপুই"।



এই রূপকথাটিতে ত্রিপুরীদের সমাজজীবনের একটি দিক ফুটে উঠেছে। ওরা যে পরিশ্রমী ও গরীব কৃষিজীবী এবং জুম চাষ যে তাদের প্রধান অবালম্বন তা জানা যায়। তাছাড়া এরা যে স্ত্রী- পুরুষ একত্রে একতাবদ্ধ হয়ে যৌথভাবে সব জমিতে চাষ করে তাও বোঝা যায়। স্ত্রী-পুরুষেরা জীবনধারণের জন্য সমভাবে পরিশ্রম করে।

দ্বিতীয় রূপকথা ''সিপিংতুই-মাইরুংতুই''-এ সমাজে চিরাচরিত সপত্নী কন্যার প্রতি বিমাতার ঈর্ষাকাতর মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। গল্পের শেষে দেখা যায় মাইরুংতুই-এর মাংস খেতে দেওয়া হয়েছে তার মা ও ভাইকে। ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে যে একদা নরমাংস খাওয়ার প্রথা ছিল তা জানা যায়। তাছাড়া ত্রিপুরার উপজাতিদের ঘরে ঘরে তাঁতশিল্প প্রচলনের আভাসও এই রূপকথায় রয়েছে। ত্রিপুরার উপজাতি স্ত্রীলোকেরা অবসরসময়ে ঘরে ঘরে ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্পনিদর্শন ''রিয়া'' (বক্ষাবরণ), ''সুজনী'' (বসবার আসন), ''রিগনাই'' (পরিধেয় বস্ত্র) ও বিভিন্ন ধরনের সূচীশিল্পের চর্চা করে।

ত্রিপুরী সমাজের নিয়ম হলো যে, বিয়ের পূরেই ছেলেকে মেয়ের বাড়ীতে কিছুদিন বেগার খাটতে হয় এবং খাটার মেয়াদ শেষ হলে পরে ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসতে পারে। ''খেরেংবার বুবার'' বা রাম্না ফুল রূপকথায় ত্রিপুরীদের বিবাহ প্রথার এই বিশেষ দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। ত্রিপুরার পাহাড়ী ফুল ''খেরেংবার বুবার''-এর বৈশিষ্ট্য ও এই রূপকথার মাধ্যমে জানা যায়। চৈত্রের শেষে এই ফুল ফোটে। তাছাড়া ত্রিপুরীদের বিশিষ্ট 'গড়িয়া' পূজার বিবরণও এতে পাওয়া যায়।

'নাঐ অঙ্গয় থাংমানি কথমা'' বা নাঐ পাখী হয়ে যাওয়ার গল্পে খারাপ কাজের জন্য যন্ত্রনাদায়ক ফলভোগ করার নীতিবাক্যটিই প্রকাশিত হয়েছে।

''চেথুয়াং বাই আইয়াং মাছিঅ থাংমানি কথমা'' বা ছাত্যানী বৃক্ষ দিয়ে স্বর্গে গমণের রূপকথাটিতে পার্বত্য উপজাতিদের সামাজিক রীতি-নীতিই প্রতিফলিত হয়েছে। এরা কৃষিকাজ থেকে সামাজিক যেকোনো কাজে একে অন্যকে

সাহায্য করে। তাছাড়া এরা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে সন্ধ্যার পর বাড়ী এসে সকলে একত্রে বসে নিজেদের তৈরী "লাঙ্গি" (চোলাই মদ) পান করে। এটি আদিবাসীদের জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ্ প্রথা এদের মধ্যে ছিল, তার আভাসও এই রূপকথায় মেলে।

"তালনি বছাত্মা" বা চন্দ্রকুমার রূপকথাটিতে আদিবাসীদের জাগ্রত দেবতা "নকছুমতাই"-এর পূজা প্রচলনের বিবরণ ও ত্রিপুরা নামের উৎপত্তির ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। তাছাড়া এই রূপকথাটিতে মানবীয় উপাদান রয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নারীর প্রতি সমাজের নির্যাতন, অপত্যস্নেহ উপাখ্যানটিকে সরস করে তুলেছে। গৃহদেবতা নকছুমতাই -এর পূজা প্রচারের চেষ্টা মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের বিশেষভাবে স্মরণ করায়।

ত্রিপুরার আদিবাসী কুকি সম্প্রদায় যুদ্ধে বা কোনো বিপদে যে বিষমাখা তীর ব্যবহার করতো তার বিবরণ জানা যায়।

রূপকথার বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা বিচার করলে দেখা যায়, বাংলা রূপকথার সঙ্গে ত্রিপুরার রূপকথার বিভিন্ন দিক থেকে মিল রয়েছে। তাছাড়া ত্রিপুরার রূপকথার উপর বাংলা রূপকথার প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। বাংলা রূপকথায় যেমন বিভিন্ন সামাজিক স্তরের সাংস্কৃতিক উপাদান রয়েছে, ত্রিপুরার রূপকথায়ও তা দেখা যায়। "সিপিংতুই-মাইরুংতুই" রূপকথায় ত্রিপুরীদের সাংস্কৃতিক দিক প্রকাশিত হয়েছে। তাঁতশিল্প, সূচীশিল্প এবং বাঁশ-বেতের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের কারুকার্যসম্পন্ন শিল্পসৃষ্টি প্রয়াসের নিদর্শন এতে পাওয়া যায়। তাছাড়া বিভিন্ন রূপকথায় ত্রিপুরীভাষায় সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে তাদের সঙ্গীত চর্চার পরিচয়ও মেলে।

মানবিক ও অতিমানবিক এই দুইটি দিক বাংলা রূপকথার মতো ত্রিপুরার রূপকথাও আছে। "তালনি বছাত্মা" বা চন্দ্রকুমার রূপকথায় চন্দ্রকুমারের মাতা কুফুরের উপর সমাজের নির্যাতন, "সিপিংতুই-মাইরুংতুই" রূপকথায় সিপিংতুই এর উপর তার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় বোন মাইরুংতুই-এর ঈর্ষা ও দুর্ব্যবহার এবং

নাঐ পাখী রূপকথায় কর্মতির উপর খুমতির ঈর্ষান্বিত কার্যকলাপের মধ্যে মানবিক দিক পরিস্ফুট। আবার কুফুর-এর ব্যাঙ সন্তান প্রসব, ছাত্যানী বৃক্ষের সাহায্যে কাচাংতির সশরীরে স্বর্গারোহণ, খুমতির নাঐ পাখীর পালকের সাহায্যে আকাশে উড়ে বেড়ানোর মধ্যে অতিমানবিকত্বের ব্যঞ্জনা রয়েছে। তাছাড়া দেবতা-মানুষের সম্পর্কও কোনো কোনো রূপকথায় লক্ষ্য করা যায়। "তালনি বাছাত্মা" বা চন্দ্রকুমার রূপকথায় দেখা যায় কুফুর চন্দ্রদেবের মাধ্যমে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। কুফুর অনেকটা বাংলার জনপ্রিয় রূপকথা "কাজলরেখা"-র কাজলরেখা চরিত্রের অনুরূপ সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি ও নিয়তি- তাড়িত।

দীর্ঘকাল ধরে ত্রিপুরা বঙ্গসংস্কৃতির দ্বারা পরিপুষ্টিলাভ এবং ত্রিপুরায় বহুকাল ধরে বাংলাভাষা প্রসারের ফলে হয়তো ত্রিপুরী রূপকথার উপর বাংলা রূপকথার প্রভাব পড়েছে। তবু একথা ঠিক যে, ত্রিপুরী রূপকথাগুলিতে আদিবাসীদের সমাজজীবন ও ধর্মীয় জীবনই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই রূপকথাগুলি অনুধাবন করলে এদের একটি সুষ্ঠু সমাজচিত্র চোখের সামনে ফুটে উঠে।

— ঃ —

অনুবাদ ও সমালোচনা গ্রন্থ

"মহম্মদ সিরাজুদ্দিন অবুজফর বাহাদুর শাহ" — প্রথম খন্ড

অনুবাদক — রাজকুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা

মহারাজা বীরচন্দ্র-পুত্র রাজকুমার সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা রচিত 'মহম্মদ সিরাজুদ্দিন অবুগফর বাহাদুর শাহ'— প্রথম খন্ড অনুবাদ গ্রন্থটি ১৯৩০ শালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি লেখকের বন্ধু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে।

> "সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ও সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অবনী-ন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি-লিট্, সি-আই-ই-যিনি আমাকে চিত্র, সঙ্গীত এবং সাহিত্য চর্চ্চায় সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন—তাঁহাকে এই পুস্তকখানি উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইল।"

লেখক এই অনুবাদ গ্রন্থে তৈমুর বংশের শেষ মোঘল বাদশাহ মহম্মদ সিরাজুদ্দিন অবুজফর বাহাদুর শাহের উর্দু কবিতার বঙ্গানুবাদ ছাড়াও তাঁর জীবন কাহিনী, কাব্যচর্চা ও সূফীমতে অনুরাগ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে উর্দুভাষার উৎপত্তি এবং সূফী মতবাদ সম্পর্কেও বিশেষ তথ্যপূণ আলোচনা করেছেন।

লেখক গ্রন্থটিতে অবুজফর বাহাদুর শাহের অনেকগুলি কবিতার বঙ্গানুবাদ তুলে ধরেছেন। বাহাদুর শাহের কবিতাগুলি যে অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী তা কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ পাঠে অনুধাবন করা যায়। অবশ্য উর্দু বিশেষজ্ঞ লেখকও মূলগ্রন্থে বলেছেন—

> "শেষ জীবনে তিনি যে সমস্ত দুঃখময় কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে সমুদয় অতি মর্ম্মভেদী। ব্যথার ব্যথী ব্যতিরেকে অপর ব্যক্তি কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এই রূপ হৃদয়স্পর্শী কবিতা লিখিতে পারিবে না--- ইহা সন্দেহজনক।" (পৃষ্ঠা—১৫)



বাহাদুর শাহ ১২৫৩ হিজরীতে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১২৭৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আমরণ বিদ্যানুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের মূলগ্রন্থে বক্তব্য হলো—

> "এই ভাগ্যহীন নামে মাত্র বাদশাহ যে ফার্সী ও উর্দু ভাষায় সুপন্ডিত ও সুকবি ছিলেন, তাঁহার রচিত কবিতা পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট রূপে অবগত হওয়া যায়।" — (পৃষ্ঠা—২)

বাহাদুরশাহের জীবন ছিল ভাগ্যবিড়ম্বিত। নিজ ভাগ্যদোষে জীবনের শেষ পর্যাযে তিনি নির্বাসিত জীবনযাপন করেন — যে কারণে তাঁর রচিত কবিতাগুলি এক নিরবচ্ছিন্ন কারুণ্যে ভরপুর। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখবোধ তাঁর কবিতাগুলিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বাহাদুর শাহের একটি কবিতা পর্য্যালোচনা করলে বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করা যেতে পারে।

পস—এ—মর্গ মেরে মজার পর
জো দীয়া কিসিনে জলা দিয়া,
উসে আহ দমন—এ—বাদনে
সর—এ—শাস্হিসে বুঝা দিয়া।

অনুবাদ

মৃত্যুব পর আমার সমাধির উপরে
কোনো ব্যক্তি যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া দিয়াছিল,
দুঃখেব দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে তাহা
সন্ধ্যার প্রারম্ভেই নিবাইয়া দিয়াছে।

উর্দুভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকায় এই অনুবাদগুলি ভাব ও ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে যথাযথ হয়েছে কিনা, তা যাচাই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে অনুবাদগুলি পাঠ

করলে বাহাদুর শাহের বিচিত্র মানসিকতাকে উপলব্ধি করা যায়। অনুবাদগুলির ভাষা প্রাঞ্জল, ফলে সহজবোধ্য। বাহাদুর শাহের উর্দু কবিতাসহ লেখকের কয়েকটি বঙ্গানুবাদ নীচে উদ্ধৃত করা হলো।

গজল

ক) কিসীকো হামনে ইহাঁ অপনা না পায়া,
জিসে পায়া উসে বেগানা পায়া,
কহাঁ ঢুঁঢা উসে কিস জা ন পায়া,
কোয়ী পর ঢোঁডনেওয়ালা ন পায়া।
উঢ়াকর আশিয়ান সব্ নে মেরা
কিয়া সাফ্ ইস্ কদর তিন্‌কা ন পায়া।
উসে পায়া নহীঁ আসান্ হমনে,
জব তক আপকো খোয়া ন পায়া।
দওয়ে দর্দ-এ-দিল মেঁ কিস্ সে পূঁছো,
ভরীর-এ-ইশ্‌ক কো ঢোঁডা ন পায়া।
'জফর' দিল জানে য়া হম্ কৌন জানে
কি পায়া উস্‌মেঁ ক্যা ঔর ক্যা ন পায়া।

অনুবাদ

আমি কাহাকেও এখানে আমার পাইলাম না, যাহাকেই পাইয়াছি তাহাকে পর পাইয়াছি। কতখানে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও পাইলাম না,

কিন্তু অনুসন্ধানকারী কাহাকেও পাইলাম না।

আমার বাসস্থান বায়ুতে উড়াইয়া পরিষ্কার করিয়াছে এক তৃনও পাইলাম না।

তাহাতে আমি শান্তি লাভ করি নাই।

যে পর্যন্ত আমি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছি আর পাইলাম না।



হৃদয় ব্যথার ঔষধ আমি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব,
প্রেম-চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিয়াছি পাইলাম না।
'জফর'— আমি কি জানি, অন্তঃকরণ জানে,
সেখানে যে কি কি পাইয়াছি, আর কি পাই নাই,

গজল

খ) রোজ হৈ এক গম নয়া মেরে দিল-এ-গমনাক্ মেঁ,
রোজ হৈ এক চাক-এ-তাজা সীনায়ে সদ চাকমেঁ।
উন্‌কো অন্‌জম মত্ সমঝনা মেরে তীর-এ-আহ্‌সে,
হো গিয়ে রোজন্ হৈঁ একরস সীনায়ে আফ্‌লাক্ মে।
অশক্-এ-খূন মিজগাঁ সে হৈঁ ইস তরহ্ সে লিপটা হোত্র,
লগ্‌রহী জিস তরহ্ হো আতশ্ খস ও খাসা মেঁ।
পরদা-এ-মীনাসে তু জল্‌দী নিক্‌ল, তায় দখত -এ-রজ,
দেখ্ তু বৈঠেহৈঁ কবসে মস্ত তেরী তাক মেঁ।
উসকে রুখসার-এ-মুসসফাকী জো দেখে আর ও তাব,
মিল গয়ী সব আইনাকী আবরু সব খাক্‌মেঁ।
ইশ্‌ককে দরিয়া মেঁ তেরে কৌন আশ্‌ককে সিওআ,
অয় 'জফর' এতনী কহাঁ তাক্‌ত কিসী তৈরাক মেঁ।

অনুবাদ

আমার দুঃখিত হৃদয়ে প্রত্যহ এক নূতন দুঃখ উপস্থিত হয়,
শতগ খণ্ডে ছেদিত বক্ষ প্রত্যহ নূতন খণ্ডে কর্ত্তিত হয়।
উহাকে গ্রহ নক্ষত্র বুঝিও না, আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস বাণে
আকাশ বক্ষ একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে।
রুধির অশ্রু বিন্দু পক্ষে এরূপ জড়িত হইয়াছে,



ঘাস ও আবর্জনায় যেন আগুন লাগিয়া রহিয়াছে।
ভান্ডের অন্তরাল হইতে দ্রাক্ষাদুহিতা (মদিরা)
তুই শীঘ্র চলিয়া আয়,
দেখ্ কখন হইতে উন্মত্ত ব্যক্তি তোর অপেক্ষায় রহিয়াছে।
তার পরিষ্কার কপোলের উজ্জ্বলতা যদি দেখে,
মুকুরের সম্মান ধূলাতে পরিনত হয়।
প্রেমিক ব্যতীত প্রনয়সাগরে কে সন্তরণ করে,
রে 'জফর' হেন শক্তি কোন্ সন্তরনকারীর আছে।

বাহাদুরশাহ উর্দুভাষার কবি হওয়ায় সাহিত্যরস-পিপাসু বাঙালী পাঠক সমাজে হয়তো অনেকের কাছেই তিনি অপরিচিত। ফলে এই গ্রন্থের মাধ্যমে বাহাদুর শাহের জীবন ও কবিতার সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। এই দিক থেকে বিচার করলে লেখকের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

— ঃ —

জেবুন্নিসাবেগম

সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা

ত্রিপুরার প্রখ্যাত লেখক সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার 'জেবুন্নিসাবেগম' জীবনকাহিনীমূলক গ্রন্থটি ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৯ইং) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি লেখক পত্নীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থলেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে যে গ্রন্থটি প্রনয়ণ করেন, তা তিনি সূচনাংশে উল্লেখ করেছেন—

"উক্ত বন্ধুদ্বয় আমার নিকট হইতে জেবুন্নিসাবেগমের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিবার জন্য আমাকে ধরিয়া বসেন। তাঁহাদিগের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমি অবনীন্দ্রনাথ

ঠাকুরকে কহিলাম—আপনারা যখন বলিতেছেন তখন আমি এই অসুস্থ অবস্থাতেও আপনাদের কথা রাখিতে প্রস্তুত আছি। তবে আপনাকেও ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিতে হইবে।"

জেবুন্নিসাবেগমের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনীমূলক গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বিরল বলা চলে। বঙ্কিম চন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে আমরা জেবুন্নিসাবেগমের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু এই উপন্যাসে জেবুন্নিসাবেগমের প্রনয়কাহিনীই প্রাধান্যলাভ করেছে। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-সম্পর্কিত কোনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। কবিত্বের বিষয় এবং জীবনের সুখ-দুঃখময় রোম্যান্টিক অধ্যায়ের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই দিক থেকে গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ভূমিকায় বলেছেন—

"ভারতের একচ্ছত্র মোগল সম্রাটের কন্যার কথা লিখেছেন বাংলার শ্রেষ্ঠতম রাজবংশের রাজপুত্র, এরচেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমার একান্ত শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির বশেই বন্ধুবরের লেখার ভূমিকা লিখতে প্রস্তুত হয়েছি। নাহলে আমার মনেহয় যে এই ভূমিকা—কোনো এক সুকবি সাহিত্যিকের উপর পড়লেই ভাল হতো। .... এই বই-খানিতে জেবুন্নিসার সমস্ত কবিতা ও তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি, কেবল জেবুন্নিসার জীবনের ছবিটুকু পরিস্ফুট করে তুলতে যে রচনাগুলিকে দেওয়া দরকার সেইগুলিই দেওয়া হয়েছে।"

জেবুন্নিসার কাব্যোৎকর্ষতা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

"বাদশাহ ঔরঙ্গজেব-রস কোন অবসর পেলোনা যার অন্তরে প্রবেশ করতে -তারি অন্দরে জন্মালো সুকসিকা, সুকবি জেবুন্নিসা। বড় দুঃখের জীবন সে বহন করে গেল এবং সেই অতি বড় দুঃখই দিয়ে গেল তাকে কবির অমরত্ব, তার কথা এবং তার রচনা সমস্ত জানতে কৌতূহল কার না হয়।"



জেবুন্নিসা বেগম শুধু সাহিত্যেই উপেক্ষিতা নন, তিনি ইতিহাসেও উপেক্ষিতা-যিনি জীবিতাবস্থায় মোগল হারেমের পাষাণ-অবরোধের মধ্যে অবগুণ্ঠিতা চিরবন্দিনী থেকে কবিতার পর কবিতা রচনা করেছেন। মোগল হারেমের বিলাস-ব্যসনের মধ্যে ব্যক্তি জেবুন্নিসাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাঁকে পাওয়া যাবে শুধু তাঁর কবিতার মধ্যে। জেবুন্নিসার নিজের সম্পর্কে উক্তি হলো—

দর সুখন্ পিনিহা শুদম্—
চৌ বু-এ-গুলদর্ বর্গ-এ-গুল্,
হর্ কি দীদন মৈল দারদ—
দর্ শুখন্ বীনদ্ মরা।

ভাবার্থ— ফুলের সুবাস যেমন ফুলের পাঁপড়ির ভিতর লুকাইয়া থাকে আমিও তেমন আমার কবিতার ভিতর লুকাইয়া আছি। যে আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে সে আমার কবিতার ভিতর আমাকে দেখিতে পাইবে।

গ্রন্থটিতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জেবুন্নিবেগমের জীবনকাহিনী বিবৃত হয়েছে। বাল্যকাল থেকে তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় পেয়ে পিতা ঔরঙ্গজেব বিদ্যাশিক্ষার জন্য কয়েকজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। তাদের মধ্যে মোল্লা আশরফের কাছে ২১ বৎসব বয়স পর্যন্ত জেবুন্নিসা আরবী-ফার্সী, বিবিধ ধর্মশাস্ত্র ও কাব্য ইত্যাদির পাঠ নিযে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জেবুন্নিসাবেগমের কবিত্ব প্রতিভা ছিল অসাধারণ। এই প্রসঙ্গে তিনি গৃহশিক্ষক মোল্লা অশরফেব কাছ থেকে প্রভূত প্রেরনা পান। বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেব অবশ্য কবিতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফলে জেবুন্নিসা লুকিয়ে কবিতা লিখতেন, যে কবিতাগুলি পরবর্তীকালে তাঁর 'দেওয়ান-এ-মখফী' কাব্যে বিধৃত হয়েছে। 'জেবুনমনশাত' নামে ফার্সীভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থও তিনি প্রনয়ন করেন।

নাসিরআলী, সরহিন্দী, মির্জা মহম্মদ-আলী সাহেব, মুল্লা হর্গনী, আকিলখাঁ রাজী, বহরোজ, নিয়ামত খাঁ প্রভৃতি তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ কবি ও বিদ্বান ব্যক্তিরা ছিলেন জেবুন্নিসাবেগমের সমসাময়িক। তারমধ্যে আকিল খাঁ ও নাসিরআলীর

সঙ্গে তার প্রায়ই কবিতায় বাদানুবাদ চলতো। অকিল খাঁ ছিলেন জেমান্নিসাবেগমের বিশেষ প্রিয়পাত্র।

কবিতা চর্চার উদ্দেশ্যে সেইসময় জেবুন্নিসাবেগমের মহলে প্রায়ই কবি-সম্মেলন হতো। জেবুন্নিসাবেগম পর্দার অন্তরাল থেকে এই সব কবি সম্মেলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করতেন। একদিন কাব্যালোচনার সময় কবিদের মধ্যে একজন নিম্নলিখিত পংক্তি আবৃত্তি করে তার পাদপূরণ করতে বলেন—

অগর মানদ্ শবে মানদ্ শব-এ-দিগর নমে মানদ্।
(যদি রহে, এক রাত্র রহে, দ্বিতীয় রাত্র রহে না।)

তখন নাসির আলী পাদপূরণ করলেন —

হিলাল-এ-ইদ্ চৌ অব্রু-এ-আঁ দিলবর নমে মানদ্,
অগর মনদ্ শবে মানদ্ শব-এ-দিগর নমে মানদ।
(ঈদের চন্দ্র (দ্বিতীয়ার চন্দ্র) প্রিয়তমার মত রহেনা,
যদি রহে, এক রাত্র রহে, দ্বিতীয় রাত্র রহে না।)

এই ভাবে সকলের পাদপূরণ শেষ হলে জেবুন্নিসা পাদপূরণ করলেন—

হেজাব-এ-নৌ অরুসাঁ দরবর শৌহর নমে মানদ্,
অগর মানদ্ শবে মানদ্ শব-এ-দিগর নমে মানদ্।
(পতির বক্ষে (আলিঙ্গনে নববধূগনের লজ্জা রহে না,
যদি রহে, এক রাত্র রহে, দ্বিতীয় রাত্র রহে না।)
(জেবুন্নিসাবেগম—পৃষ্ঠা—২৪-২৫)

প্রথমদিকে পিতা ঔরঙ্গজেবের উপর জেবুন্নিসাবেগমের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। তিনি ছিলেন বাদশাহের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। রাজকার্যের জরুরী প্রসঙ্গে ঔরঙ্গজেব তার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হলো না। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর আরোপ এবং হিন্দুদের উপর অন্যায় অত্যাচারের

পরিপ্রেক্ষিতে রাজপুতানায় বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হয়। এই বিদ্রোহে ঔরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আক্‌বর রাজ্যলোভে রাজপুতদের পক্ষাবলম্বন করেন। সেই সময় সহোদরের সঙ্গে জেবুন্নিসাবেগমের গোপন পত্রালাপ চলাকালীন গুপ্তচর মারফৎ সেই পত্র হস্তগত করে ঔরঙ্গজেব জেবুন্নিসাকে সলীমগড় দুর্গে বন্দী করে রাখেন। বন্দিনী অবস্থায় তিনি শুধু বিদ্যালোচনায় দিন অতিবাহিত করতেন। বন্দিনী অবস্থায় লিখিত তাঁর একটি রচনা—

''দর্দা-কিজ কয়েদ সিতম্ আজাদ নগ্‌শতম্
এক লহজা জেগমহায়ে জহাঁ শাদ নগ্‌শতম।
গরচে পাবজ্ঞির 'মখফী' জদ্ তা হে দিওয়ার-এ-গম্
শুকুর আল্লা কজ্ জফা-এ-হমগুনাঁ আসুদা অম
দিল-এ-মন্ আসির 'মখফী' বাবলাই হিজর তাকে
কি বজুজ হৌয়াই ওসলত্ গনাহ্‌দিগর নদারম।
'মুখফী' উমেদ্ রেহাই তাব রোজ হনত্র নেস্ত
খাক-এ-গুর্বত হরকে রদির মহদ দামনিগর শুদ্
তা মরা জঞ্জির দরপায়ে দিল দিওয়ানা শুদ্
দোস্ত শুদ্ দুশমন মরা হর আশ্‌না বেগানা শুদ্।

ভাবার্থ—

হায় ব্যথা-উৎপীড়নের কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।
এক মুহূর্তের জন্যও আমি ভবযন্ত্রনা হইতে পরিত্রান পাইলাম না।
যদিও পায়ে বেড়ি আছে ও দুঃখরূপ প্রাচীরের অন্তরালে রহিয়াছি,
ধন্য ভগবান-সকলের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়া, আরামেই আছি।
বিচ্ছেদের যন্ত্রনায় আমার মন কতদিন পর্যন্ত বন্দী থাকিবে?
কেবল মিলনের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোনো পাপ মনে রাখি না।
দারিদ্রের ধূলা যাহাকে শৈশব হইতে স্পর্শ করিয়াছে,
তাহার মহা প্রলয়ের পূর্বে মুক্তির আশা নাই।
যখন হইতে পায়ে বেড়ি পরিয়াছি সেইদিন হইতেই মন উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে।



যাহারা আমার বন্ধু ছিল তাহারা ও আমার শত্রু হইয়াছে এবং
প্রিয়জনও এখন আমার অপরিচিত হইয়া গিয়াছে।

এইভাবে চরম দুঃখে এক বৎসরের উপর তিনি সলীমগড় দুর্গে বন্দিনী ছিলেন।

কবি আকিলখাঁ যখন লাহোরের শাসনকর্তা তখন ঔরঙ্গজেব অসুস্থ অবস্থায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য লাহোরে গেলে জেবুন্নিসাও সঙ্গে যান। সেখানে আকিলখাঁর সঙ্গে তার ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ হয় এবং এই সূত্রে তাদের প্রনয় গাঢ় হয়। কিছুদিন পর ঔরঙ্গজেব চলে এলেও জেবুন্নিসা বাগানের কাজ শেষ না হওয়ায় সেখানে কিছুদিন থাকেন। এদিকে দাসীর মুখে আকিলখাঁ ও জেবুন্নিসার প্রনয় কাহিনী শুনে ঔরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হলেও কন্যাকে কিছু বললেন না, কিন্তু তার বিবাহের উদ্যোগ করলেন। এইক্ষেত্রে জেবুন্নিসার কোনো বাধা আরোপ করার সাহস ছিল না। তিনি এই শর্তে সম্মতি দিলেন যে তার বিবাহের খবর সর্বত্র জানাতে হবে। ঔরঙ্গজেবও তাইকরলেন। প্রার্থীদের প্রার্থনাপত্র পৌঁছলে জেবুন্নিসা পিতার সঙ্গে আলোচনা করে আকিলখাঁকেই মনোনীত করলেন। ঔরঙ্গজেব বিবাহ নির্ধারিত করে আকিলখাঁকে দিল্লীতে আসার জন্য আমন্ত্রন জানালেন। কিন্তু আকিলখাঁ ইতিমধ্যে কোনো এক ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির চিঠি পেয়ে ভুল বুঝে দিল্লীতে না এসে লাহোর থেকে ভয়ে পালিয়ে গেলেন। জেবুন্নিসা এই খবরে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ঔরঙ্গজেব তারপর জেবুন্নিসার অনুমতিক্রমে পারস্যাধিপতির পুত্র শাহজাদা ফারুকের সঙ্গে বিবাহ দিতে মনস্থ করে শাহজাদা ফারুকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু জেবুন্নিসা ও শাহজাহা ফারুকের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি হওয়ায় জেবুন্নিসা এই বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। ফলে শাহজাদা ফারুক ব্যর্থ হয়ে পারস্যে ফিরে গেলেন।

শাহজাদা ফারুক যখন দিল্লীতে এলেন তখন আকিলখাঁ ও গোপনে দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। জেবুন্নিসা লোকমুখে খবর পেয়ে আবার গোপনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আকিলখাঁ জেবুন্নিসার চিঠি পেয়ে গোপনে বেগমমহলে যাতায়াত শুরু করলেন, কিন্তু এই খবর বেশী দিন গোপন রইলো না। ঔরঙ্গজেব একজন পরিচারিকাকে কৌশলে বশীভূত করলেন এবং আকিলখাঁকে বেগমমহলে



থাকাকালীন পরিচারিকার কাছ থেকে খবর পেয়ে জেবুন্নিসাবেগমের মহলে এলেন। জেবুন্নিসা এই খবর পেয়ে আকিলখাঁকে মহলের কোনে রক্ষিত জেবুন্নিসার স্নানের জল গরম করার বড়-একটি পাত্রে লুকিয়ে রাখলেন। ঔরঙ্গজের সুচতুর, তিনি ঘরে এসে কন্যাকে কিছু না বলে চারদিক দেখতে দেখতে জল গরম করার পাত্রটি দেখতে পেয়ে একমূহূর্তে সব বুঝে নিলেন এবং পরিচারক ও পরিচারিকাদের সেই পাত্রে জেবুন্নিসার জন্য স্নানের জল গরম করতে আদেশ দিলেন। জেবুন্নিসা এই হৃদয়-বিদারক আদেশে উন্মত্ত হয়ে পাত্রটির কাছে গিয়ে আকিলখাঁকে নীরব থাকতে অনুরোধ করলেন। আকিলখাঁ জেবুন্নিসাকে প্রানাপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন। তাই প্রিয়জনের অনুরোধ রক্ষা করে তিনি জীবন্ত দগ্ধ হলেন।

জেবুন্নিসাবেগম ও অকিলখাঁর প্রনয় অত্যন্ত পবিত্র ছিল। এরপর জেবুন্নিসাবেগমের পরবর্তী জীবন অত্যন্ত বেদনাময়। সবসময় নির্জনে বাস করে শুধু বিদ্যানুশীলনে ব্যাপৃত থাকতেন। ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কাশ্মীর যাবার কালে লাহোরে তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানে তিনি যে বাগান তৈরী করেছিলেন, সেই বাগানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ কবিতাটি হলো—

বর মজার-এ-মা গরীবাঁ নে চেরাগ-ও নে গুলে
নৈ পর-এ-পরওয়ানয়ে ও নে সদা-এ-বুলবুলে।

ভাবার্থ— জন্মভুমিত্যাগী আমাদের সমাধির উপর একটী প্রদীপও নাই ফুলও নাই। একটি পতঙ্গের পক্ষ পর্যন্ত নাই ও বুলবুল পাখীর শব্দ নাই।

গ্রন্থটিতে জেবুন্নিসাবেগমের জীবন সম্পর্কিত নানাদিক উন্মোচিত হয়েছে. এই গ্রন্থে তাঁর জীবনের নানা বিবরণ পাওয়া যায়। এইদিক থেকে গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। লেখকের বক্তব্য অত্যন্ত সাবসীল। এই গ্রন্থের কবিতাগুলির অনুবাদ সম্পর্কে লেখকের নিজের বক্তব্য হলো—

"ফার্সী কবিতার প্রত্যেক কথার প্রতিশব্দ ঠিক রাখিয়া বাঙ্গালায় অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন। এ প্রকার অনুবাদ করিতে গেলে অনেক স্থলে অস্বাভাবিক ও শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। তথাপি প্রত্যেক শব্দের অর্থ ঠিক রাখিয়াই অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে সেরূপ করা নিতান্ত অসম্ভব হইয়াছে সেখানে ভাবার্থ মাত্র লেখা হইল। ("জেবুন্নিসাবেগম—পৃষ্ঠা-১৪)

তাছাড়া সমগ্র জীবন-কাহিনী পর্যালোচনা করলে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জেবুন্নিসাকেই খুঁজে পাওয়া যায়। আলস্য ও বিলাসের লীলাভূমিরূপে মোগল হারেম সম্পর্কে আমাদের যে চিরাচরিত ধারণা মনে বদ্ধমূল, জেবুন্নিসাবেগমের জীবনকাহিনী আমাদের সেই চিরাচরিত বদ্ধমূল ধারণার উপর তীব্র আঘাত হানে। গুলবদন বেগম, নূরজাঁহা, তাজবিবি, জাহাঁনারা, জেবুন্নিসাবেগম এই ধারণার পূর্ণ ব্যতিক্রম। জেবুন্নিসাবেগম যে কত বড় বিদুষী ছিলেন তা এই গ্রন্থপাঠে জানা যায়।

— ঃ —

বঙ্গীয় কবি

কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত,

ত্রিপুরার বিশিষ্ট লেখক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'বঙ্গীয় কবি' গ্রন্থটি ১৩১৬ ত্রিপুরাব্দে (১৯০৬ইং) আগরতলা---'বঙ্গীয় কবি' কার্যালয় থেকে শ্রীজীতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যয়ভার গ্রহণ করায় লেখক সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।

'বঙ্গীয় কবি' কয়েকটি খন্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছা সম্পাদকের ছিল। 'বিপ্রখন্ড' 'কায়স্থ খন্ড' ও 'ইসলাম খন্ড' এই নামকরণ করার অভিপ্রায় ছিল। আলোচ্য খন্ডটির নাম 'অম্বষ্ঠ খন্ড'।

গ্রন্থকার বৈদ্যজাতীয় লেখকদের রচনা সংকলনের কারণ হিসাবে গ্রন্থের নিবেদন অংশে বলেছেন---

''বিগত ১৩০২ সনের শ্রাবণ মাসের 'নব্যভারত' পত্রিকায় 'রামপ্রসাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল,—

''—সেই প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ কায়স্থই বঙ্গ ভাষার যাহা কিছু অনুশীলন করিয়াছিলেন। এক কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত বৈদ্যদিগের কাহাকেও এ পথে বড একটা দেখা যায় না।''

''এই ভ্রমাত্মক উক্তি পাঠ করিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, প্রাচীন বৈদ্য কবিগণের বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে কিনা।''

এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের বৈদ্যজাতীয় লেখকের রচিত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাঁদের জীবনী প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বৈদ্য কবিদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম আলোচনা করেছেন। নামী-অনামী সব কবিই আলোচনায় স্থান পেয়েছেন।

গ্রন্থটি সাধুভাষায় লিখিত। ভাষা সহজ ও পরিচ্ছন্ন। লেখকের গদ্যশৈলীর দুইটি নমুনা দেওয়া গেল।

ক) ''রামপ্রসাদ সাধক ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন অথচ কবিও ছিলেন। এজন্যই তাঁহার অন্তরের গভীর ভাব গানে ব্যক্ত করিয়া বঙ্গদেশ মোহিত করিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ মনিকাঞ্চণ যোগ অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।''

(বঙ্গীয় কবি-রামপ্রসাদ সেন-পৃষ্ঠা-৩৪৩-৩৪৪)

খ) ''ভগবদ্ভক্তি কৃষ্ণবিহারীর চিরসম্বল ছিল। যে শ্রেণীর লোকই হউক না কেন, ধার্ম্মিক হইলেই তাঁহার নিকট যথেষ্ট আদর পাইত। তিনি যেমন ধার্ম্মিক তেমনই দয়ালু এবং বিনয়ী ছিলেন। ভগবানের কৃপায় তিনি অনন্তগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।''

(বঙ্গীয় কবি-কৃষ্ণবিহারী সেন—পৃষ্ঠা-৫৯৫)

—:—



মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যে বাহাদুরের

সঙ্গীত সংকলন

ত্রিপুরার রাজদরবারে মহারাজারা বংশ পরম্পরায় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। মহারাজাদের মধ্যে অনেকে আবার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। মহারাজা ধন্যমাণিক্যের সময় থেকেই ত্রিপুরায় সঙ্গীত শিক্ষার প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গদেশ ত্রিহূত থেকে সঙ্গীতজ্ঞদের এনে ত্রিপুরার প্রজাসাধারণকে মহারাজা সঙ্গীত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন।

ত্রিহূত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি।
রাজ্যেতে শিখায় গীতি নৃত্য নৃপমনি।
ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়।
(রাজমালা —ধন্যমাণিক্য খন্ড- পৃষ্ঠা—২৯)

বিভিন্ন রাজ আমলেও সঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা হতে থাকে এবং মহারাজা বীরচন্দ্রের সময়ে সঙ্গীতচর্চা ও সাধনা এক উত্তুঙ্গ অবস্থায় উন্নীত হয়। মহারাজা বীরচন্দ্র ছিলেন একধারে সঙ্গীতজ্ঞ ও কলারসিক। তিনি যে কতবড় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তার প্রমান রয়েছে তাঁর রাজদরবারে বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞদের সমাবেশে। তাছাড়া তাঁর রচিত 'হোরি' ও 'ঝুলন' দুইটি সঙ্গীত কাব্য এর প্রকৃষ্ট প্রমান। শুধু তাই নয়, মহারাজা বীরচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য পৌত্র বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য এবং প্রপৌত্র বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য প্রত্যেকেই যে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তার প্রমান রয়েছে তাঁদের রচিত রাগ-রাগিনী সংবলিত সঙ্গীতগুলিতে। তাঁদের সঙ্গীতের বানী অবশ্য রচিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের প্রনয়লীলাকে কেন্দ্র করে। এর অন্যতম কারণ হলো, তাঁরা সকলেই ছিলেন ভক্ত-বৈষ্ণব। সঙ্গীতজ্ঞ বীরচন্দ্র সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কার্সিয়াং-এ একাধিকবার রাজআতিথ্য আস্বাদনের স্মৃতিচারণে বলেছেন—

"মহারাজা বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মতো অনভিজ্ঞের গান গাওয়া যে কতদূর সংকোচের ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। কেবল তাঁর স্নেহের প্রশ্রয় আমাকে সাহস দিয়েছিল।" (পঞ্চমাণিক্য — পৃষ্ঠা—১১৯)

ত্রিপুরার সঙ্গীতখ্যাতি একসময়ে বাংলার বাইরে সুদূর কাশ্মীর দরবার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সেই পথ ধরে ত্রিপুরার রাজ দরবারে বিষ্ণুপুরের যদুনাথ ভট্টাচার্য ওরফে যদুভট্ট, কাশেমআলীর মতো ওস্তাদ শিল্পীর আগমন হয়। সেইসময় মহারাজা বীরচন্দ্রের চেষ্টায় ও শ্রমে ত্রিপুরার রাজদরবারকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল রচিত হয়, তারই আকর্ষণে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার ত্রিপুরায় আসেন।

ত্রিপুরার মহারাজারা সকলেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুষ্ঠু সাধনা করেছেন। দরবারী কানাড়া, সিন্ধুরা, কাফী, ভৈরবী, তিলককামোদ, মালকোষ, বাগেশ্রী, বৃন্দাবনী সারঙ্গ প্রভৃতি রাগসমূহের বিশেষ অনুশীলন করে তাঁরা ঐ সব রাগ-রাগিনীতে সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এই বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যময়তার পেছনে মহারাজা বীরচন্দ্রের অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁর ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় ত্রিপুরায় সঙ্গীতের প্রসারতা যে অনেক বেড়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'হোরি' ও 'ঝুলন' দুইটি কাব্যের সঙ্গীত সংকলন ব্যতীত আরও বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত মহারাজা বীরচন্দ্র রচনা করেছিলেন, অবশ্য তার সবগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক প্রকাশিত 'ফাল্গুনী' (১৩২৬ ত্রিপুরাব্দ) নামে একটি সঙ্গীত গ্রন্থে মহারাজা বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর মাণিক্য ও নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা রচিত কতগুলি সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা তাঁদের রচিত আরও কিছু সঙ্গীত পাওয়া গেছে, যেগুলির কাব্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না।

মহারাজা বীরচন্দ্র রাধার বিচিত্র মনোভাব নিয়ে কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। একটি পদের বর্ণনায় কবি কানুপ্রেম-মুগ্ধ দুঃখিনী রাধার মর্মবেদনা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন —

সখির কি কব মরম কথা।
সুখের আশায় পাষাণ হৃদয়
চাপিয়া পাইনু ব্যথা।

অতএব হৃদয়ে যে আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে, তার কথা কাকেই বা বলা যায়—

কহিব কাহারে মরমের কথা
যাবে কেবা পরতীত।
হৃদয় মাঝারে যে আগুন জ্বলে
জানয়ে আপন চিত।।

কিন্তু কবি শ্যাম পিরীতের স্বরূপ জেনে বলছেন—

চন্দন যেমন ঘসিত শীতল
অধিক সৌরভময়।
ঐছন পিরীতি শ্যামবন্ধু আর
দাস বীরচন্দ্র কয়।।

রাধাও কুল-মান সব দিয়ে এখন কানুর প্রেমের স্বরূপ বুঝে বলছেন—

কপট পিরীতি হাম আগে না বুঝলু
মরণ অধিক সম লাজ।
জাতি তেয়াগিনু নাহি বিচারিনু
নিরখিয়া স্বরূপ রাজ।।

ফলে কানুর প্রতি রাধার অনুযোগ ধ্বনিত হয়—

জানি-জানি ওহে তোমার কি দোষ
প্রেমিক রসিক রায়।
চিরকাল যার শঠতা অভ্যাস
ছাড়িতে পারে কি তায়।।

তারপর রাধার আক্ষেপোক্তি—

ক্রমেতে চিনিনু চিনিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া ঠেকিনু দায়।
এখন বুঝিনু খলের পিরীতি
মুকুর ছায়ার প্রায়।।

এই অঘটনের জন্য বিরহিনী রাধা এখন বিধাতাকে সর্বতো ভাবে দায়ী করছেন-

নিদারুন বিহি কি করিলি ইহা
কমলে কীটের বাস।
সরলা হরিনী বাধিতে বিপাকে
পাতিয়া রেখেছে ফাঁস।।

কয়েকটি গৌরাঙ্গবিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কীর্তন পদও কবি বীরচন্দ্র রচনা করেছেন। এইসব কীর্ত্তনে ভক্ত হৃদয়ের আকুতিই বিশেষভাবে প্রতিফলিত। ভক্ত কবি গৌরাঙ্গের চরণ বন্দনা করে বলেছেন—

একি আনন্দ শ্রী গৌরাঙ্গ চরনে বন্দন মন।
ত্বরিতে সিন্ধু পদার বিন্দু হৃদে কর অবলম্বন।।

গৌরাঙ্গের প্রেম-মহিমার স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে কবি বলেন—

হিন্দু-যবন নিয়ে ভক্তগণ-সংকীর্তনে সদা মত্ত।
বীরচন্দ্র কহে নিত্য হরিব নামে হয়ে মত্ত।।

আবার হরিনামের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলছেন-

কিবা যদি সতী কিবা নিজ জাতি
সেই হরি নাহি ভজে।
ভবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
রৌরব নরকে মাঝে।।

পরিশেষে বিষয় বাসনা লিপ্ত কবিমনের আপেক্ষ —

বীরেন্দ্র দাস ভাবে অভিলাষ
মিছায় মায়ার ভুলিয়া গেল।
হরি না ভজিনু বিষয়ে মজিনু
হৃদয়ে রহিল শেল।

রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক কীর্তনগুলি বিচিত্রভাবে ভরপুর, রাধার মানভঞ্জন করার মানসে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাদূতীকে বলছেন —

দেওগো বৃন্দে আমারে যোগী সাজায়ে।
সর্ব্বত্যাগী হব আমি শ্রীরাধার মানের দায়ে।।

শিবের মতো সর্বত্যাগী হয়ে তিনি এখন একাগ্রচিত্তে রাধার মান ভিক্ষা করবেন বলে স্থির প্রতিজ্ঞ —

আর কিছু নাহি অপিক্ষে, মননে করিয়ে শিক্ষে,
রাই মান করিব ভিক্ষে, শিঙ্গা ডম্বুর বাজায়ে।

আর একটি পদে সখীরা রাধার মানভঞ্জন করতে গিয়ে বলছে —

এখন মানের ভরে উপেক্ষিলে কান্তে
কিন্তু মরতে হবে শেষে কাঁদতে কাঁদতে,
মানান্তে প্রানান্তে আর পাবিনে কান্তে।

একটি কীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের মানসিক অবস্থা সুন্দরভাবে প্রকাশিত —

পাশরিতে চাহে যবে পাশরা না যায় গো—
স্মরি স্মরি হৃদয় অধির,
কভু বা উছলে আশা, কভু নিরাশায় গো—
ঝরা ঝরা ঝরে আঁখি নীর।

উপরি-উক্ত পদটিতে দ্বিজ চন্ডীদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। দ্বিজ চন্ডীদাসের 'পূর্বরাগ' পর্যায়ের একটি পদ আছে—

পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।

শ্রীকৃষ্ণের এই মানসিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে কবিও সকৌতুকে বলছেন

হেরিয়ে ভুলিছে মন, ভুলে পুন চায় গো
হেরিতে সে নবরূপ চাঁদে,
দাস বীরচন্দ্র ভনে কালিয়া ঠেকিল গো
আজি নব অনুরাগ ফাঁদে।।

মহারাজা বীরচন্দ্রের অধিকাংশ সঙ্গীত ভক্তের দৃষ্টিতে লেখা। ভক্ত হৃদয়ের গভীর আকুতি সঙ্গীতের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। যেমন—

কবে দেখিয়া তোমারে নয়ন ভরিয়া
প্রানের পিয়াসা মিটাব,
কবে তোমার নামেতে মিশিয়া গলিয়া
আকুল হইয়া কাঁদিব।

এখানে ভক্ত- প্রানের গভীর আর্তিই প্রকাশিত। অবশেষে কবির আকুল প্রার্থনা

কি বলে ডাকিলে দাও তুমি সাড়া
কেমনে তোমারে পাইব,
কবে আমার যা কিছু সকলি বিলায়ে
তোমার চরণে লুটাব।।

মহারাজা বীরচন্দ্র অসংখ্য বিভিন্ন ভাবের কবিতা ও কীর্তন রচনা করেছেন। যেগুলি অনুধাবন করলে ভক্তকবি বীরচন্দ্রকেই বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। পরিপূর্ণ ভাবের বশে লিখেছেন বলেই কবিতাগুলি অত্যন্ত সহজ ও আন্তরিকতাপূর্ণ। মহারাজা বীরচন্দ্রের যুগ বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের যুগ তথা মহাকাব্যের যুগ। এই মহাকাব্যের যুগে থেকে তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তিনি পদাবলী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হন। এর একমাত্র কারন হলো, কবির ভক্তিপ্রবণ মন। পার্বত্য প্রদেশের এক নিভৃত কন্দরে বসে তিনি একাগ্রমনে পদাবলীর ছয়ায় ভক্তিমূলক পদাবলী সঙ্গীত রচনা করে এই ধারাকে পুষ্ট করার একান্ত চেষ্টা করেছেন, এ বড় কম কথা নয়। এই দিক থেকে বিচার করলে তিনি পদাবলী সাহিত্য ধারার ধারক ও বাহক। কবি বীরচন্দ্র হলেন সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি।

— ঃ —

যদুভট্রের সঙ্গীত সংকলন

কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা মহারাজা বীরচন্দ্রের রাজসভাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার সঙ্গে তুলনা করেছেন। মহারাজা বীরচন্দ্রের রাজসভায় গুণী-রসিকদের যে অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতজ্ঞরা সেই সময় ত্রিপুরার রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া গায়ক যদুনাথ ভট্রাচার্য ওরফে যদুভট্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, তিনি প্রথমে কাশ্মীর দরবারে ছিলেন এবং পরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সুপারিশে ত্রিপুর দরবারে আসেন। গায়ক যদুভট্র ত্রিপুরায় আগমন বিষয়ে কর্নেল মহিমঠাকুরের মন্তব্য হলো—

> ''এবার বিধাতা ত্রিপুর দরবারে মনিকাঞ্চন যোগ করিয়া দিলেন।............. এখন পর্যন্ত কলিকাতা, কাশী প্রভৃতি স্থানে ভট্র মহাশয়ের স্বরচিত সঙ্গীত এবং তাহাতে ত্রিপুরার বীরচন্দ্র নাম সংযুক্ত থাকা শুনা যায়।'' – (দেশীয় রাজ্য- পৃষ্ঠা-১৯৪-১৯৫)

যদুভট্ট ঠিক কত সালে ত্রিপুরায় এসেছিল তা জানা যায় না, তবে তিনি যে মহারাজা বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে এসেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যদুভট্ট বিভিন্ন সঙ্গীতের ভনিতায় 'তানরাজ' ও 'রঙ্গনাথ' এই দুইটি উপাধি দৃষ্ট হয়। এই উপাধিগুলি তিনি কোথায় এবং কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, এই সম্পর্কে মত বিরোধ আছে। রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন— "ঠাকুর পরিবারের সূত্রে ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মাণিক্যের সহিত ইনি পরিচিত হন, মহারাজা ইহাকে "রঙ্গনাথ" উপাধি দেন।" (রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রকাশ" চতুর্থ খন্ড-পৃষ্ঠা-২৫৮)। সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "ত্রিপুরার রাজদরবার হইতে যদুভট্ট "রঙ্গনাথ" পদবী ও পঞ্চকোটের রাজদরবার হইতে "তানরাজ" উপাধি লাভ করেন।" (সঙ্গীত চন্দ্রিকা'-পৃষ্ঠা ১০৬৮), আবার শান্তিদেব ঘোষের এই সম্পর্কে মন্তব্য হলো--"যদুভট্টের গুনপনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজা তাঁকে "তানরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন।" (রবীন্দ্র সঙ্গীত বিচিত্রা-পৃষ্ঠা-২৩৬)। ১৩৪১ সালে প্রকাশিত "সঙ্গীত মঞ্জরী" গ্রন্থের ৩২৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—"ত্রিপুরার মহারাজা স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দরবারে, বিষ্ণুপুর নিবাসী স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদুভট্ট) মহাশয় "তানরাজ" এবং পঞ্চকোটের মহারাজা স্বর্গীয় নীলমণি সিংহ বাহাদুরের দরবারে "রঙ্গনাথ" উপাধি প্রাপ্ত হন। অবশ্য ডঃ উৎপলা গোস্বামীও এই মত সমর্থন করে তাঁর গবেষনা গ্রন্থে বলেছেন— "পঞ্চকোট রাজা ওঁকে রঙ্গনাথ উপাধি দেন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তাঁর সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে "তানরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন।" (ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" —পৃষ্ঠা-১৬২)

তবে এই প্রসঙ্গে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের এডিকং কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মার অভিমতটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন— "বিষ্ণুপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ স্বাভাবিক গায়ক যদুভট্ট (যিনি কলিকাতায় বড় বড় লোকের দরবারেও গতিবিধি করিতেন) আসিয়া উপস্থিত হইলেন,— কাশ্মীরের মহারাজা হইতে তানরাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া।" (দেশীয় রাজ্য-পৃষ্ঠা ১৯৪)। তাঁর এই উক্তিতে

প্রমানিত হয় যে যদুভট্ট "তানরাজ" উপাধি ত্রিপুরা দরবার থেকে প্রাপ্ত হননি। আবার "রঙ্গনাথ" উপাধি মহারাজা বীরচন্দ্র দিয়েছিলেন কিনা এ সম্পর্কেও তিনি কিছু উল্লেখ করেননি" গ্রন্থে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের উদ্দেশ্যে লেখা যদুভট্টের একটি গান আছে। এই গানটি তিলক কামোদ রাগে চৌতালে (মধ্যগতি) রচিত। এই গানটির ভনিতায় "তানরাজ"উল্লেখ আছে। গানটি হলো—

তড়পত চিত মন তুম বিন হো রাজাধিরাজ
বীরচন্দ্র মাণিক্য ত্রিপুরেশ্বর ঘরি পল ছিন।
ইতনী অরজ মোর শুন লীজে কৃপা করো
দুখ অপার মাঁঝ ভয়ো হুঁ মগন।
কহন সকত বখান জো বীতন লাগতুঅ দরশ বিন
দিল বিচ অব সোঁ চেত বিছুট জাত প্রাণ।
নিদিয়া না আওয়ে, নৈন গই চৈন নিশদিন
তুঅ পাস মৈঁ আজ তানরাজ বন।

উপরি-উক্ত সঙ্গীতে শেষ ছত্র থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মহারাজা বীরচন্দ্র তাঁকে "তানরাজ" উপাধি দিয়েছিলেন।

উপরি উক্ত মন্তব্যগুলি বিতর্কমূলক হওয়ার ফলে এই প্রসঙ্গে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপণিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মার মন্তব্যটি এক অর্থে যথার্থ। তিনি শুধু মহারাজা বীরচন্দ্রের পরিসহায়কই ছিলেন না, একান্ত পার্শ্বচররূপেও মহারাজার সব কাজে থাকতেন। ফলে দরবার থেকে শুরু করে মহারাজার ব্যক্তিজীবনে তার প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। তাছাড়া তিনি তৎকালীন অনেক কিছুরই প্রত্যক্ষদর্শী। তবু সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে প্রসঙ্গটি আরও গবেষণার অপেক্ষা রাখে। তবে যদুভট্ট যে কিছুকাল ত্রিপুর দরবারে শোভাবর্ধন করেছিলেন, তাতে কোনো দ্বিমত নেই।

যদুভট্ট রচিত সঙ্গীতগুলি আজ বিস্মৃতির গর্ভে। তবু কিছু সঙ্গীত যা বর্তমানে

পাওয়া গেছে, সেগুলি মূলতঃ ভজন ও রাজ প্রশস্তিমূলক সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। সঙ্গীতগুলি হিন্দীভাষায় লিখিত। যদুভট্টের সঙ্গীতগুলিতে মনে হয়, পদবৈচিত্র্য অপেক্ষা সুরবৈচিত্র্যই প্রধান হিসাবে কাজ করেছে। দুইটি সঙ্গীত নমুনা হিসাবে নীচে দেওয়া গেল।

(১)

ছায়ানট— সুরফাকতাল (মধ্যগতি)

শম্ভুহর মহেশ আদি ত্রিলোচন ভব-ভয় হর ভবেশ
দীননাথ দানব-দলন দীনেশ্বর।
জটাজুট পিনাকী ভস্ম রুদ্রমালা গরল গরে
ধর হর ওঢ় বাঘাম্বর।
নাচত চন্দ্রভাল বম্ বম্ বাজে ঘন ঘন
অতি অপূর্ব হরিগুণ গাওত ত্রিপুরেশ্বর।
বীরচন্দ্র নরপতি প্রকাশে করনসোঁ
অধর ধর সুমধুর তান সাঁচ সুন্দর।। রঙ্গনাথ।।

(২)

রাধারমন মদনমোহন মাধব মুকুন্দমুরারী,—
মধুসূদন মনোহর ময়ূরপুচ্ছধারী।
কৃষ্ণকেশব কানু কালীয়মর্দ্দন কলুষহারী কংসারী,
কালা কমলাপতি কৃতান্ত দনুজারী হরি।।
ব্রজমে গির'ধরলাল ব্রজরাজ গোপাল
ব্রজপাল ব্রজবাল,
বাঁকে বিহারীনীলনীরদ শ্যাম নওলকিশোর
জয়তি যদুনাথ শ্রীগোপীনাথ হরি।।

— : —

ত্রিপুরার রাজকবি ও গায়ক মদনমোহন মিত্রের সঙ্গীত সংকলন

ত্রিপুর দরবারের রাজকবি মদনমোহন মিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা বলেছেন—

"শ্রীযুক্ত মদনমোহন মিত্র,—তিনি ছিলেন রাজকবি সুরসিক — স্বভাবকবি-তিনি বীরচন্দ্রের সাথী ছিলেন, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ছিলেন ইয়ার" —(দেশীয় রাজ্য-পৃষ্ঠা ১৮৭)

দরবারী কবি মদনমোহন মিত্র মহারাজা বীরচন্দ্রের সভায় আগত বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে অন্যতম। নিজগুণে ও স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতায় তিনি ত্রিপুর দরবারে নিজের স্থান করে নেন। তাঁর রচিত "কবিতা কদম্ব", "জীবনময় কাব্য" প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ সহজলভ্য নয় বলে এই গুলির কাব্যিক মূল্য নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে বর্তমানে সম্ভব নয়। তিনিও মহারাজা বীরচন্দ্রের মতো ভক্ত-বৈষ্ণব ও সুকবি ছিলেন। তাঁর কবিতা সেইসময়ে সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। তাঁর লেখা একটি পদ ভোলা যায় না—

মদের নেশা সয়েছিলাম
নামে আমায় কৈল পাগল।

তিনি বহু কীর্ত্তন রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত কীর্ত্তনগুলির সুরলালিত্য ও ভাববৈচিত্র্য অস্বীকার কারা যায় না। এইসব কীর্ত্তন জনসাধারনের কাছে অত্যন্ত আদরনীয় ছিল। তাঁর একটি জনপ্রিয় কীর্ত্তন হলো—

রাঙ্গাধূলি ব্রজের পথে
কিবা রাঙ্গাধূলি
আবিরে.......................................।
ব্রজ-গোপিকার চরণ পরশ রসিক
যমুনার পুলিন পথে রাঙ্গাধূলি,



রাঙ্গারেনু পরে ধেনুর পদচিহ্ন-রাজি রাজে
ব্রজগোপ শিশুগণের পদচিহ্ন- মাঝে মাঝে
ধ্বজ বজ্রাংকুশ রেখা, আছে যেই পদে লেখা,
সে পদচিহ্ন যায়রে দেখা,
আবির মাখা গোঠের পথে।
কমলা যে ধূলা চাহে সে ধূলায় হব লীন
কবে হবে হেন ভাগ্য, কবে হবে হেন দিন
ভবের ধূলাখেলা ত্যজে ধূলার তরে যাব ব্রজে।
গায় মেখে সেই রাঙ্গা রজে,
বেড়াব পথে পথে, রাঙ্গাধূলি।

কাফি-সিন্ধু ও সিন্ধুরা-ধামার আশ্রিত দুইটি রাগিনীতে এই গানটি সেই সময়ে গাওয়া হতো। কথিত আছে, মহারাজা বীরচন্দ্র ও বীরচন্দ্র দরবারের ধ্রুপদীয়া সঙ্গীতজ্ঞ যদুভট্ট এই দুইজন শিল্পী উপরি-উক্ত দুইটি রাগিনীতে এই কীর্তনটির সুর সংযোজন করেন।

তিনি বেশ কয়েকটি নাম কীর্তন রচনা করেন, যেগুলি অত্যন্ত মাধুর্যমণ্ডিত। একটি পদ ---

ওরে ও জগাই-মাধাই
একবার হরি বলে কোলে আয়।।
মাধাই তোরা দু'ভাই আমরা দু'ভাই
হরিনামের গুণে
তোরা খালাস হবি ভবের দায়।।

হরিনামে আত্মহারা হয়ে কবি বলছেন --

যার নামে হৃদয় শিহরে,
যার নামে নয়ন ঝরে,



সেই কাঁচাসোনার বরণ
প্রাণের মানুষ কাছে এল
যেচে আমায় কোল দিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে পূর্ণ ভগবতসত্তার সন্ধান পেয়ে কবি গাইলেন —

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে শচীমায়ের উদরে,
(সে - যে) ব্রজের বলাই, হয়ে নিতাই, প্রেম বিলায় ঘরে ঘরে
(শিব) ত্যজে কাশী শ্মশানবাসী, এই হরিনামের তরে,
(সে - যে) আপনি হর গঙ্গাধর, পঞ্চমুখে হরির নাম করে।।
নারদ ঋষি দিবানিশি, বীণাযন্ত্রে গান করে,
থেকে ব্রহ্মালোকে চতুর্মুখে বিরিঞ্চি বাঞ্ছা করে।

তাই ভগবানের কাছে ভক্ত কবির নিবেদন --

তুমি শ্রীরাধার সনে, বাঁধা প্রাণে প্রাণে
ভিন্ন দেহে ভবে রহিলে কেনে,
হেরে জুড়াই নয়ন, নীরদ বরণ
শ্রীরাধার রূপে মিশে যাও।।
তোমার কমল নয়নে, অশ্রুধারা বিনে,
সাজেনাত অঞ্চলে,
তুমি হয়ে উদাসী ত্যজিয়ে হাসি,
কেঁদে এ পাষাণ গলাও।।
তোমার ঘনশ্যাম দেহ, ছুটতে নারে কেহ,
ব্রজাঙ্গনা ব্রজের রাখাল বিনে,
এবার করুণা দানে, তাপিত জনে,
কোল দিয়ে এ পরাণ জুড়াও।।



রাজকবি মদনমোহন মিত্র ছিলেন মরমী কবি। তাঁর কবিত্বের সহজ স্নিগ্ধ সৌরভ নিমেষে পাঠকের মনকে স্পর্শ করে। তাঁর রচিত কীর্ত্তনগুলিতে সহজ ভাষায় প্রাণের আবেগ পরিস্ফুট। কবির আত্মভোলা উদাসী মনটি হলো পরিপূর্ণ বাউল মন - যে মন শুধু সর্বত্র মনের মানুষকে খুঁজে খুঁজে ফেরে —

মলয় পবন ছুঁয়েরে যেমন মালতী ফুটেরে বনে,
তেমনি সাধুর গায়ের বাতাস লেগে নাম ফুটেরে মনে।
এমন মণিমানুষ পাই যদিরে কোল দিয়ে তারে সোনা হই।

— ঃ —

মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সঙ্গীত সংকলন

মহারাজা বীরচন্দ্রের পর পরবর্তী মহারাজাদের সময়েও ত্রিপুরায় সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত থাকে। মহারাজা রাধাকিশোরও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। পূর্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনিও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর এই সঙ্গীতানুশীলনের ক্ষেত্রে পিতা মহারাজ বীরচন্দ্র ও রবীন্দ্র নাথের প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। মহারাজা রাধাকিশোরের রচিত সঙ্গীতগুলি এতদিন প্রচার বিমুখতার জন্য সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি। তবে দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক প্রকাশিত "ফাল্গুনী" (১৩২৬ ত্রিপুরাব্দ) নামে একটি কাব্যগ্রন্থে তাঁর কিছু সংখ্যক সঙ্গীত প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকারের অন্তর্গত প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'গোমতী' সাহিত্য পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে তাঁর কিছু কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। সেইজন্য তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলির বর্তমানে মূল্যায়ন করা সম্ভব।

কিছু সংখ্যক পদের ভণিতায় 'বৃন্দাবনচন্দ্র' নামটি পাওয়া যায়। যেমন- একটি পদের ভণিতায় —



বৃন্দাবন দাসে যুগল চরণ আশে,
গীতছন্দে দোহুঁরূপ কহে।
যে মাধুরী নিরখিয়া, পুলকে পূরল হিয়া,
হৃদে ধরি আঁখি মুদি রহে।।

অন্য একটি পদের ভণিতায় —

কালিয়া রূপ উপমা কালিয়া রূপেতে সীমা,
ভন বৃন্দাবনচন্দ্র দাস।

এটি মহারাজা রাধাকিশোরের অন্য একটি নাম, যা তাঁর ঠিকুজিতে উল্লিখিত।

ত্রিপুরায় রাসলীলা বা রাসকীর্তন একটি ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসব। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাজদ্বারে নিমন্ত্রিত হয়ে মণিপুরী কীর্তনীয়ারা এই উৎসবে এসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। অদ্যাবধি এই রাসলীলা ত্রিপুরায় সাড়ম্বরে প্রতিপলিত হয়। ত্রিপুরার মহারাজারা এই রাসলীলা উপলক্ষে বিভিন্ন রাগ সম্বলিত বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন। তবে অধিকাংশ সঙ্গীত ব্রজবুলিতে লেখা। মহারাজা রাধাকিশোরও রাসলীলা উপলক্ষ্যে সঙ্গীত রচনা করেছেন।

মহারাজা রাধাকিশোর রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ভক্তিভরে হোলি বিষয়ক সঙ্গীত, কীর্তন ও প্রার্থনা বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করেন। একটি পদে তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন —

নীল নবাম্বুজ জিনি, কালিয়া বরণখানি,
ইন্দ্রধনু জিনি শিরে চূড়া,
রাধা নাম লেখা তায় বামে হেলে মৃদুবায়,
দুসূতি মুকুতাদামে বেড়া।
ললাটে চন্দন চাঁদ রাধামন ধরা ফাঁদ,
কোটী শশী জিনিয়া বরণ,
জিনিয়া মদন ধনু, ভুরুর ভঙ্গিমা জনু,
ইন্দিবর জিনিয়া নয়ান।



রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ বর্ণনায় —

চহুদিশি সখি ঠাট, যেনরে চাঁদের হাট
মাঝে তার শোভে রাধা-কানু।
নীল তমাল থৈছে, হেমলতা বেড়িয়াছে,
নবমেঘে সৌদামিনী জনু।।

আর একটি পদে —

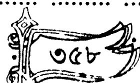
বৈঠল দুহুঁজন মিটিল সুরত তিয়াস।
অলস অবশ তনু, মৃদু মৃদু বহ শ্বাস।।
বিচলিত চূড়া, দলিত ললিত বনমালা।
কবরী স্খলিত ভই দোলিত কুন্ডল জাল।।
দুহুঁক ভাল পরিমানক বিন্দু বিলাস।
দুহুঁ হি সম্বরল নীলিম পীতিম বাস।।

প্রার্থনা বিষয়ক পদে দেখা যায়, কবি ভক্তিভরে নিজেকে রাধাকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেছেন —

শ্যামমুখ চান্দ-চকোরিনী রাধে।
কৃষ্ণধন মানস হংসিনী রাধে,
অশ্রুময় রাধাকিশোর চরণে লুটে।।

কবি কয়েকটি কীর্তন গান রচনা করেছেন। এইসব কীর্তন গানে ভক্তহৃদয়ের আকুতিই পরিস্ফুট হয়েছে।

এ মরজগতে সুধাময় নাম নিতাই দিয়াছে ঢালি,
(নামের) তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া বাজাওরে করতালি
বল হরি-হরি আর বা এমন সুদিন পাইবে কবে,
হাসিয়া কাঁদিয়া দুটি বাহু তোলে কাঁদাও-নাচাও সবে।
....



— সে যে আশা করে —

— ঐ পদাশ্রয়কে আশা করে —

আর একটি পদ —

ত্রিভঙ্গিমা ছাঁদে, পীতধরা বেঁধে, ধরেছে কদম্ব শাখা।

— তোরে কই বিশাখা —

কটিতে কিংকিনী, জিনি সৌদামিনী, জ্বলিছে অনল শিখা।।

....

ভাবেরে অবোধে বৃন্দাবনচন্দ্র

অন্তে পাব বলে দেখা।।

— সে যে আশা করে —

ঐ পদাশ্রয় পাবার লাগি —

মহারাজা রাধাকিশোরের অধিকাংশ অপ্রকাশিত কবিতা পরবর্তীকালে 'রবি', 'ফাল্গুনী', 'বসন্তরাস', 'গোমতী' প্রভৃতি ত্রিপুরার সাহিত্য পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর অধিকাংশ সঙ্গীতই রাগ-রাগিনী সংবলিত থাকায় তিনি যে সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়। কবিতাগুলিতে কবির ভক্তিপ্রবণতার মাত্রাধিক্যের ফলে কাব্যিক অনুভূতি কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে। কবিতাগুলিতে খুব একটা উপমা-অলংকারের প্রাচুর্য নেই, কিন্তু সহজ ভাষায় প্রাণের আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া কবিতাগুলিতে পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট।

— ঃ —



মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সঙ্গীত সংকলন

ত্রিপুরার মহারাজারা মূলতঃ শৈব ছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকাল (১২৪০-১২৫৯ ত্রিপুরাব্দ) থেকে ত্রিপরায় বৈষ্ণব প্রভাব পড়তে থাকে, এবং ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠের চর্চা সেই সময় থেকে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে মহারাজা বীরচন্দ্রের গভীর বৈষ্ণব ধর্মানুরাগ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে পরবর্তী রাজন্যবর্গ ও রাজপরিবারের সর্বত্র বৈষ্ণব প্রভাব সঞ্চারিত হয়। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ সমগ্র অন্তর দিয়ে এই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁদের জীবন ও সাহিত্যকর্মে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধাকিশোর মাণিক্য ও বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য প্রমুখ ত্রিপুরাধিপতিগণ পদাবলী সাহিত্যের অনুসরণে কাব্য ও সঙ্গীত রচনা করেছেন। বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য যে ত্রিপুরার সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পিতামহ বীরচন্দ্র ও পিতা রাধাকিশোরের মতো মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরও সঙ্গীত রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনিও তাঁদের মতো রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করেন।

মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গীতগুলি ছাপা হয়নি, তবে বর্তমানে ত্রিপুরায় 'মাণিক্যগীতি মালিকা' নামে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে তাঁর ৪০টি কবিতা ছাপা হয়েছিল। প্রত্যেকটি কবিতার শেষে পদাবলী সুলভ ভণিতায় নাম থাকায় কবিতাগুলি তাঁর লেখা বলে অনুমিত হয়, যেমন —

১। বীরেন্দ্রদাস কহে এহেন সময়ে শশী
বধিবে প্রেমিক বিরহী জনেরে।।

২। বৃন্দাবিপিনবনে অতি মনোলোভা।
হেরইতে বীরেন্দ্র মনোরথ শোভা।।

৩। ভনত বীরেন্দ্রকিশোর ও দেহ পদযুগল ভজই।



মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত হোরি, ঝুলন এবং গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করেন। এইসব সঙ্গীতে ভক্তিই মূলসুর। তিনি ভক্তের দৃষ্টিতে পদাবলীর ছায়ায সঙ্গীতগুলি রচনা করেন।

একটি পদে কবি শ্যামের রূপ বণনায় বলছেন —

হেবইতে চাঁদমুখ মরমে পরম সুখ
সুন্দর শ্যামের অঙ্গ।
চরণে নুপূরমণি সুমধুরধ্বনি শুনি
ধরনিক ধৈরয ভঙ্গ।।

কবির রাধাকৃষ্ণের ঝুলন বর্ণনাও সুন্দর —

বৃন্দাবিপিন বনে কুঞ্জে,
বিহারে হরি হয়ে বসন্ত।
কোথায় ময়ূরী ধায়,
কোকিল পঞ্চমে গায়,
ভ্রমরা গুঞ্জরে অবিশ্রান্ত।
নানা জাতে ফুঁটে ফুল,
সুগন্ধে করে আকুল
সকলে হইল মধুমত্ত।

একটি পদে কবি রাধাকৃষ্ণের হোলি খেলার চিত্র এঁকেছেন —

আহা কি মনোমোহন রূপ হেরি নয়নে।
নাচিছে ভুবনমোহন ভুবনমোহিনী সনে।।
লয়ে প্যারী আবির করে দিতেছে শ্যামের অঙ্গে
হেলে রাই প্রেমভরে ঐ ধরিছে পীতবসনে।।



গৌরাঙ্গ বিষয়ক একটি পদে কবি গৌরাঙ্গের রূপ ভজনা করে বলছেন -

জুড়াব তাপিত আঁখি রূপ দরশনে।
সাদরে গৌরাঙ্গ গুণ গাহিব বদনে।।
বীরেন্দ্র বলে সখি কায়বাক্য মনে।
কাকুতি করিয়া মাগি নিব প্রেমধনে।।

কবিতাগুলিতে কবির ভক্তিপূর্ণ আকুতিই বিশেষভাবে প্রতিফলিত। কোনো কোনো কবিতায় মহারাজা বীরচন্দ্রের কবিতার প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের একটি পদ —

কবে বা দেখিব দেখিয়া জুড়াব শ্যামসনে শ্যামমোহিনী,
বসন্তে আনন্দে গাইছে যত সখি মোহিনী।।

বসন্তরাগ করিয়া সঞ্চার সবে গায় মনমাতিয়া।
গভীর গর্জন বাজিছে মৃদঙ্গ তালে করতাল মিশিয়া।।

আর মহারাজা বীরচন্দ্রের 'ঝুলন' কাব্যের একটি পদে আছে —

কবে বা হেরিব হেরি জুড়াইব
শ্যামবামে শ্যামমোহিনী।
মিলন আনন্দে নাচে চারিদিকে
যত সখি বনমোহিনী।।
(মরি) পঞ্চমরাগ করিয়া সঞ্চার
গায়ে মন মোহিয়া।
জলদ গম্ভীর বাজিছে মাদল
করতাল তালে মিশিয়া।।

কবিতাগুলি বিশেষ উন্নতমানের নয়, তবে কবির আন্তরিকতা অনেক সময় পাঠককের মনকে স্পর্শ করে।

হোলী

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর

বংশ পরম্পরায় মাণিক্য বাহাদুরগণ সঙ্গীত রসিক ছিলেন। কেবল শ্রোতা হিসাবেই নয়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাণী রচনায়ও তাঁরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীত রচনায় মহারাজ বীরবিক্রমও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতচর্চার যোগ্য সহকারী ছিলেন ত্রিপুরার সঙ্গীতাচার্য ও সুদক্ষ চিত্রশিল্পী ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মা। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সেইসময় 'রাধাকৃষ্ণলীলাবিলাস', 'চাঁদকুমুদিনী' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য রচিত ও পরিবেশিত হয়।

হোলি ত্রিপুরার জাতীয় উৎসব। এই উৎসবে ত্রিপুরার সর্বত্র আনন্দের সাড়া পড়ে। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠে। সঙ্গীত রচনা ও তাতে সুরারোপ করে গান গেয়ে রাজধানীর পথ পরিক্রমা কেবল সাধারণ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, অভিজাত বা এমনকি অন্তঃপুরচারিকারাও এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলো। হোলিকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরায় সঙ্গীত রচনার ধুম পড়ে যেতো। এই সঙ্গীত রচনা ও সুর সংযোজনার মধ্যে একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ প্রতিযোগিতার স্পর্শ থাকতো। তাছাড়া ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহদানের মাধ্যমে এই উৎসবের ভাব-বৈচিত্র্য ও মাধুর্য বহুল পরিমাণে বর্ধিত হতো। ত্রিপুরার মহারাজারাও যে এই হোলি উৎসবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন এবং হোলি বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করে তাতে সুরারোপ করতেন, তা আমরা বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধাকিশোর মাণিক্য ও বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সাহিত্যকর্ম অনুধাবন করলে বুঝতে পারি। পরবর্তীকালে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরও পূর্ব ঐতিহ্যের ধারা অনুযায়ী 'হোলী' নামে হোলি বিষয়ক একটি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন। ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে (১৯৪১ ইং) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে তিনি মার্গ সঙ্গীতের বিস্তারিত আলোচনা করে স্বরচিত কয়েকটি গান স্বরলিপিসহ প্রকাশ করেন।

গ্রন্থের 'অবতরণিকা'য় হোলি উৎসবের প্রাচীনত্ব ও তার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে নর নারী যে পুণ্যের মধ্য দিয়ে পাপকে পরাস্ত করেন, তা মহারাজা বীরবিক্রম বাৎসায়ণের 'কামসূত্র'-এর সাহায্যে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া এই অংশে তিনি কাব্যরস প্রসঙ্গে নবরসের ব্যখ্যা করে মানবজীবনে এই রসের ভূমিকা যে কত সুদূরপ্রসারী তা দেখিয়েছেন। পরিশেষে হোলি উৎসব সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য হলো —

'হোলী উৎসবটি যেন নর-নারীর প্রচেষ্টা, প্রেমকে পার্থিব জগত হইতে বহু উচ্চে লইয়া যাওয়া — প্রেমপূর্ণ প্রাণের আবেগকে যেন ভগবানে নিবেদন করা — ভগবান যিনি স্বয়ং প্রেমের প্রতিরূপ।''

অবতরণিকার পর গ্রন্থে মার্গ সঙ্গীত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাতে রাগ-রাগিনীর উৎপত্তি, স্বর ও গ্রাম, রাগ-রাগিনীর ঠাট্, জাতি ও গাইবার সময়, বাদী-সম্বাদী-অনুবাদী, অস্থায়ী-অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, সঙ্গীতের অলঙ্কার ও তার শ্রেণীবিভাগ এবং কয়েকটি প্রচলিত তাল ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এরপর উল্লেখযোগ্য যে, 'হোলী' গ্রন্থে সন্নিবেশিত সঙ্গীতগুলির স্বরলিপি সৃষ্টি করেছেন ত্রিপুরার সঙ্গীতাচার্য ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মা। 'হোলী' গ্রন্থ থেকে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য রচিত দুইটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করা গেল।

(১)

মধু মাধবী সারং

কাওয়ালী

চমকন লাগে তেরী বিন্দিয়া সৈঁইয়া।
উরত অম্বর লালে বাদর,
বিজয়ী চমকে তেরী বিন্দিয়া সৈঁইয়া
ঘটাঘন গরজত, দফা ডাম্বর
বরষে বারি পিচকারী রঙ্গিয়া।

(২)

মিশ্রধানী

কাওয়ালী

আজু হেরি এ নব প্রেম চমক আওয়ে।
গোপনারী সঙ্গহোরী খেলন যাওয়ে।।
পরনারী সঙ্গ প্রেমসে করত রঙ্গ,
রসে রসিকনাগর কো সরমন আওয়ে।।
কুলমান তন ধন সব লেওয়েছিন
মুরালী ফুকারে শ্যাম সেনহ্ লগায়ে।।

'হোলী' গ্রন্থের আরম্ভ ও শেষের দুইটি গান বাংলা ভাষায় লেখা। শেষের গানটি অপেক্ষাকৃত তাৎপর্যপূর্ণ। গানটির প্রথমে কবির মর্মবেদনা বিশেষভাবে অনুরণিত।

যে আশায় এতদিন পরাণ বাঁধিয়া,
ভেবেছিনু যবে আসিবে হোলিয়া,
সে হোলী আসিয়া গিয়াছে চলিয়া,
আমার খেলাত হল না খেলা।।

মহারাজা বীরবিক্রম রাজকার্যে লিপ্ত থেকে এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেও সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে তাঁর পূর্বসূরীদের অনুপ্রেরণা এবং নিজস্ব বিশিষ্ট মানসিকতার দানও তুচ্ছ নয়।

সঙ্গীত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। তাছাড়া মার্গ সঙ্গীতের বিষয়-বৈচিত্র্য বুঝতে ও জানতে হলে এই গ্রন্থটি বিশেষ অপরিহার্য।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ত্রিপুরায় হোলি উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গান রচিত হয়। এইসব গানের সাঙ্গীতিক মূল্য একেবারে কম নয়। বিষয় ও সুর-



বৈচিত্র্য গানগুলির লক্ষণীয় বিষয়। মহারাজা বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর মাণিক্য, রাজকবি মদনমোহন মিত্র, রাজবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণের মধ্যে অনেকেই হোলির গান রচনা করেছেন। বিভিন্ন জনের লেখা কয়েকটি হোলি সঙ্গীত নীচে দেওয়া হলো —

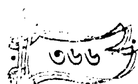
মহারাজা ররাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মহিষী মহারাণী তুলসীবতী দেবীর একটি রচনা ঃ—

ঘেরি ঘেরি সখি সবে
পুলকে মাতিল যবে,
আবির কুম্‌কুম্ কস্তুরী দিতেছে শ্যামের অঙ্গে,
লালে লাল হল তনু,
আকুলিত রাই-কানু,
চূড়া-কুন্তল হেলে বাজে মোহন বাঁশীরে।
হেরি অপরূপ,
রাই-কানু রূপ
তুলসীবতী যেন রাঙ্গাপদ হেররে।

সঙ্গীতাচার্য ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মা রচিত একটি সঙ্গীত ঃ—

বাগেশ্রী

হেরিয়া বিলাস-রসে খেলত কান্‌হাইয়া,
ছোড়ত আবির কুম্‌কুম্ রাই-মুখ হেরিয়া।
পিয়ারী মুছত আঁখি উড়ানা আবির,
নিদিয়া নাগরশ্যাম হাসে ঠারি ঠারি,
সখীগণে সবে মিলি ধরল শ্যামেরে ঘিরি,
পাশরি সবহুঁ সাথে দেওয়ত রঙীন করি।।



সঙ্গীতাচার্য ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মার ভ্রাতা ঠাকুর সুধীরকৃষ্ণ দেববর্মার রচিত একটি হোলি সঙ্গীত ঃ -

নটনারায়ণ

আজি ফাগুনে রঙীন পরশে
উনমত নটবর নটরাজ অরুণরাগে।
হই মধুমাসে মিলন হরষে,
মাতিছে ফাগুন রাগে রাঙা অনুরাগে —
পিয়ারী ফাগুণ ফাগে।
কুয়েলার কুহুতানে অলিয়ার গুঞ্জরণে
ময়ুর-ময়ুরী নাচে নব অনুরাগে —
পিয়ারী ফাগুণ ফাগে।

ত্রিপুরার জনসাধারণের রচিত কয়েকটি সঙ্গীত, যেগুলি ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের (১৯২৮ ইং) চৈত্রমাসের 'রবি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ঃ—

(১)

রাগিনী - সাহানা মিশ্র

হোরিয়া খেলত রাই কানাইয়া সঙ্গে,
আবির কুম্‌কুম্‌ ছোড়ে সখিগণ রঙ্গে।
চারি ভিতে ঘুরি ঘুরি,
মারে সবে পিচকারী,
কুম্‌কুম্‌ ছোড়ত কেহ সে কোমল অঙ্গে।
সখীগণ সহ রাই
আকুলি ব্যাকুলি হই,
কালাচাঁদে করে লাল মাতিয়া সুরঙ্গে।

(২)

রাগিনী - ভূপালী

আবিরে অরুণ ভেল শীতল তমাল তল
ধরিল অরুণ ভাতি নীলিম যমুনা জল।
অরুণিত শ্যামতনু,
অরুণ মোহন বেনু,
অরুনিম আভাময়ী বরজ গোপিকাকুল।
আবিরে নীলিমা ঢাকা,
কনকে সিঁদুর মাখা,
একতনু রাধাকানু জলদে বিজলীদল।

(৩)

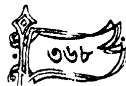
রাগিনী — কেদারা

যুবতী-ধরমনাশা বিষম বাঁশের বাঁশী,
বধিতে অবলাগণে উগারে গরলরাশি।
মোহন মুরলী তানে,
মরম সহিত টানে,
বাঁশী নয়-বাঁশী নয়-দারুণ প্রেমের ফাঁসী।
কোন্ বনে কে বাজায় —
বনপথে কে বা যায়,
দেখে আয় - দেখে আয় — হইনু তাঁহার দাসী।

(৪)

রাগিনী — পূরবী।

আবির খেলিছে ঐ নিঠুর তোর কালিয়া,



ঘুম ঘোরে আঁখি দুটি পড়িতেছে ঢলিয়া।
মালতীব মালা গলে,
পাত বসন দোলে,
অলস আবেশে তাহা পড়িতেছে খসিয়া।
সারারাতি কাটাইনু,
বসে কত কাঁদিনু,
ধিক্ তোর কানুকে সখি লাজেতে যাই মরিয়া।

(৫)

রাগিনী - মিশ্র

(আজি) বসন্ত ফাগুয়া আইল,
হৃদয়ে বাঁশরী বাজিল।
লতায় পাতায় ফাগুণ জাগায়,
কোকিল কুহরে পুলক ব্যথায়,
বিরহিনী জনে ঝারাফুল প্রায়,
সারাটী রজনী যাপিল।
আজি এ জোছনা বসন্ত নিশিথে,
হোলিতে মাতিব রাই-কানু সাথে,
লুটাব বরজ অরুণ পথে
পুলকে পরাণ পুরিল।

(ত্রিপুরাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্য — পৃষ্ঠা - ১৯৭-২০০)

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় থেকে মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের আমল পর্যন্ত যে ঐতিহ্যপূর্ণ সঙ্গীতের ধারা অব্যাহত ছিল, পরবর্তীকালেও তার প্রসারতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ত্রিপুরার রাজ আমলে প্রতিষ্ঠিত দুইটি প্রধান সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সঙ্গীত শিক্ষার প্রভাব ও বিস্তৃতি

নিঃসন্দেহে এই ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। উপরি-উক্ত দুইটি সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের একটি ত্রিপুরার বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণজিৎ দেববর্মণের এবং অন্যটি সঙ্গীতাচার্য ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মার দ্বারা পরিচালিত হতো। ঠাকুর অনিলকৃষ্ণের সঙ্গীত কেন্দ্রটি ১৯২৬ সালে স্থাপিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 'ঐকতান বাদন সমিতি', কিন্তু পরবর্তীকালে এই নাম পরিবর্তন করে নাম দেওয়া হয় 'অনিল সঙ্গীত বিদ্যালয়'। সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণজিৎ দেববর্মণের সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রে প্রধানতঃ যুগের চাহিদা অনুযায়ী লঘু সঙ্গীতের চর্চা হতো, কিন্তু 'অনিল সঙ্গীত বিদ্যালয়' সর্বতোভাবে মার্গ সঙ্গীতেরই পৃষ্ঠপোষক ছিল।

ত্রিপুরার উজীর বাড়িতে ঠাকুর অনিল কৃষ্ণ দেববর্মার জন্ম হয়। তিনি রাজমন্ত্রী উজীর গোপীকৃষ্ণ দেববর্মার পৌত্র। পিতামহ গোপীকৃষ্ণ ও পিতামহী অনঙ্গমোহিনীর প্রভাব তাঁর ব্যক্তিজীবনে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। তাছাড়া পিতাঠাকুর রাধাকৃষ্ণ দেববর্মার সঙ্গীতানুরাগও বিশেষভাবে অনুরণিত হয়েছিল পুত্রের মানসতন্ত্রীতে। পরবর্তীকালে এই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ ত্রিপুরার রাজপরিষদ ও বিশিষ্ট সেতারবিদ্ শ্রীযুত রাধাচরণ শীল মহাশয়ের কাছে সেতারের প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। তারপর মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের দরবারে সঙ্গীত সম্রাট সরোদিয়া আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব কয়েকবার আমন্ত্রিত হয়ে এলে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে ঠাকুর অনিল কৃষ্ণ বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর তালিম নেন। ১৯৩২ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করে তিনি ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেন ও সঙ্গীতাচার্য আখ্যায় ভূষিত হন। ১৯৩৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে তিনি যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪ ইং সনের অমৃতবাজার পত্রিকায় বলা হয়েছে —

"Kumar Anil Krishna Dev of Triurah State showed his skill in sitar. His 'Desh' was accompanied by Prof. Alaudddin Khan on Tabla.



ঠাকুর অনিলকৃষ্ণের সঙ্গীত প্রতিভা প্রসঙ্গে তাঁর সুহৃদও ত্রিপুরার বিশিষ্ট সেতার শিল্পী স্বর্গীয় বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্য হলো —

> ''ঠাকুর অনিলকৃষ্ণের মধ্যে ছিল গুণীবংশজাত অর্থাৎ তানসেনী ঘরেয়াজাত রাগ-রাগিনীর গৎ-এর এবং তার অলংকারাদির সুষ্ঠু প্রয়োগে নতুন নতুন গৎ নিজে সৃষ্টি করার প্রেরণা এবং সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সারাজীবন যা বাজিয়েছিলেন বা ছাত্রদের শিখিয়েছেন, সমস্ত গৎগুলিই তাঁর স্বরচিত অলংকারাদিসমেত।''
> ('দৃষ্টিকোণ' পত্রিকা - ১ম বর্ষ - ২য় সংখ্যা, পৌষ - ১৩৭০ বাং)

ঠাকুর অনিলকৃষ্ণের স্বরচিত গৎ তাঁর রচিত 'নাদলিপি' সঙ্গীত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। লোকসঙ্গীতের ভিত্তিতে 'ত্রিপিসারং' ও 'ত্রিপুরাবতী' নামে দুইটি বিশিষ্ট রাগ সৃষ্টি তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই দুইটি রাগের সুষ্ঠু পরিচয় উপরি-উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সঙ্গীতশিল্পী এবং সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। নীচে দুইটি সঙ্গীত 'নাদলিপি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা গেল।

(১)

শ্রীরাগ — একতালা

নাদোপাসনা।

হে নাদ ব্রহ্ম তুমি ওঁকাররূপে রূপ নিয়েছ।
রূপের আস্বাদন লাগি রাগ-রাগিনীতে প্রকাশ হচ্ছে।
স্বরজ ঋষভ মুখ্য প্রকাশ,
রাগ রাগিনী গৌণ প্রকাশ,
কণ্ঠে যন্ত্রে ভাবের প্রকাশ হতেছ।।



(২)

ভৈরব রাগ–একতালা

প্রার্থনা।

তোমার মীরে বান্ধি লহ মোরে,
রাখ তব আশে পাশে।
মূরছনা দিয়ো নাহি বারে বারে,
মুরছিত যেন না হই শেষে।
বরণ অতীত, শবদ রহিত,
মীরের মাঝারে বিন্দু তুমি।
বিন্দু সিন্ধুতে ভাসায়ে রাখহ,
ভাসিয়া থাকিতে চাহি আমি।

—ঃ—

"তব স্মরণখানি"

কৃষ্ণজিৎ দেববর্মণ

মহারাজা বীরচন্দ্রে সময় থেকে ত্রিপুরায় সঙ্গীতের যে প্রসারতা লাভ করে, পরবর্তীকালে ত্রিপুরদরবারে ও জনসাধারণের মধ্যে সেই চর্চা অব্যাহত ছিল। এই ধারা যাঁরা বহমান রাখেন, তারমধ্যে স্বর্গীয় কৃষ্ণজিৎ দেববর্মণের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞরূপে কৃষ্ণজিৎ দেববর্মণের খ্যাতি ত্রিপুরায় আজও অম্লান। তিনি ভারতের প্রখ্যাত মার্গ সঙ্গীতশিল্পী ওস্তাদ ভীষ্মদেবের কাছে বার বৎসর সঙ্গীত শিক্ষালাভ করে ত্রিপুরায় ফিরে এসে একটি সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ হলেও লঘু সঙ্গীতকে কখনও হেয় জ্ঞান করেননি।

শিল্পী কৃষ্ণজিৎ দেবর্বমণের জীবিতাবস্থায়ই তাঁর লেখা সঙ্গীতের "তব স্মরণখানি" নামে একটি সঙ্গীত-সংকলন গ্রন্থ (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ সালে) প্রকাশিত হয়। তিনি আধুনিক বাংলা গান, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত, ভজন, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গীত বচনা করে উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

ত্রিপুরার মহারাজাদের সাহিত্যকর্মে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি। পদাবলী সাহিত্যের এই প্রভাব ত্রিপুরার সমসাময়িক এবং পরবর্তী কবিদের কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণজিৎ দেববর্মণও পদাবলী সাহিত্যের ভাবধারায় কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের মথুায় গমন উপলক্ষ করে কৃষ্ণবিহীন বৃন্দাবনের একটি ব্যথাতুর তিনি চিত্র এঁকেছেন —

ওপারে মথুরাপুরে শ্যামচাঁদ হাসে,
এপারে নয়ন-নীরে বৃন্দাবন ভাসে।
দু'কুলের কান্না-হাসি বুকেতে লয়ে,
গোকুলের যমুনা যায় উজান ব'য়ে.
ঝড়ে মেঘ চাঁদ হাসে একটি আকাশে।



জীবন নদীর পারে যে নিত্য ভাঙ্গা-গড়ার খেলা চলছে, তার আভাস পদটিতে সুস্পষ্ট। রাধার প্রিয়-বিরহের আকুলতাকে কবি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে বলছেন—

এ পার ভাঙন্ ধরে নীল যমুনার
ও পারে ভরিছে কূল দূর মথুরার
গোকুলে বরষা কাঁদে মথুরার মধুমাসে।

আর একটি কবিতায় দেখা যায়, কৃষ্ণ-বিরহিনী শ্রীরাধা মান করে বলছেন —

প্রনয় ফিরায়ে নিতে
কানুরে কহিও,
(তারে) তোমরা আমার শেষ
প্রণতিটি দিও।
আমার কথা কিছু সে যদি শুধায়,
কহিও তোমরা তারে ভুলিতে রাধায়।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজা হয়ে সুখে মত্ত থেকে রাধাকে ভুলে গেছেন। ফলে রাধা দূরে সরে যেতে চান — শ্রীকৃষ্ণের সুখের পথে বাধাস্বরূপ হতে চান না। তাই দুর্জয় অভিমানে সখীকে বলছেন —

স্মরিয়া তোমরা সখি এ দুঃখিনী রাধা,
কানুর সুখের পথে দিও না গো বাধা।
না কহিও কিছু তারে আঘাত হানি,
ব্যথা পাবে সে যে মোর বড় অভিমানী,
(সখি) সে ব্যথা লাগিবে মোরে তোমরা জানিও।

এখানে কবি রাধার স্নিগ্ধ মানসিকতাকে প্রতিফলিত করেছেন। পরিশেষে রাধার বক্তব্য হলো —

পিরীতি, পিয়াসা মোর
না মিটিতে হায়,
কানুর বিহনে যদি
এ জীবন যায়,
তবে - রাখিও প্রেমের ফুলে
ভিজায়ে নয়ন-জলে
দেখিয়ো শুকায়ে সে যেন না ঝরে।

এই রাধা কবি চন্ডীদাসের রাধার মতো জনমদুখিনী।

কবি ভক্তের দৃষ্টিতে কয়েকটি ভজনও কীর্ত্তন পর্যায়ের সঙ্গীত রচনা করেছেন। একটি ভজনে কবি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ভগবৎ-পদে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বলছেন —

মোর নয়ন-শ্রাবণে যদি না ফুটিত প্রেম-কেতকী,
তব চরণ পরশ প্রভু এ জীবন মম পেত কি?

আর একটি ভজনে কবি রাধাকৃষ্ণের হোরি খেলাকে উপলক্ষ করে একটি সুন্দর অনুরাগের চিত্র এঁকেছেন —

নওল কিশোর রাঙা রঙিলা শ্রীরাধারাণী,
ফুল-দোল-লীলা-রাগে দুঁহু দুঁহে জানাজানি।
আবির মাখান ছলে
বাহুমালা দেয় গলে
সোহাগে শিহরে তনু মুখে নাহি সরে বাণী।



কবির রচিত আধুনিক বাংলা গানগুলিতেও ভক্তপ্রাণের আকুতি বিধৃত। বিধাতার সৃষ্ট প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য কবিপ্রাণে এক নূতন রসসঞ্চার করেছে। তাই প্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবি গাইলেন —

পরাণেরি পূর্ণতা মোর তোমার প্রভাতখানি,
হে সুন্দর তৃপ্তি মম তব সন্ধ্যারাণী।
সুন্দরী ঐ শুকতারা
আমার সে যে গোপন সারা
অতল প্রাণের প্রেমের সে যে একটি গভীর বাণী।

আর একটি কবিতায় কবি বলছেন —

এ ধূলির ধরণীতে
দেবতারে পাবো কোথা?
তাই দেবতারে প্রিয় করি
প্রিয়েরে দেবতা।

উদ্ধৃত পদটি রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণব কবিতা'র কয়েকটি ছত্রের সঙ্গে বিশেষ মিল রয়েছে। ছত্র কয়টি হলো —

"দেবতারে যাহা দিতে পারি তাই দিই
প্রিয়জনে - প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি
তাই দিই দেবতারে, আর পাবো কোথা
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় ছিল যে, বৈষ্ণব কবিরা নিশ্চয়ই বাস্তব জগতের প্রিয়াকে সামনে রেখে তাঁদের প্রেমগাথা রচনা করেছেন। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাকেই নিবেদন করি, যাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসি এবং তার মধ্য দিয়ে দেবতারও

সেবা করি। ফলে এই মানবিক প্রেমের মধ্যে ভগবৎ - সত্তার উপলব্ধি ঘটে বলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। কবিও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতে বিশ্বাসী।

"তব স্মরণখানি" সঙ্গীত গ্রন্থটিতে কবির একশোটি সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে। ত্রিপুরার মহারাজাদের ও রাজবংশীয়দের উপর রবীন্দ্র-প্রভাব যে অপরিসীম তা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে। তবে মহারাজাদের সাহিত্যকর্ম অপেক্ষা ব্যক্তিজীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেশী পড়েছে। মহারাজাদের সাহিত্যকর্মে তুলনায় পদাবলী সাহিত্যের প্রভাবই সুস্পষ্ট। কিন্তু রাজকুমার ও রাজকুমারীদের সাহিত্যকর্ম যে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত নয়, তা অনঙ্গ মোহিনী দেবী, মৃণালিনী দেবী, নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা প্রমুখ কবিদের সাহিত্যকর্ম অনুধাবন করলে স্পষ্ট বোঝা যায়। কবি কৃষ্ণজিৎ দেববর্মণও এই প্রভাব থেকে বিমুক্ত নন। বিশেষ করে তাঁর আধুনিক বাংলা গানে রবীন্দ্রভাবাদর্শ ক্রিয়াশীল। রবীন্দ্রনাথের মতো মর্ত্যপ্রীতি কবির সঙ্গীতেও বিশেষভাবে ধরা পড়েছে।

বিশ্বরূপের অরূপ-গীতি আমার তরে নয়,
এই ধরণীর ধূলির কথা আমার গানে রয়।
মাটীর এই খেলা ঘরে,
যে মধু কান্না-হাসি ঝরে
সে গান গেয়ে দিন যেন মোর হয়গো অবসান।

অন্যত্র —

সে রূপের স্তব জাগে আজি
প্রভাত পাখীর গানে গানে,
ভুবন ভরিয়া আজিকে যে হেরি
বিশ্ব-মগন রূপের ধ্যানে।

এখানে একটি ভাবাদর্শ থেকে অন্য একটি বিশেষ ভাবাদর্শে উত্তরিত হওয়ার চেষ্টা রয়েছে।

এই সঙ্গীর্ত গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবের কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া গ্রন্থটির বিষয়-বৈচিত্র্যকেও উপেক্ষা করা যায় না। সঙ্গীতগুলিতে ভাবের উত্তুঙ্গতাও গভীরতা বিশেষভাবে লক্ষনীয। রবীন্দ্রপ্রভাব থাকা সত্ত্বেও কবির নিজস্ব স্বকীযতা সঙ্গীতগুলিকে এক বিশেষ মূল্যবোধে উন্নীত করেছে।

— ঃ —

"রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা"



ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবগত ও হৃদয়গত এক নিবিড় আত্মীয়তা ছিল, তা আজ কারও অবিদিত নয়। ইতিপূর্বে মহারাজা বীরচন্দ্রের পিতা মহাবাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কোন এক রাজনৈতিক সমস্যাব সম্মুখীন হয়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যপ্রার্থী হন। সেইসময় কলিকাতার সুধী সমাজে ও সবকাবী মহলে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুবেব ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা। তাঁর আন্তরিকতা ও সহাযতায অতি সহজেই উপরিউক্ত সমস্যার সমাধান হয। এই সূত্রে ধরেই পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুব পরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরাব বাজ পরিবারের প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয়।

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে মহারাজা বীরচন্দ্র ত্রিপুরায় বাজত্ব কবেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতি সম্পন্ন। ফলে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁর বহুমূখী অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রিয়তমা রাজমহিষী ভানুমতীদেবীর অকাল মৃত্যুতে মহারাজা বীরচন্দ্র অতিমাত্রায় শোকাকুল হয়ে পড়েন। তিনি নিজে ছিলেন সুকবি, ফলে বিরহী মনের বেদনাকে তিনি কবিতার মধ্যে ধরে রাখতে সচেষ্ট হলেন।

তাঁর রচিত 'প্রেম-মরীচিকা' কাব্যে এই শোকোচ্ছ্বাস পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত। সেই সময় কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে এসে তাঁর রচিত 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ঘটনাক্রমে মহারাজা বীরচন্দ্র এই 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটি পড়ে বিমোহিত হন। ভগ্নহৃদয়ের কবিতাগুলি তাঁর মনের বেদনার শান্তির প্রলেপ সঞ্চার করে। তাছাড়া 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই কবিকে অভিনন্দিত করে তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী রাধারমন ঘোষকে পাঠিয়েছিলেন কবির কাছে। জীবনের প্রারম্ভে এই অপ্রত্যাশিত অভিনন্দন তরুন কবিকে করেছে উৎসাহিত ও অনুপ্রানিত। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সহৃদয়তার সঙ্গে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

> "মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্য সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষন-করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্য তিনি অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।" —পৃষ্ঠা-৯৯

পরবর্তীকালে ত্রিপুরায় কিশোর সাহিত্য সমাজের সংবর্ধনা সভায়াও রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞ চিত্তে বলেছিলেন—

> "সেই সময়ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীয়-স্বজন নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন, এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসংকোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। আপনারা হয়তো অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন— তিনি রাধারমন ঘোষ। মহারাজা তাঁকে সুদূর ত্রিপুরা হতে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানতে যে, আমাকে তিনি

কবিরূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রহিল না।"

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'— পৃষ্ঠা—৩৬১
'রবি', ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিং।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ ও মহারাজা বীরচন্দ্রের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর রবীন্দ্রনাথ মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখতে আগ্রহী হন। এই প্রচেষ্টায় মহারাজা বীরচন্দ্রের সহায়তা সর্বতোভাবে পাবেন ভরসায় তিনি পূর্ব পরিচয় সূত্র ধরে ১২৯৩ সালের ২৩শে বৈশাখ মহারাজাকে একটি চিঠি লেখেন—

"মহারাজা বোধকবি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া "রাজর্ষি" নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জ্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্বসময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিব।"

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' —পৃষ্ঠা—৩৯৫
'রবি' ২য় বর্ষ, সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিং।

মহারাজ বীরচন্দ্র সস্নেহে ও আনন্দ সহকারে কবিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার রাজকাহিনী নিয়ে 'মুকুট' ও 'রাজর্ষি' গ্রন্থ দুইটি প্রকাশিত হয়। মহারাজা বীরচন্দ্র উক্ত দুইটি গ্রন্থ যে ঐতিহাসিক তথ্যের বিচ্যুতি ঘটেছে এবং তা যে সংশোধন সাধ্য তার উল্লেখ করে কবিকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬ ত্রিং সনে একটি



চিঠি লেখেন। সেইসঙ্গে ত্রিপুরাকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তোলার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন।

> "আপনি যে ত্রিপুর ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিতেছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যে যে স্থলে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন হয়— আমি আদরের সহিত পূর্ব্বোক্ত নানা মূল হইতে তাহা সংকলন করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আপনার অপরাপর বিষয়ে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাসের যথাযথ ব্যাখ্যা থাকে, ইহা আমারও একান্ত বাসনা। ঐতিহাসিক কোন বিশেষ ভাগের সম্বন্ধে সংকীর্ণ সময় মধ্যে গিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে কেবল "রাজরত্নাকর" হইতে যে সহায়তা পাওয়া যায় তাহাই দিতে পারিব।"
>
> "রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা"— পৃষ্ঠা—৩৯৭)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি মহারাজা বীরচন্দ্রের ছিল সুগভীর স্নেহ। এই স্নেহের জোরেই তিনি মহারাজার নিকটতম সান্নিধ্যে এসেছিলেন। হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারেব জন্য মহারাজা কার্সিয়াং যাওয়ার প্রাক্কালে তরুন কবিকে আমন্ত্রণ করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে গভীর বাত পর্যন্ত সঙ্গীত ও কাব্যচর্চা চলতো। পরম তৃপ্তিভরে তরুন কবির গান শুনতেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় তিনি আমার লেখা শুনতেন আর গান গাইতে বলতেন। তাঁর স্নেহ, আদর আমার প্রানে স্থায়ী রেখা টেনে গেছে"। মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান-গাওয়া যে কতদূর সংকোচের ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কেবলমাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয় আমাকে সাহস দিয়েছিল।"
>
> "রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা"— পৃষ্ঠা—৩৬১
> 'রবি', ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিং।

দেশের অধিকাংশ লোক যখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করতো, তখন মহারাজা বীরচন্দ্রই তাঁকে ভরসা দিয়ে উজ্জীবিত করেছিলেন যার ফলে তরুণ কবির কাব্যজীবনে আসে একটি প্রত্যয়ের সুর। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর কর্তৃক "ভারত ভাস্কর" উপাধি দানের পর কবি ১৩৪৬ সনের ৩০শে বৈশাখের একটি চিঠিতে বলেন—

> "ত্রিপুরার রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলাম তা বিশেষ করে স্মরণ করবার ও তাকে স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এরকম প্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্লভ। .... আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমান কম, এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রুপ করত। বীরচন্দ্র তা জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখবোধ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলংকৃত কবিতার সংস্করণ ছাপাপো হবে।"

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' — ৩৫২ পৃষ্টার পর ছাপানো চিঠি।

যে উৎসাহ ও প্রেরনা কবি মহারাজা বীরচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তা ত্রিপুরার পরবর্তী মহারাজাদের কাছ থেকে সমভাবেই লাভ করেছিলেন। মহারাজা বীরচন্দ্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা তিনি সারা জীবন অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করেছেন।

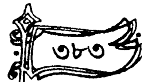
রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

মহারাজা বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর ত্রিপুরার রাজা হলেন রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। পিতা মহারাজের জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সামান্য পরিচয় ছিল। রাজ্যভার গ্রহণের পর ব্যক্তিগত প্রেরণায়, বিশেষ করে রাজকার্যের প্রয়োজনে তিনি কবির সঙ্গে সখ্য ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে আগ্রহী হলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে এবং মহারাজার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে মহারাজার নিকটতম সান্নিধ্যে এলেন। ফলে উভয়ের যোগাযোগ খুব দৃঢ় হলো। নিবিড় বন্ধুত্বের ভিত্তিতেই রবীন্দ্রনাথ কোনো এক বসন্তোৎসবে রাধাকিশোরের আমন্ত্রণে প্রথম ত্রিপুরায় এলেন। এই বসন্তোৎসব আজও ত্রিপুরার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে।

আবার পরবর্তী সময়ে মহারাজা রাধাকিশোর কোলকাতায় গেলে রবীন্দ্রনাথ ও কোলকাতার অভিজাত শ্রেনী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্ক স্ট্রীটস্থ বাসভবনে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানান। এই উপলক্ষে কবি মহারাজার অভ্যর্থনার জন্য একটি প্রশস্তি সঙ্গীত রচনা করেন। অনুষ্ঠানে এই সঙ্গীতটি পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতটি হলো—

রাজ-অধিরাজ তব ভালে জয়মালা,
ত্রিপুরলক্ষ্মী বহে তব বরনডালা,
গুনী রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে,
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে,
তরুন তব মুখচন্দ্র করুণ রস ঢালা,
দীন্ জন-ভবতারন অভয় তব বানী,
দীনজন দুখহরণ নিপুন তব পাণী,
গুন অরুন কিরণ তব সব ভুবন আলা।

এই অনুষ্ঠানে উপলক্ষে কবির 'বিসর্জন' নাটকটি অভিনীত হয় এবং কবি স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ন হন।



রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসেছিলেন বলেই তাঁর সৃষ্ট শান্তিনিকেতনের প্রতিও মহারাজা রাধাকিশোরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আন্তরিকভাবে এই আশ্রমের সমৃদ্ধি কামনা করতেন বলেই তিনি এরজন্য বিভিন্নভাবে অর্থসাহায্য করেছেন। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা থেকে প্রচুর ছাত্র প্রেরণ করে তিনি এর প্রসারলাভ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে বলেছেন—

"আমাদের দেশের লোকের মধ্যে একমাত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে আমি নিয়মিত অর্থানুকূল্য পেয়েছি। তিনি স্বয়ং আমাদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহন করে আমাদের আনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন। সে সময় আমার এই প্রতিষ্ঠান দৈন্য পীড়িত ও অপরিজ্ঞাত ছিল। অথচ তখনই রাধাকিশোর কেবল যে বার্ষিক অর্থদানের দ্বারা এই শুভকর্ম্মের সাহায্য করেছিলেন তা নয়, ত্রিপুরার অনেক বালককে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন।"

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'—পৃষ্ঠা—১৮৩
'রবি', রবীন্দ্র সম্মেলন সংখ্যা।

অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাহিনী' গ্রন্থটি মহারাজা রাধাকিশোরকে উৎসর্গ করলে তিনি বিশেষ খুশী হয়ে ১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৬ সনের একটি চিঠিতে বলেন—

"কাহিনী গ্রন্থের সহিত আমার নাম সংশ্রব রাখিতে আপনি ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহাতে আমার অমত হইতে পারে কি? ছাপা হইবামাত্র ১০-১২ কপি পাঠাইয়া সুখী করিবেন। এখানকার বন্ধু-বান্ধবদিগকে বিতরণ করিব।"
('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'— পৃষ্ঠা-১৬৮)

মহারাজা রাধাকিশোর আবার রবীন্দ্রনাথকে লেখা ২১শে চৈত্র, ১৩০৯-এর একটি চিঠিতে এই গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুদৃঢ় সমালোচনাও করেছেন—

"বন্ধুত্বের খাতিরেই যে একটা অযথা প্রশংসা করিতে হইবে ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক কবিতার গাম্ভীর্য্য রক্ষা বিষয়ে আপনি সিদ্ধহস্ত।



অথবা ইহা আপনার স্বাভাবিক শক্তির নৈপুন্য। এই গাম্ভীর্য্যের সহিত মধুর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইয়াছি। নায়ক-নায়িকার পদোচিত ভাব ও ভাষা অতি পরিপাটি হইয়াছে। পৌরানিক প্রভাব প্রসঙ্গাদি অবলম্বন করিয়া আধুনিক সময়ে যে কয়খানি কাব্যাদি রচিত হইয়াছে সেগুলিতে প্রায় উক্ত পদোচিত সম্মান ও গাম্ভীর্য্য রক্ষার্থে ভাষা ও ভাবের বিশেষ নৈপুন্য দেখিতে পাই না। আপনার গ্রন্থসকল সে দোষ বর্জ্জিত। আমার বিশ্বাস ঐ সকল যথাযথ রক্ষিত হইলেই গ্রন্থের জীবন্যাস করা হইল।"

('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'—পৃষ্ঠা—৪২৯)

রবীন্দ্রনাথও সমভাবেই ত্রিপুরাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে দেখে উপকৃত করেছেন নানাভাবে। রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ও ইচ্ছায় কুচবিহারের রাজপরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সখ্যতা স্থাপিত হয়। রাজকার্যে ও মহারাজা রাধাকিশোর ব্যক্তিগত জীবনে তিনিই যে ছিলেন একমাত্র পরামর্শদাতা, তার প্রমান মেলে উভয়ের বিভিন্ন চিঠিপত্রে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি চিঠির উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া গেল—

ক) (সম্ভবতঃ ১৩১১ সনের শেষভাগে লিখিত)

"যদি ঋন গ্রহণের জন্য মহারাজাকে গবর্মেন্টের সর্ত্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেই হয় তবে জমিদারী শাসনের জন্য গবর্মেন্টের লোককে অগত্যা গ্রহনকরিয়া মহারাজার নিজের নির্ব্বাচিত একজন সুদক্ষ লোককে মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন— দুইয়েতে মিশাইবেন না।

ইহা অনুভব করিতেছি একটা জাল বয়ন হইতেছে— লেশমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া মহারাজ মনস্থির করুন — দ্বিধামাত্র করিবেন না—এই জাল ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করুন। যতই বিলম্ব হইবে ততই দুর্বল হইয়া পড়িবেন।"

('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'— পৃষ্ঠা—৪১৩)



খ) (১৩১২ সনে সম্ভবতঃ ১৭ই আষাঢ়ের পর লিখিত)

"কলিকাতায় মহারাজের আসা উচিত কিনা পরামর্শ করিয়া পত্র লিখিব অথবা আবশ্যক হইলে টেলিগ্রাফ করিব।—যাহারা মহারাজের সঙ্গে আসিবে তাহাদিগকে ভয় করি— তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কিভাবে কিকথা কহিবে জানিনা।

ঋণ সংগ্রহ যদি অনিবার্য্য হয় এবং গবর্মেন্টের সর্ত্ত যদি গ্রহণ করিতে হয় তবে এই কাজের ভার ইহাদের দিবেন না। দশ লাখ টাকার যে কমিশন প্রাপ্য তাহা মহারাজর নিজের তহবিলেই আসা উচিত। অগ্রে ভাল লোক নিযুক্ত করিয়া পরে এই কাজে হাত দিবেন।"

(রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'—পৃষ্ঠা—৪১৪)

গ) (৯ই শ্রাবন, ১৩১২ সনে লিখিত)

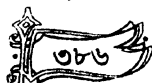
"ঋন সংগ্রহের কাজটা রমনীকে নিয়োগের পূর্ব্বে স্থগিত রাখিলেই ভাল হয়। এখন এ কাজে হাত দিতে গেলে লুব্ধ লোকদের দ্বারা মহারাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

মহারাজাকে আমি পুনশ্চ জানাইতেছি রমনীকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে তাঁহার বিশ্বস্ততা, দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও সহৃদয়তা গুণে মহারাজা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট এবং সর্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। ছদ্মবেশী শত্রুদলের সংকটজাল হইতে মহারাজাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দান করিতে পারিলে আমিও চরিতার্থ হইব।"

(রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'—পৃষ্ঠা—৪১৭)

ক) (১১ই চৈত্র, ১৩০৯ ত্রিং-এ লিখিত)

"মহিম আপনার নাম করিয়া ছুটি পাইবার ফিকিরে আছে। তাহার সম্বন্ধে আপনার হুকুম কি? আমারও ইচ্ছা একবার তাহাকে আপনার সদনে পাঠাই। পড়ে উৎপাত না জন্মায়।" ('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'—পৃষ্ঠা— ৪২৮)



খ) ''ছেলের শিক্ষা বিষয়ে আপনার ও কুচবিহার মহারাজের মতই গ্রহণ করিয়াছে। .... র সহিত রাজকীয় বিষয়ে আলাপের ফল ভালই হইয়াছে। বর্ত্তমান বড় অমায়িক এবং রাজজনোচিত বহুদর্শী বটে। আজও আমাদের অনুকূলেই আলাপ ও তৎফল ভাল হইবে এরূপ ভরসা করি।''

('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'—পৃষ্ঠা—৪৩৩)

গ) (১৪ই বৈশাখ, ১৩১০ ত্রিং—এ লিখিত)

''যতীন্দ্রবাবুকে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আলাপে সুখী হইয়াছি। আপনি যখন স্বয়ং বাছনি করিয়া শ্রীমান ও শ্রীমতীর জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন তখন আমার আর কি বলিবার আছে। যতী ও তাহার স্ত্রীতে মিলিয়া একই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থাকিলে আশানুরূপ ফল প্রত্যাশা করা যায়।''

('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'— পৃষ্ঠা—৪৩০)

ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনায় রবীন্দ্রনাথ যে কি গভীরভাবে ব্যাপৃত ছিলেন, তা ৬ই চৈত্র কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত কবির একটি পত্রে তার প্রমান মেলে।

''ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গলসাধনের জন্য আমি বারম্বার তোমার দিকে তাকাই। এই রাজ্যের সঙ্গে যেন আমার ধর্মের সম্বন্ধ বাঁধিয়া গেছে— আমি যতই ইচ্ছা করি ইহার সম্বন্ধে আমি মনকে উদাসীন করিতে পারি না.............. বিধাতা কেন আমাকে এখানে টানিয়াছেন জানিনা—মহারাজের সঙ্গে তিনি আমার একটি মঙ্গল সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন।''

('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'-পৃষ্ঠা-১৯৩-'বিশ্বভারতী পত্রিকা, আশ্বিন—১৩৪৯ বাং)

ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল অবিচ্ছেদ্য। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানসিকতার চরম মিল থাকার জন্যই এই যোগাযোগ মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর ও বীরবিক্রম কিশোরের রাজত্বকাল পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় অব্যহত ছিল।

—ঃ—

'রিয়া'

(ত্রিপুর মহিলাদের বক্ষবন্ধনী)

শ্রী মহিমচন্দ্র ঠাকুর

স্বাধীন ত্রিপুরা।

আগরতলা—শিল্প প্রদর্শনীর জন্য প্রকাশিত।'

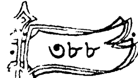
১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ।

"রিয়া"

(ত্রিপুর মহিলাদের বক্ষবন্ধনী)

শৈশবকালে আমরা ধাইমার নিকট ত্রিপুর নরপতিগণের প্রসঙ্গে অনেক রূপকথা শুনিতাম। একটি গল্প শুনিয়াছি, সুবরাই রাজা বলিয়া একজন রাজা ছিলেন, তিনি ত্রিপুরা জাতির শিল্প সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিয়াছেন এবং কার্পাস বুনিবার প্রথা এ রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম আনিয়াছিলেন বলিয়া এখনও ধারণা আছে। এই সুবরাই রাজা কে? যিনি ত্রিপুর লোকের মুখে মুখে অদ্যও বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার বিষয় জানিবার জন্য শিশুকালে উৎসুক না হইলেও বর্ত্তমান পরিনত বয়সে স্বতঃই মনে উৎসুক জন্মে। এজন্য আমি ত্রিপুরাদিগের মধ্যে ঠাকুর পরিবারে এবং রাজপরিবারে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। যুবক এবং বৃদ্ধের নিকট অনেক অনুসন্ধান লইয়াছি। সকলেই নাম শুনিয়াছি এই মাত্র উত্তর দেন। কিন্তু তিনি কি দেব না দানব তাহা বলিতে পারেন না। সুবরাই রাজার সম্বন্ধে অনেক অমানুষিক গল্প শোনা যায়। সম্প্রতি আমি ত্রিপুরার আদি এবং একমাত্র ইতিহাস "রাজমালা" গ্রন্থখানা পাঠ করিতেছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার সেই সুবরাই রাজা ধরা দিলেন। তিনি অন্য কেহ নয়, ত্রিপুরার আদি মহারাজ "ত্রিলোচন"। তাঁহার বিষয় "রাজমালা"য় লিখিত আছে--

তিনচক্ষু হইবেক পুরুষ প্রধান।
আমার তনয় আমা হেন কর জ্ঞান।।
সুবরাই রাজা বলি স্বদেশে বলিব।
বেদমার্গী সাধু সনে ত্রিলোচন কহিব।।



কথায় বলে—"যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে"। ত্রিপুরার বিষয় বলিতে গেলেও বলিতে হয়— 'যা নাই রাজমালায়, তা নাই ত্রিপুরায়'। এযে Mythological যুগের কথা। ত্রিলোচন রাজার কথা, ইহা কি বিশ্বাস যাইতে পারে। কিন্তু এজন্যে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না— ত্রিপুরার রাজমালাও অশুদ্ধ হইবে না—একথা আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি। রাজমালা গ্রন্থখানাতে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অবস্থা—কাশীচন্দ্র মাণিক্য পর্যন্ত বিশদভাবে বিবৃত আছে। কোনও বিষয়ে যদি অনুসন্ধান লইতে হয়, তাহা হইলে এই রাজমালাই একমাত্র বিশ্বস্ত উপায়। ত্রিপুরার লোকে যে গর্ব্ব করিয়া থাকে, নূতন শিল্প শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই কারণ, যে শিল্প সুবরাই রাজা শিক্ষা দেন নাই, সে শিল্প শিল্পই নয়। এই গর্ব্ব mythological কালের গর্ব্ব হইলেও অদ্য পর্যন্তও প্রচলিত আছে। ধন্য' ত্রিপুরার রাজা, ধন্য ত্রিপুরজাতি।

ত্রিপুর জাতির মধ্যে এখনও "রিয়া" প্রস্তুতের নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত প্রাচীন নক্‌সা তাঁহারই (সুবরাই রাজা) নামে পরিচিত। প্রত্যেক ত্রিপুর পরিবারে এই নক্‌সা বংশপরম্পরায় প্রচলিত থাকে। এমন কি শাশুড়ী বধূকে এই নক্‌সার রিয়া বিবাহ সময়ে উপহার-স্বরূপ দেওয়ার প্রথা অদ্য পর্যন্ত প্রচলিত আছে। শাশুড়ীর মৃত্যু হইলে মৃত শাশুড়ীর রিয়া আসনে রাখিয়া শ্রাদ্ধ অন্ন উৎসর্গ করার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও প্রসঙ্গভুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। আমার যখন দশ বৎসর বয়স তখন আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন চৈতন্য নায়েক। তিনি আমাদের শ্রুতলিপি লইতে বড় কড়াকড়ি করিতেন। হস্তলিপি হইতে যাইয়া তিনি বরাবর আমাদের উপর হুকুম দিতেন যে, আমরা যেন ত্রিপুর জাতীয় Folk lore (গল্পকথা) লিখিয়া আনি। তারপর শ্যামাচরণ ডাক্তার মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, তিনি এ রাজ্য হইতে চলিয়া গিয়া খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। তারপর 'কাকস্য পরিবেদনা' কাহার খবর কে লয়। ১৮৮৫ সনে আমি যখন কোলকাতায় পাঠদ্দশায় থাকি তখন একদিন College square-এ একজন খ্রীষ্টধর্মের বহি বিক্রেতার নিকট Aboriginal Mission Tract Book Society হইতে প্রকাশিত 'Fine art in Tippera' নামে একখানা

পুস্তক দেখিতে পাই। মূল্য এক পয়সা। এই এক পয়সা খরচ করিয়া আমি Tippera art সম্বন্ধে ষোল আনা হউক বিশেষ সংবাদ পাইলাম। ঐ পুস্তক প্রনেতা সুবরাই রাজার গল্প লিখিতে যাইয়া ত্রিপুরাদিগের নিকট প্রচার করিতেছেন— তোমার সুবরাই রাজার নিকট হইতে শিল্প পাইয়াছিলে কিন্তু তোমাদের জন্য যিশুখ্রীষ্টনামক একব্যক্তি তোমাদের পাপের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তোমরা ইহা বিশ্বাস কর। ইহা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কথা বটে। পুস্তকখানা তেমন যত্নে রাখি নাই— কাজেই হারাইয়া গিয়াছে। লেখকের নাম দেখিলাম আমাদের সেই পুরাতন মাস্টার চৈত্যন্যনাথ নায়েক। তাহাতে স্পস্ট বুঝিলাম তিনি খ্রীস্টান হইবার পূর্বে এই গল্প আমাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গল্পটা সংক্ষেপে বলিতেছি— সুবরাই রাজা প্রচার করেন যে, ত্রিপুরার সুন্দরীগণ মধ্যে যে শিল্পকলার নমুনা উৎকৃষ্ট দেখাইবে, তাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন। এই উৎসাহ বাক্যের দরুণ নিত্য শিল্প উদ্ভাবিত হইতে লাগিল এবং ত্রিপুর সুন্দরীগণ রাণী হইতে লাগিলেন। ইহাদের সংখ্যা ২৪০ জন ছিল। ইতিমধ্যে একটি যুবতী এমন সুন্দর রিয়া আনিয়া রাজার সম্মুখে ধরিল যে, ইহা দেখিয়া রাজা অবাক হইয়াছিলেন। "মাছি পাখ্না" নক্সা এই সর্ব্বপ্রথম সকলে দেখিতে পাইলেন। সূর্য রশ্মিতে মাছি পাখ্নায় যে রঙ দেখা যায়, তাহাই অনুকরন করা হইয়াছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন— "তুমি কি প্রকারে ইহা অনুকরণ করিতে পারিলে?" মাছিত দীর্ঘকাল একস্থানে থাকে না। যুবতী উত্তর করিল, আমার বাড়ীতে একটি স্থানে মাছি বরাবর বসিতেছে। অদ্য তিন চার দিন তাহা দেখিয়া মহারাজের প্রীত্যর্থে তাহাই অনুকরণ করিয়াছি। মহারাজা সেই মাছি বসার কারণ অনুসন্ধান করিতে সেই যুবতীর বাড়ি গেলেন। তথায় যাইয়া দেখেন একটি স্থানে মাছি বরাবর বসিয়াছে। তাড়াইলেও উড়িয়া পুনরায় বসে। মহারাজা সেই মাছি বসার কারণ অনুসন্ধান করিতে মাটি খুঁড়িয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, মহারাজার আদরের একটি সর্প ছিল, যাহা বরাবর মহারাজার সঙ্গে থাকিত। সেই সর্প যুবতীর পিতা মারিয়া এই স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। মহারাজা অত্যন্ত মনস্তাপের সহিত বলিলেন— তোমরা দেখ এই সর্প স্বর্গের গন্ধর্ব। কোন কারণে শাপগ্রস্ত হইয়া সর্পরূপে আমার নিকট আশ্রয় লইয়াছে। সর্পের সঙ্গে কথা ছিল যে, আমাকে প্রতিদিন এক একটি শিল্পের আদর্শ শিখাইবে এবং আমার

রাজ্যের লোকেরা তাহা শিক্ষা করিবে। তার পর ৩৬০টি শিল্পাদর্শ আমার প্রজাগণ এক বৎসরের মধ্যে শিক্ষা করিবে। এবং আমি ৩৬০টি বিবাহ করিব। আমি মাত্র ২৪০টি শিল্পাদর্শ পাইয়াছি এবং ২৪০জন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছি। হায় এই সর্প এখন স্বর্গে গিয়াছে। শিল্পের আদর্শ আমি আর পাইব না। এক্ষণে আমার রাজত্ব করা বৃথা। আমি চলিলাম। তোমাদের অদৃষ্ট নিয়া তোমরা থাক। এই কথা বলিয়া মহারাজা অন্তর্ধান হইলেন। যে স্থানে স্বর্পকে প্রোথিত করা হইয়াছে, সেই স্থানে খুমপুই (Lily of the valley) নামক ফুলের গাছ জন্মিয়া ও পুষ্পবন্ত হইয়া সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল। এখনও প্রবাদ যে, ত্রিপুরীদের মধ্যে আর কোন উন্নতি হইবে না। কারণ ত্রিপুরার শিল্পাদর্শ সুবরাই রাজার সময়েই পূর্ণ হইয়াছে।

ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায় রানীগণ কর্তৃক শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যাহা লিখিত আছে , তা নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে।

আচোঙ্গ নৃপতি স্বর্গী হইল যখন,
তার পুত্র খিচোঙ্গ রাজা হইল তখন।
খিচোঙ্গমা নামে ছিল তাহার রমনী,
বিচিত্র বসন শিক্ষা নির্ম্মায়ে আপনি।
(রাজমালা)

ত্রিপুর বংশীদের মধ্যে মহিলাগণ নিজেদের রিয়া নিজেরাই বুনিতেন এবং তাহা নিজেরাই ব্যবহার করিতেন। সধবা স্ত্রীলোকগণ নিজেদের ব্যবহার্য্য রিয়া নিজেরাই বুনিতেন, ইহাই নিয়ম ছিল।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের জন্ম তিথি উপলক্ষে বরাবরই ত্রিপুরায় শিল্প প্রদর্শণী হইত। বড়ঠাকুর শ্রী শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মন বাহাদুর এই মেলার জন্য মনে প্রানে খাটিতেন এবং উৎসাহের জন্য পুরস্কার দিতেন। রাজ পরিবার ও ঠাকুর পরিবারের মহিলা দিগকে বীরচন্দ্র মাণিক্য পুরস্কৃত করিতেন। এইসব পুরস্কার আজ পর্যন্তও অনেক মহিলা তাঁহাদের লক্ষ্মীপূজার পেটেরার



মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। এই পুরস্কারকে মান্য আমাদের পুরমহিলাগণ যেমন করেন, তেমন অন্যে করিতে পারে না।

আমি দেখিয়াছি, স্বর্গীয় ডাক্তার শম্ভু চন্দ্র মুখার্জী, যিনি এ রাজ্যের Minister Associate ছিলেন, ,(বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে দীনবন্ধু নাজির প্রধান মন্ত্রীর অধীনে) এই রিয়া তিনি পাগড়ীরূপে ব্যবহার করিতেন। কোন ঈশ্বরী তাঁহাকে ইহা শিরোপা দিয়াছিলেন কিনা, আমি জ্ঞাত নাহি। কিন্তু শম্ভু চন্দ্র মুখার্জী মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া যাওয়ার পর কলিকাতায় পাঠদ্দশায় যখন আমি Government House - এ যাইতাম, তখন শম্ভু মুখার্জিকে সেই রিয়ার পাগড়ী ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। একদিন সান্ধ্য সম্মেলনীতে (Evening party) শম্ভু বাবুকে ধরিয়া Lady Dufferin তাঁহার সেই পাগড়ী দেখিয়া প্রশংসা করিয়া কোথায় ইহা পাওয়া যায়, জানিতে চাহিয়া-ছিলেন। তখন ডাঃ মুখার্জী ত্রিপুরার নাম উল্লেখ করেন। Lady Dufferin বলিয়াছিলেন, তিনি বড়ঠাকুরকে (সমরেন্দ্র চন্দ্র) চিনেন, তাঁহাকে লিখিয়া একখানা আনাইয়া লইবেন। আমি জানিনা বড়ঠাকুর বাহাদুর তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া ছিলেন কিনা।

তাহার পর মিঃ ম্যাক্‌মিন বিলাত হইতে একখানা অতি পুরাতন ত্রিপুরার বিবরণযুক্ত কাগজ পান। সেই কাগজ খানা Mr. Ralph Leake (British Resident of Tripura) -এর রিপোর্ট। তৎসঙ্গে The then resigning মহারাণী জাহ্নবী দেবীর বিবরণ এবং তাঁহার সহিত ceremonial বিদায় সম্বন্ধে রিপোর্ট ছিল। সেই চিঠিখানায় (1783 A.D., 11th March) তিনি মহারাণী প্রদত্ত 'শিরোপা' সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া 'রিয়ার' নাম করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই 'রিয়া' রাজরাণীগণ যাহাদিগকে সম্মান করিতে হয় তাহাদিগকে শিরোপা দিয়া থাকেন। ইহার অর্থ যে যাহাদিগকে রাণীগণ সম্মান করেন, তাহাদিগকে অন্তযুক্ত করিয়া সম্মান করেন। Leake সাহেব এ কথার sentiment বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন এই রিয়াখানার যথার্থ art কি; Benaras - এ যে কিংখাপ প্রস্তুত হয় তাহার তুলানায় এই রিয়া প্রস্তুতের প্রথা অধিক উন্নতিমূলক এবং ইহার নক্‌সা যথার্থ শিল্পের আদর্শ। তিনি সেইজন্য রিয়াখানা British Mu-

seum -এ Art collection বিভাগে দিয়াছিলেন। মিঃ ম্যাক্‌মিন দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, এই art শীঘ্রই lost art হইয়া যাইবে।

তারপর স্বর্গীয় মহারাজার আমলে স্বর্গীয়া মহারাণী তুলসীবতী মহাদেবী ঈশ্বরী মহোদয়া আমার রাজসেবায় সন্তুষ্ট হইয়া আমার পোষাকে ব্যবহারের জন্য রিয়ার শিল্পাদর্শে একটি পাগড়ী প্রস্তুত করিয়া দেন। Lord Curzon Victory থাকার সময় আমি যখন ADC রূপে মহারাজার সমভিব্যাহারে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তখন Lord Curzon আমার পাগড়ী দেখিয়া কাছে ডাকাইয়া নিয়া নিজ হস্তে বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা কোন্ দেশের প্রস্তুত। তখন বর্তমান শ্রীশ্রীমহারাজা বাহাদুর যুবরাজরূপে এবং কুমার শ্রীল শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারাও দেখিয়াছিলেন Lord Curzon এই রিয়া art এর কেমন প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আমার পুত্র শ্রীমান সৌমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা যখন বিদ্যাশিক্ষার্থে আমেরিকা দেশে শ্রীশ্রীযুত মহারাজার আদেশে গমন করেন, তখন শ্রীল শ্রীমতী রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী তাহাকে একখানা রিয়া উপহার দেন। এই রিয়াখানা মাননীয়া কুমারীর নিজ হাতের প্রস্তুত এবং রিয়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট। শ্রীমান বিলাতে এবং আমেরিকায় যে কোন সমাজে মিশিয়াছে সে দেশীয় পোষাকে কোমরবন্ধরূপে ইহা ব্যবহার করিত। মেয়ে মহলে এই রিয়া দেখিয়া একটা হৈ চৈ পড়িত। পুরুষমহলে ইহা লইয়া একে অন্যকে দেখাইবার জন্য টানাটানি করিত। তাকে লইয়া exhibition করা তথাকার পরিচিত মহলের একটা বাতিক হইয়া গিয়াছিল। পাঠদ্দশায় এইরূপ ব্যবহার দেশের art এর জন্য নিতান্ত সুখকর বটে, তবে অনেকসময় কষ্টকর হইত। ইহা দেখিয়া তাহার গুরুদেব অর্থাৎ শিক্ষাগুরু শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজেই জিনিষটা কাড়িয়া লইলেন। বলিলেন, ইহা এক কবির প্রস্তুতি, অন্য কবির ব্যবহার্য। তোর গুরুদক্ষিণারূপে ইহা আমি লইলাম। এ কথার উপর আর কি কথা হইতে পারে। উত্তমে মধুরে মিলিল। এমন একটি শিল্প দ্রব্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারে আসিয়া পৃথিবীময় ঘুরিয়া আসিল। তিনি যেখানেই গিয়াছেন, কি বিলাতে, কি আমেরিকায়, কি জাপানে, এই রিয়ার সর্বত্রই মান্য হইয়াছে। ত্রিপুরার রিয়া পৃথিবীময় ঘুরিয়াছে, ইহা কি কম আদরের কথা।



পুরাতন আদর্শে এ রিয়া প্রস্তুত করার জন্য আমি জনৈক মহিলাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার নিকট হাতীর দাঁতের "রেছাম্বী" নাই, কাজেই তিনি সরস ধরণের রিয়া প্রস্তুত করিতে অক্ষম। আমি মনে করিতাম যে, হাতীর দাঁতের 'রেছাম্বী' (তাঁতের হানা) কেবল মাতা ঈশ্বরীগণের সখের সরঞ্জাম মাত্র ছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, এই হাতীর দাঁতের 'রেছাম্বী' দিয়া বুনার কার্য্যে নিতান্ত প্রযোজনীয়। কারণ রেশমের উপর কার্য্য করিতে হইলে হাতীর দাঁতের 'রেছাম্বী' সহজেই সূতা টানার সাহায্য করে। যাহা বাঁশ বা কাঠের রেছাম্বীতে হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আমরা দেখিতে পাই, দৈবকার্য্যে শিল্প জিনিষ ব্যবহার করা প্রাচীন হিন্দুকুলের প্রথা। এমনকি এই প্রথা অনুকরণ করিতে যাইয়া হিন্দুকুলে নব প্রবেশী জাতিও এই প্রথা অনুকরণ করিতে একান্ত ব্যগ্র। দৈবকার্য্যে একটি প্রথা এই রাজপরিবারে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। নববর্ষের ত্রিপুরা পূজা 'পরাইয়া' অর্থাৎ গোরী নামক দেবতার অর্চ্চনা। এই অর্চ্চনা যদিও আজকাল তেমন সমারোহে সম্পন্ন হয় না, কিন্তু state ভাবে রাজসিংহাসনের সম্মুখে এখনও এই পূজা হইয়া থাকে। এই দেবতার পূজোপকরণ মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, রাজার দর্পণ ও রাণীর রিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ও এইসব জিনিষের পূজা পৃথকভাবে হইয়া থাকে। রাজার দর্পণ ও মাই দেবতার রিয়া পূজা হইবে না, তবে পূজা হইবে কোন্ দেবতার? মাতা ঈশ্বরীর বক্ষবন্ধনী দেবোপচারে পূজা হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? রাজবাড়ীতে সময় সময় বিশেষতঃ মহারাজার যাত্রার সময় এবং শুভবিবাহাদির কার্য্যে 'লামপ্রা' পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা "বিনাইগর" নামক হিন্দুদেবতার পূজা। বিনাইগর অর্থাৎ বিনায়ক গণেশ পূজা। এই পূজায় শ্রীশ্রীমতী ঈশ্বরীর রিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এখনও মামুলিরূপে রিয়া দেওয়ার প্রথা বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক প্রাচীন বিষয়ে যদি আমরা অনুসন্ধান লই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, এই tradition মধ্যে ঐতিহাসিক কান্ড বর্ত্তমান আছে। ত্রিপুরার প্রেমের কাহিনীতে রিয়ার রসিকতা আছে। ত্রিপুরা সুন্দরী রিয়া বুনিতেছে, ত্রিপুরা যুবক বলিতেছে — "হে প্রাণ, তোমার রিয়ার ফুলের বাহার আমার মাথার "চিরাই" মধ্যে বুনিয়া দাও না। এই



প্রাচীন রাজ্যে বিশেষতঃ ভারতের একমাত্র প্রাচীন বাজ্যে যেসব প্রথা দেখিতে পাই, তাহাতে আমরা প্রাচীনতার ইতিহাস পাইয়া থাকি। অতীব দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, যেসব প্রথা আমবা হারাইয়াছি এবং হারাইতেছি তাহার মধ্যে আমরা কত কত প্রাচীনতার চিহ্নই যে হারাইয়াছি ও হারাইতেছি তাহা কে বলিবে ? যাহারা এখনও এই প্রাচীন রাজ্যের ইতিহাস জানিতে চান এবং তাহাতে প্রতিষ্ঠা পাইতে চাহেন, তাহারা আমার এই সানুনয় নিবেদন মনে রাখিবেন।

এই রিয়া যাহাতে ত্রিপুরায় জীবিত থাকে, তাহার উপায় করা আজ সরকারের একান্ত কর্তব্য। আমাদের মহিলাগণ মধ্যে রিয়া এক্ষণে আর ব্যবহার হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং কিছুদিন পরে ইহা ব্যবহার হইবে না ইহাও নিশ্চয়। ত্রিপুরার মহিলাগণ যখন আপনা আপনির মধ্যে ছিলেন, তখন তাহাদের বেশভূষাও আপনার ধরণের ছিল। এক্ষণে বর্ত্তমান জগতের বেশভূষাক্রমে আসিতেছে ও আসিবে। এইসঙ্গে রিয়া তার ব্যবহার হইতে পারিবে না, অর্থাৎ বক্ষ বন্ধনীরূপে ইহা ত্রিপুর মহিলাকুলে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে কিনা, আমি সন্দেহ করি। এ বিষয় আমি অনুধাবণ করিযাছি। আমার বিবেচনায় রিয়া ধরণে যদি কিংখাপ বোনা যায়, তাহা হইলে এই ইউরোপীয় জিনিষের দুর্দ্দশা ও দুর্মূল্যের সময় এই কিংখাপ বাজারে বহুমূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। যাহাতে রাজসরকার এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, ইহার জন্য আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। কিছুতেই এই art কে রাজ সরকার lost art হইতে দিবেন না, ইহাই আমার একান্ত ভরসা।

— ঃ —

উপসংহার ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

পঞ্চদশ শতক থেকে পূর্বভারতের বিভিন্ন শক্তি ও সভ্যতার সঙ্গে ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ধীরে ধীরে উন্নত পর্যায়ে আসে। বিভিন্ন সময়ে তাম্রলিপিও বাংলাভাষায় লিখিত হয়। ঊনবিংশ শতকে ত্রিপুরায় সমস্ত রচনাই বাংলায় লেখা হয় এবং যাবতীয় রাজকার্য বাংলাভাষাতেই চলেছে। মুদ্রা, শিলালিপি, আদেশপত্র, এমনকি রেভিনিউ স্ট্যাম্প পর্যন্ত বাংলাতে ছাপা হয়েছে। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এবং নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের ফলে ত্রিপুরার সাহিত্য ও সংস্কৃতি আরও পুষ্টিলাভ করে।

রাজআমলে ত্রিপুর দরবারে বিভিন্ন সময়ে রাজপৃষ্ঠপোষকতায় ও রাজানুকূল্যে প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়। আবার ত্রিপুরাধিপতিগণের মধ্যে অনেকে নিজস্ব প্রেরণায় সাহিত্য রচনা করেন। নানাকারণে এতদিন এইসব রচিত সাহিত্যের যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানকালে এই দরবারী সাহিত্যের মূল্যবোধ নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে নানাদিক থেকে। দরবারী সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকা ও দরবারী সাহিত্যের চরিত্র থেকে শুরু করে এই সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ মূল্যবোধ স্থিরীকৃত করার সর্altবিধ চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হয়েছে।

পঞ্চদশ শতক থেকে ত্রিপুরার সঙ্গে বর্হিভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। এই সংযোগের ফলে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক জীবনে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ত্রিপুরার বন, অরণ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে নিয়ত আকৃষ্ট করেছে। তারফলে, ত্রিপুরায় বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের বিশেষ করে বাঙালীর সমাগম হয়েছে। যারা এখানে এসেছেন, তারা অচিরেই ত্রিপুরার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের এক করে নিয়েছেন। তাই সভ্যতা, সাহিত্যে, গল্পে-গাথায়, সঙ্গীতে ও নৃত্যে, সংস্কৃতির প্রতিটি দিকে যে সমন্বয়ের সূচনা হয়, আজ সেই পথ অতিবাহন করে ত্রিপুরার সংস্কৃতি একটি বিশিষ্ট রূপলাভ করতে সক্ষম হয়েছে।



ত্রিপুরার একটি নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা যে পূর্ব থেকে বহমান ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে বঙ্গ সংস্কৃতির সাহচর্যে এসে এই সংস্কৃতি বিশেষভাবে পরিপুষ্টিলাভ করে। ত্রিপুরার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এই কারণেই হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপত্যরীতির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ত্রিপুরার মঠ-মন্দির নির্মাণেও বাংলা মন্দির-স্থাপত্যের প্রভাব রয়েছে।

অবশ্য বস্ত্রবয়ন শিল্পে ত্রিপুরীদের নিষ্ঠা ও দক্ষতা তুলনাবিহীন। সুপ্রাচীনকাল থেকে এই বয়ন শিল্পের মাধ্যমে পাছুড়ি, দুবেড়া, পরী (আসন) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কারুকার্যসম্পন্ন বস্ত্রনির্মাণ, ত্রিপুরী সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট পরিচায়ক। তাছাড়া, এদের তৈরী 'রিয়া', 'কাঁচুলী'র সৌন্দর্য একসময় বাংলাদেশের বাইরেও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই সম্পর্কে মন্তব্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ —

> "Some of the Tipra textiles in coloured silk and cotton, particularly the gold and silver embroidered silk "riyah" or breast covers in narrow strips, is a distinctive and elegant production of the textile art which made Tippera famous. Metal work, wood-carving and sculpture in stone were arts in which the Tippera people excelled."
>
> ("Kirata-Jana-Krti" — page - 139)

সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মহারাজারা ছিলেন একান্তভাবে আগ্রহী। বাংলাদেশ ছিল ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ফলে এই অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতিকে যুক্ত করে বহির্বিশ্বে তাঁদের সংস্কৃতিকে বহুলাংশে তোলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

— ঃ —



"গ্রন্থপঞ্জী"

ক) প্রকাশিত গ্রন্থ ।

অকলাকুসুম — মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

আবৃত ইতিহাস উণকোটি — জয়ন্ত চৌধুরী

আগ্রার চিঠি — রাজকুমার সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।

ত্রিপুরার স্মৃতি — ঐ

জেবুন্নিসাবেগম — ঐ

ভারতীয় স্মৃতি — ঐ

মহম্মদ সিরাজুদ্দিন অবগফর — ঐ

বহাদুর শাহ; প্রথম খন্ড ।

আমার সোনামুড়া ও উদয়পুর মহারাজা বিভাগ পরিভ্রমন ডায়েরী — বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর।

হোলী — বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর।

ইতিহাসাশ্রিত কবিতা — সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঊণকোটি তীর্থ — প্যারী মোহন দেববর্মা।

ঊণকোটি — শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা।

ত্রিপুরার রূপকথা — শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা কর্তৃক ১৯৫৯ ইং প্রকাশিত।

রাজমালা — শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা ১৯৬৭ ইং

ত্রিপুরার রূপকথা — ক্ষীরোদ প্রভাদেবী।

ত্রিপুরার বাংলাভাষা ও সাহিত্য — মোহিত পুরকায়স্থ।

ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশবছর — ব্রজেন্দ্র দত্ত।

ধর্মনগর বিভাগ

ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশবছর — ব্রজেন্দ্র দত্ত

খোয়াই বিভাগ।

ত্রিপুরেশ্বরের উদয়পুর পরিভ্রমণ ডায়েরী — নীলকন্ঠ সেন।

ত্রিপুরা প্রসঙ্গ — জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার, ত্রিপুরা সরকার।

ত্রিপুরার মন্দির — ডঃ কার্তিক লাহিড়ী।

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস — শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী।

১ম ভাগ

কণিকা — রাজকুমারী অনঙ্গ মোহিনী দেবী।

শোক গাথা — ঐ

জীবনস্মৃতি — ঐ

মানসী কাব্য — ঐ

কড়িও কোমল — ঐ

রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস কৈলাস চন্দ্র সিংহ

রাজমালা — প্রথম লহর — কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

রাজমালা — দ্বিতীয় লহর — ঐ

রাজমালা — তৃতীয় লহর — ঐ

রাজমালা — চতুর্থ লহর — ঐ

বঙ্গীয় কবি, অম্বষ্ঠ খন্ড — ঐ

পঞ্চমাণিক্য — ঐ

রাজমালা — প্রথম খন্ড — দুর্গামণি উজীর

রাজমালা — দ্বিতীয় খন্ড — ঐ

রাজমালা — তৃতীয় খন্ড — ঐ

ঝুলন — মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর

প্রেমমরীচিকা — ঐ

সোহাগ — ঐ

হোরি — ঐ

তব স্মরণখানি — কৃষ্ণজিৎ দেববর্মণ।

দেশীয় রাজ্য — কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা

প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী — ডঃ সুকুমার সেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — ঐ

প্রথম খন্ড (অপরাধ)

প্রদীপ কাব্য — অক্ষয়কুমার বড়াল।

প্রিয় প্রসঙ্গ — মানকুমারী বসু।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম খন্ড
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — ঐ
তৃতীয় খন্ড
বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত — ঐ
বাংলা ইতিহাসের দু'শো বছর — অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়।
স্বাধীন সুলতানদের আমল।
বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ — ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫ম সংস্করণ — ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন
বঙ্গ সাহিত্যের পরিচয় — ঐ
বৃহৎ বঙ্গ - দ্বিতীয় খন্ড — ঐ
বাংলার লোক সাহিত্য — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
তৃতীয় সংস্করণ
রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য — ঐ
বৈষ্ণব পদাবলী - সংকলনগ্রন্থ — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বিবিধ প্রবন্ধ — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালার ইতিহাস — ডঃ নীহার রঞ্জন রায়
(আদিপর্ব) প্রথম সংস্করণ
বঙ্গের মহিলা কবি — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মহিলা কাব্য — সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
প্রবেশক, প্রথম খন্ড
রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
প্রবেশক — চতুর্থ খন্ড
রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা — শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা।
সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত ও সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র সঙ্গীত বিচিত্র — শান্তিদেব ঘোষ।
রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা — ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।
সঙ্গীতের আসরে যদুভট্ট — দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।
খ) পত্র - পত্রিকা
'রবি' — প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা - আষাঢ়, ১৩৩৪ ত্রিং
রবি — প্রথম বর্ষ, চর্তুথ সংখ্যা - চৈত্র, ১৩৩৪ ত্রিং

রবি — প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা - আশ্বিন, ১৩৩৪ ত্রিং
রবি — দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা - ১৩৩৫ ত্রিং
রবি — চৈত্র সংখ্যা, ১৩৩৮ ত্রিং

ত্রিপুর সংহতি প্রথমবর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা, ৩১শে মে, ১৯৬২ ইং।
শারদীয়া অগ্রগতি — ১৯৬৮ ইং।
ফাল্গুনী — ১৩২৬ ত্রিং
গোমতী — প্রজাতন্ত্র দিবস সংখ্যা - প্রথম বর্ষ - একদিশ সংখ্যা - ১২ই মাঘ, ১৩৮১ বাং।
গোমতী — প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা - আষাঢ়, ১৩৬৫ বাং
গোমতী — প্রথমবর্ষ, দশম সংকলন, ১০ই পৌষ, ১৩৮১ বাং শারদীয়া
'সীমান্ত' — ১৩৭৫ বাং
রত্নলিপি — প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।
ত্রিবেগ — শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৬ বাং
দৃষ্টিকোন — প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা - পৌষ, ১৩৭০ বাং
জান — সাহিত্য সংকলন, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা - ১৯[illegible] ইং

গ) পাণ্ডুলিপি
কৃষ্ণমালা — রামগঙ্গা শর্মা।
গাজীনামা — শেখ মনুহরআলী।
গীতচন্দ্রোদয় — প্রথমখন্ড - নরহরি চক্রবর্তী।
গীত চন্দ্রেদয় — সেক মহদ্দিন।
শ্রেণীমালা — দুর্গামনি উজীর।

ঘ) ইংরেজী সমালোচনা গ্রন্থ।
1 Kirata - Jana - Kriti - Dr. S. K. Chatterjee
2 Tripura District - Mr. K. D Menon Gazetier
3 Tripura Review - Prof. Aravinda Mukhopadhyay.
4 Analysis of the Rajmala or chronicles of Tripura _ Rev Long 1923 AD - 1332 T.E.
5 The Struggle for Empire - Dr. S. K. Chatterjee

— ঃ —